وحدة الأمة واتباع السنة

উম্মাহ্‌র ঐক্য : পথ ও পন্থা

[মতভিন্নতার মাঝেও সম্প্রীতি রক্ষা; সুন্নাহ্‌সম্মত পন্থায় সুন্নাহ্‌র প্রতি আহ্বান]

---

২৩ রবীউস সানী ১৪৩৩ হিজরী, মোতাবেক ১৭ মার্চ ২০১২ ঈসায়ী তারিখে
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত
ওয়াহদাতুল উম্মাহ্ ওয়া ইত্তিবাউস সুন্নাহ্ শীর্ষক
সেমিনারের মূল প্রবন্ধ

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

وحدة الأمة واتباع السنة

উম্মাহ্‌র ঐক্য : পথ ও পন্থা

[মতভিন্নতার মাঝেও সম্প্রীতি রক্ষা; সুন্নাহ্‌সম্মত পন্থায় সুন্নাহ্‌র প্রতি আহ্বান]

---

২৩ রবীউস সানী ১৪৩৩ হিজরী, মোতাবেক ১৭ মার্চ ২০১২ ঈসায়ী তারিখে মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত **'ওয়াহ্‌দাতুল উম্মাহ্ ওয়া ইত্তিবাউস সুন্নাহ্'** শীর্ষক সেমিনারের উদ্দেশ্যে রচিত প্রবন্ধের **পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ**
৪ রজব ১৪৩৩ হিজরী, মোতাবেক ২৬ মে ২০১২ ঈসায়ী, রোজ শনিবার অনুষ্ঠিত সেমিনারের দ্বিতীয় পর্বের জন্য প্রস্তুতকৃত

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

প্রকাশক
·মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রকাশকাল
রজব ১৪৩৩ হিজরী
জুলাই ২০১২ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ: ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স: সাইদুর রহমান

মুদ্রণ: মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN :978-984-8950-20-3

মূল্য : একশত ত্রিশ টাকা মাত্র

UMMAHR OIKKO : POTH O PONTHA
By: Maulana Muhammad Abdul Malek
Price: Tk. 130.00 US$ 10.00

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ! আলহামদু লিল্লাহ!! আলহামদু লিল্লাহ!!! আল্লাহপাকের খাস মেহেরবাণীতে মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া ঢাকার উদ্যোগে 'ওয়াহদাতুল উম্মাহ্ ওয়াত্তিবাউস সুন্নাহ' শীর্ষক দুই পর্বের একটি সুন্দর সেমিনার অনুষ্ঠিত করার তাওফীক আল্লাহপাক মারকায কর্তৃপক্ষকে দান করেছেন। আরো শুকরিয়ার বিষয় হলো, এ উপলক্ষে মারকাযের আমীনুত তালীম জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের ইলমী কলম থেকে ইখলাসপূর্ণ একটি প্রবন্ধ, যা বর্তমান সময়ের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয় 'উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা [মত ভিন্নতার মাঝেও সম্প্রীতি রক্ষা; সুন্নাহসম্মত পন্থায় সুন্নাহর প্রতি আহ্বান], লিখিয়েছেন। যা এদেশ ও জাতির দ্বীনী প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে মাইলফলক হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

হুজুরের অনুমতিক্রমে সম্পাদনা ও পরিমার্জনের পর মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে এখন এটি প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহপাক হুজুরকে হায়াতে তাইয়্যেবা, তাবিলা দান করুন। রূহানী ও জিসমানী কুওয়্যত বাড়ীয়ে দিন। আফিয়াত ও সালামাতির সাথে দীর্ঘদিন দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত রাখুন। এ কিতাব এবং এ ধরণের আরো প্রয়োজনীয় কিতাব রচনা করে এদেশের এবং সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ
২২ শাবান ১৪৩৩ হিজরী
১৩ জুলাই ২০১২ ঈসায়ী
রাত ২:৩০ মিনিট

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
বাসা: ৫৪, রোড: ১৮, সেক্টর: ৩
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা

প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ

ঐক্যের পথ ও পন্থা —————

১. তাওহীদ ও জরুরিয়াতে দ্বীনের বিষয়ে সামান্যতম অবহেলা ও শৈথিল্য প্রদর্শন থেকেও বিরত থাকি।

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়ালজামাআর নীতি ও আদর্শের উপর অটল অবিচল থাকি।

৩. সুন্নাহর বিভিন্নতার ক্ষেত্রে প্রত্যেককে তার সমাজে অনুসৃত সুন্নাহর উপর থাকতে দিই।

৪. ইজতিহাদী বিষয়ে অন্যান্য মুজতাহিদ ও তাঁদের অনুসারীদের উপর নাহী আনিল মুনকারের নীতি প্রয়োগ না করি।

৫. তলাবায়ে কেরাম, ওয়ায়েজীনে কেরাম এবং মসজিদের ইমাম ও খতীব ছাহেবান হিফযুন নুসূস ও তাফাক্কুহ ফিদ্দীন অর্জনের বিষয়ে সচেষ্ট হই।

৬. যোগ্য ও সমঝদার আলিম ও তালিবে ইলমের জন্য ফিকহী মাযহাবসমূহের ইখতিলাফী মাসাইল একতরফাভাবে অধ্যয়ন করা উচিত নয়। অসম্পূর্ণ অধ্যয়নের তো প্রশ্নই আসে না।

৭. কারো সাথে কোনো বিষয়ে মতভেদ হলে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের দাবি রক্ষায় পূর্বের চেয়ে অধিক সতর্ক হই। কারণ এ দাবি রক্ষার এটিই প্রকৃত সময়।

৮. শরীয়তসম্মত মতপার্থক্যকে কলহ-বিবাদে পর্যবসিত করা থেকে বিরত থাকি। মতপার্থক্যের মাঝেও ঐক্য ও বন্ধুত্বের অনুশীলন করি।

৯. প্রজ্ঞা ও তাফাক্কুহ, আদব ও তাওয়াজু এবং ইতিদাল ও ভারসাম্য অর্জন করার জন্য আহলে দিল ও আহলে ফিকহ বুযুর্গদের সোহবত গ্রহণ করি।

১০. সর্বসম্মত সুন্নাহ ও আহকামের প্রচার ও প্রশিক্ষণ এবং এর দাওয়াত ও আহ্বানে বেশি জোর দিই।

১১. আমানতদারি ও সমঝদারির সাথে উপরোক্ত পয়গামগুলো অন্যের কাছেও পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি।

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (প্রশ্নোত্তর)

কিছু অনুরোধ

بســــــم الله الرحمن الرحيـــــم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ أما بعد،

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু

মুসলিম উম্মাহ্ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং নিজেদের একতা ও সংহতি রক্ষা করা ইসলামের একটি মৌলিক ফরয। তেমনি সুন্নাহর অনুসরণ তথা আল্লাহর রাসূলের শরীয়ত ও বিধান এবং উসওয়াহ ও আদর্শকে সমর্পিত চিত্তে স্বীকার করা ও বাস্তবজীবনে চর্চা করা তাওহীদ ও ঈমান বিল্লাহর পর ইসলামের সবচেয়ে বড় ফরয।

সুতরাং সুন্নাহর অনুসরণ যে দ্বীনের বিধান উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং বিভেদ ও অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকাও সেই দ্বীনেরই বিধান। এ কারণে এ দুইয়ের মাঝে বিরোধ ও সংঘাত হতেই পারে না। সুতরাং একটির কারণে অপরটি ত্যাগ করারও প্রশ্ন আসে না। কিন্তু এখন আমরা এই দুঃখজনক বাস্তবতার সম্মুখীন যে, হাদীস ও সুন্নাহর অনুসরণ নিয়ে উম্মাহর মাঝে বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি হচ্ছে। উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে

মুজতাহিদ ইমামগণকে এবং তাদের সংকলিত ফিকহী মাযহাবসমূহকে দায়ী করা হচ্ছে। অথচ ফিকহের এই মাযহাবগুলো হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর বিধিবিধানেরই ব্যাখ্যা এবং তার সুবিন্যস্ত ও সংকলিত রূপ। মূলে তা ফকীহ ও মুজতাহিদ সাহাবীগণের মাযহাব, যা উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মপরম্পরা তথা তাওয়ারুছের মাধ্যমে চলে এসেছে।

এই অবস্থা প্রমাণ করে, আমাদের কিছু বন্ধু সুন্নাহর অনুসরণের মর্ম ও তার সুন্নাহসম্মত পন্থা এবং সুন্নাহর প্রতি আহ্বানের সুন্নাহসম্মত উপায় সম্পর্কে দুঃখজনকভাবে উদাসীন। তদ্রূপ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির সঠিক উপলব্ধি এবং ঐক্যবিনাশী বিষয়গুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির শিকার।

সুন্নাহর অনুসরণ এবং উম্মাহর ঐক্য দুটো বিষয়ই অনেক দীর্ঘ এবং উভয় ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে রয়েছে ব্যাপক অবহেলা ও ভুল ধারণা। সবকটি দিক নিয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে শুধু প্রবন্ধের একটি শাখা শিরোনাম (মতভিন্নতার মাঝেও সম্প্রীতি রক্ষা; সুন্নাহসম্মত পন্থায় সুন্নাহর প্রতি আহ্বান)-এর সাথে সম্পৃক্ত কিছু মৌলিক বিষয় আলোচনা করা উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক কথা বলার এবং ইখলাস ও ইতকানের সাথে উপস্থাপন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আলোচনা সহজার্থে প্রবন্ধটি নিম্নোক্ত শিরোনামে বিন্যস্ত করা হয়েছে

ভূমিকা

ঐক্য ও সংহতি এবং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির গুরুত্ব

ইসলাম তাওহীদের দ্বীন এবং ঐক্যের ধর্ম। এখানে শিরকের সুযোগ নেই এবং অনৈক্য ও বিভেদের অবকাশ নেই। ইসলামে ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ—এক আল্লাহর ইবাদত, এক আল্লাহর ভয়।

তাওহীদের সমাজকে ইসলাম আদেশ করে সীরাতে মুস্তাকীম ও সাবীলুল মুমিনীনের উপর একতাবদ্ধ থাকার, নিজেদের ঐক্য ও সংহতি এবং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি রক্ষা করার, ইজমা ও সাবীলুল মুমিনীনের বিরোধিতা পরিহার করার এবং এমন সব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার, যা উম্মাহর একতা নষ্ট করে এবং সম্প্রীতি বিনষ্ট করে।

সাবীলুল মুমিনীন থেকে বিচ্যুত হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কুফর এবং পরস্পর কলহ-বিবাদে লিপ্ত হওয়া হারাম ও কবিরা গুনাহ।

কথাগুলো যদিও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট এবং উম্মাহর সর্ববাদীসম্মত আকীদা তবুও পুনঃস্মরণের স্বার্থে কিছু আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে।

আয়াত : ১.

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ

(তরজমা) 'নিশ্চিত জেনো, এই তোমাদের উম্মাহ, এক উম্মাহ (তাওহীদের উম্মাহ) এবং আমি তোমাদের রব। সুতরাং আমার ইবাদত কর। কিন্তু তারা নিজেদের দ্বীনকে নিজেদের মাঝে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে। (তবে) সকলেই আমার কাছে ফিরে আসবে।—সূরাতুল আম্বিয়া (২১) : ৯২-৯৩

আয়াত : ২.

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ

بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ۞

(তরজমা) 'নিশ্চিত জেনো, এই তোমাদের উম্মাহ, এক উম্মাহ (তাওহীদের উম্মাহ) এবং আমি তোমাদের রব। সুতরাং আমাকে ভয় কর। এরপর তারা নিজেদের দ্বীনের মাঝে বিভেদ করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রত্যেক দল (নিজেদের খেয়ালখুশি মতো) যে পথ গ্রহণ করল তাতেই মত্ত রইল। সুতরাং (হে পয়গাম্বর!) তাদেরকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মূর্খতায় ডুবে থাকতে দাও।–সূরা মুমিন (২৩) : ৫২-৫৩

উপরের দোনো জায়গায় নবীগণ তাওহীদের যে দাওয়াত দিয়েছেন তা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, "আল্লাহর কাছে উম্মত একটিই। আর তা হচ্ছে তাওহীদের উম্মত।" সূরা ইউনুস (১০ : ১৯) ও সূরা বাকারায় (২ : ২১৩) বলা হয়েছে যে, আদিতে সকল মানুষ এক সমাজেই ছিল। পরে লোকেরা কুফর ও শিরক অবলম্বন করে আলাদা উম্মত, আলাদা সমাজ বানিয়ে নিয়েছে।

তাই উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তাওহীদ। تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ (তারা নিজেদের দ্বীনকে নিজেদের মাঝে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে) বাক্যে আকীদায়ে তাওহীদ এবং দ্বীনের অন্যান্য মূলনীতি (জরুরিয়াতে দ্বীনের) অস্বীকার বা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আলাদা মিল্লাত ও আলাদা উম্মত সৃষ্টির নিন্দা করা হয়েছে।

আয়াত : ৩.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ

وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ

يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۞ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا

بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ

مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ

آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

(তরজমা) তিনি তোমাদের জন্য সেই দ্বীনই স্থির করেছেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন নূহকে এবং (হে রাসূল!) যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠিয়েছি এবং যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে; যে, কায়েম রাখ এই দ্বীন এবং তাতে সৃষ্টি করো না বিভেদ। (তা সত্ত্বেও) মুশরিকদের তুমি যে দিকে ডাকছ তা তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুভার মনে হয়। আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং যে আল্লাহর দিকে রুজু হয় তাকে নিজ দরবার পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য দান করেন।

এবং মানুষ যে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তা হয়েছে তাদের কাছে নিশ্চিত জ্ঞান আসার পরই, পারস্পরিক শত্রুতার কারণে। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যদি একটি কথা নির্ধারিত কাল পর্যন্ত পূর্বেই স্থির না থাকত তবে তাদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা এ সম্পর্কে এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পড়ে আছে।

'সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি ঐ বিষয়ের দিকেই মানুষকে আহ্বান কর এবং অবিচল থাক, যেরূপ তোমাকে আদেশ করা হয়েছে। এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। বল, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের কর্ম আমাদের, তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোনো তর্ক নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে একত্র করবেন এবং তাঁরই কাছে সকলের প্রত্যাবর্তন।–সূরাতুশ শূরা (৪২) : ১৩-১৫

দ্বীনের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির অর্থ, তাওহীদ বা অন্য কোনো মৌলিক বিষয় সরাসরি অস্বীকার করে কিংবা তাতে অপব্যাখ্যা করে তাওহীদের উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

হক সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান আসার পর এ বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা কেবল জিদ ও হঠকারিতার কারণেই হয়ে থাকে। শাখাগত বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর দলিলভিত্তিক যে মতপার্থক্য তা এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ ফুরূয়ী ইখতিলাফ তো ঐখানেই হয় যেখানে 'ইলমে ইয়াকীনী' দানকারী

কোনো দলিল থাকে না। এ কারণে ঐখানে কারো সম্পর্কে বলা যায় না যে, 'ইয়াকীনী ইলম' আসার পরও তিনি মতভেদ করছেন।

অন্য অনেক আয়াতের মতো উপরের আয়াতগুলোতেও স্পষ্ট ঘোষণা আছে যে, দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে মতভেদ হতে পারে না। এখানে মতভেদ অর্থই বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা।

আর এই বিভেদের দায় ঐ মতভেদকারীকে বহন করতে হবে। যারা হকপন্থী, তাদেরকে নয়। কারণ ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ ও মৌলিক আকিদা। যারা এর উপর আছে তারা তো মূল পথেই রয়েছে। যারা ভিন্নমত সৃষ্টি করেছে তারা এই পথ থেকে সরে গেছে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার জন্ম দিয়েছে। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, তাওহীদের বিষয়ে বা দ্বীনের অন্য কোনো মৌলিক বিষয়ে হক থেকে বিচ্যুত হওয়া বা সন্দেহ-সংশয় পোষণ করা খেয়ালখুশির অনুগামিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখানে ইসলামের অতুলনীয় ও ন্যায়সঙ্গত শিক্ষাটিও লক্ষণীয় যে, যারা মৌলিক বিষয়ে মতভেদ করে বিচ্ছিন্ন হল তাদের সাথেও জুলুম-অবিচার করা যাবে না; ন্যায়বিচার করতে হবে।

আয়াত : ৪.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

(তরজমা) 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট দ্বীন কেবল ইসলাম। আর কিতাবীরা যে মতভেদ করেছে তা করেছে তাদের নিকট ইলম আসার পরই, পরস্পর বিদ্বেষবশত। আর যে কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে (তার জেনে রাখা উচিৎ) আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।'—সূরা আলে-ইমরান (৩) : ১৯

এই আয়াতে সেই অভিন্ন দ্বীনের নামও এসে গেল, যা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া হারাম। এই দ্বীন সম্পর্কে সূরা আলে-ইমরানেরই অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(তরজমা) আর যে কেউ অন্বেষণ করবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম সেটা তার নিকট থেকে কবুল করা হবে না। আর আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আল ইমরান (৩) : ৩৮৫)

আয়াত : ৫.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ
وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ
وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

(তরজমা) 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে সেভাবে ভয় কর যেভাবে তাকে ভয় করা উচিৎ। এবং (সাবধান) তোমাদের মৃত্যু যেন এ অবস্থায়ই আসে যে, তোমরা মুসলিম।

তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভেদ করো না। স্মরণ কর যখন তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে তখন আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তোমাদের অন্তরসমূহ একে অপরের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছ। তোমরা তো ছিলে অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে। আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদের মুক্ত করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর বিধানসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা পথপ্রাপ্ত হও।

'তোমাদের মধ্যে যেন এমন একটি দল থাকে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজে বাধা দিবে। আর এরাই তো সফলকাম।

'তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং মতভেদ করেছিল তাদের নিকট সুস্পষ্ট বিধানসমূহ পৌঁছার পর। এদের জন্যই রয়েছে ভীষণ শাস্তি।

'যেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে আর কতক মুখ কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হবে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কুফরি করলে ঈমান আনার পর?! সুতরাং স্বীয় কুফরির দরুণ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

'পক্ষান্তরে যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহর রহমতের মধ্যে থাকবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।'–সূরা আলে-ইমরান (৩) : ১০২-১০৭

'হাবলুল্লাহ'–আল্লাহর রজ্জু অর্থ আলকুরআন এবং আল্লাহর সাথে কৃত বান্দার সকল অঙ্গিকার, যার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গিকারটি এই যে, আমরা শুধু রবেরই ইবাদত করব, অন্য কারো নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, এই তাওহীদ ও কুরআনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। তাওহীদ ত্যাগ করে কিংবা কুরআনের কোনো বিধান থেকে বিমুখ হয়ে বিভেদ করো না। তো এখানেও ঐ কথা–ঐক্যের ভিত্তি তাওহীদ ও কুরআন।

আরো বোঝা গেল যে, তাওহীদপন্থী উম্মাহর পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। আর এ নেয়ামত হাসিল হবে সর্বপ্রকার 'আসাবিয়াত' থেকে মুক্ত হয়ে শুধু এবং শুধু ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ এবং ইসলামী বিধিবিধানের আনুগত্যের দ্বারা। আউস ও খাযরাজের দৃষ্টান্ত স্মরণ করুন, এই নেয়ামতে তাঁরা এতই সৌভাগ্যশালী হয়েছিলেন যে, তাঁদের গোত্রীয় পরিচয় চাপা পড়ে গেল এবং দ্বীনী পরিচয়ে–'আনসার' নামেই তাঁরা প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন।

'বাইয়িনাত' অর্থ কিতাব-সুন্নাহর অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিল, যা থেকে বিমুখ হয়ে মতভেদ করার অর্থই হল এ বিষয়ে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করা, যা সম্পূর্ণ গর্হিত ও বর্জনীয়। যেমন ঈমানদার ও তাওহীদপন্থীদের সাথে কাফির-মুশরিকদের মতভেদ। কট্টর বিদআতীদের মতভেদও অনেক সময় এই সীমানায় প্রবেশ করে। এই বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার শাস্তি আখেরাতে মুখ কালো হওয়া।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন–

تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মুখ উজ্জ্বল হবে এবং আহলুল বিদআহ ওয়াল ফুরকার মুখ কালো হবে।–তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৫৮৪

এ থেকে বোঝা যায়, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অনুসারীগণ 'আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করার এবং বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন না হওয়ার' আদেশ পালন করছেন, যার পুরস্কার তারা দুনিয়াতে পেয়ে থাকেন পরস্পর সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মাধ্যমে। আর আখিরাতের পুরস্কার এই হবে যে, তাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে। পক্ষান্তরে যারা কালিমা পাঠ করেও সুন্নাহ

ছেড়ে বিদআদ অবলম্বন করবে কিংবা উম্মাহর ঐক্যে আঘাত করে 'আলজামাআ'র নীতি থেকে বিচ্যুত হবে তাদেরও আশঙ্কা আছে আয়াতের কঠিন হুঁশিয়ারির মাঝে পড়ে যাওয়ার।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ইমামদের মাঝে শাখাগত বিষয়ে দলিলের ভিত্তিতে যে মতপার্থক্য, তা যেমন বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা নয় তেমনি এ আয়াতের হুঁশিয়ারির আওতাভুক্তও নয়। কারণ এ জাতীয় মতপার্থক্যের পরও তাঁরা একতাবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁদের মতপার্থক্য—আল্লাহর পানাহ—স্পষ্ট বিধান থেকে বিমুখতার কারণেও ছিল না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তৃতীয় পরিচ্ছেদে আসছে ইনশাআল্লাহ।

আয়াত : ৬.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(তরজমা) '(হে নবী! তাদেরকে আরো বল,) এই আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং এর অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করবে না। অন্যথায় সেগুলো তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। এসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা সাবধান হও।—সূরা আনআম (৬) : ১৫৩

সিরাতে মুস্তাকীম ছেড়ে অন্য পথে যাওয়াই বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা। হাদীসে আছে, ঐসব পথে শয়তান রয়েছে, যারা সিরাতে মুসতাকীম থেকে আলাদা করার জন্য মানুষকে নিজেদের দিকে আহ্বান করে।—মুসনাদে আহমদ; সহীহ ইবনে হিব্বান; ইবনে কাছীর ২/৩০৫

ঐ পথগুলো হচ্ছে কুফর ও শিরকের পথ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বিদআতের পথ। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ইমামগণের ফিকহী মাযহাব এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর হক্কানী মাশাইখের সুলুকের তরীকা প্রকৃতপক্ষে সিরাতে মুসতাকীমেরই ব্যাখ্যা ও তার বিভিন্ন দিক। এ পথে শয়তান নয়, এ পথে রয়েছে ওয়ারিছে নবীর নির্দেশনা।

আয়াত : ৭.

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

(তরজমা) '(হে নবী!) নিশ্চিত জেনো, যারা নিজেদের দ্বীনে বিভেদ করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত। এরপর তিনি তাদেরকে অবহিত করবেন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।'–সূরা আনআম (৬): ১৫৯

সরাসরি আয়াত থেকেই বোঝা যায়, এখানে ঐ সকল ফের্কা উদ্দেশ্য, যারা দ্বীন ও শরীয়ত থেকে বের হয়ে গিয়েছে। মুমিনদের আদেশ করা হয়েছে তারা যেন দ্বীন ও শরীয়তের উপর অবিচল থাকে।

আয়াত : ৮.

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۞ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۞ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۞

(তরজমা) 'আমি তো বনী ইসরাইলকে কিতাব, রাজত্ব ও নবুওয়ত দান করেছিলাম। তাদেরকে উত্তম রিযিক প্রদান করেছিলাম এবং জগদ্বাসীর উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

'আমি তাদেরকে দ্বীনের সুস্পষ্ট বিধানাবলি দান করেছিলাম। অতপর তারা যে মতভেদ করল তা তাদের কাছে ইলম আসার পরই করেছিল শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করতো তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিবেন।

'এরপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ শরীয়তের উপর রেখেছি। সুতরাং তা অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না।

'আল্লাহর মুকাবিলায় তারা তোমার কিছুমাত্রও কাজে আসবে না। বস্তুত জালিমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ বন্ধু মুত্তাকীদের।

'এটি (কুরআন) সকল মানুষের জন্য প্রকৃত জ্ঞানের সমষ্টি এবং দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য গন্তব্যে পৌঁছার মাধ্যম ও রহমত।'–সূরা জাছিয়া (৪৫) : ১৬-২০

'বাইয়িনাত' তথা অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা হকের নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়। যে তা থেকে বিমুখ হয়ে মতভেদ করে তার মতভেদের ভিত্তি হঠধর্মিতা ও সীমালঙ্ঘন। এই মতভেদ হচ্ছে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা।

এ আয়াতে এ কথাও দ্ব্যর্থহীনভাবে আছে যে, তাওহীদের সাথে শরীয়তের আনুগত্যও অপরিহার্য। শরীয়তকে মেনে নেওয়া প্রকৃতপক্ষে 'তাওহীদ ফিততাশরী' তথা বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ–এ বিশ্বাসেরই বহিঃপ্রকাশ। সূরা মায়েদা (৫) : ৪৮ এবং অন্য অনেক জায়গায় সাবধান করা হয়েছে যে, 'শরয়ে মুনাযযাল তথা আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত সুস্পষ্ট বিধানাবলির কোনো একটি বিধানের বিরোধিতাও হারাম ও কুফর।

বস্তুত জালিমরা একে অপরের বন্ধু আর আল্লাহ বন্ধু মুত্তাকীদের–এ বাক্যে ولاء ও براء বা موالاة ও معاداة বন্ধুতা ও শত্রুতার নীতি বলা হয়েছে। ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এই যে, 'মুয়ালাত' বা বন্ধুত্বের মানদণ্ড হচ্ছে ঈমান ও ইসলাম। আর 'মুআদাত' বা শত্রুতার মানদণ্ড হচ্ছে শিরক ও কুফর। যে কেউ শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত সে কেবল তার ঈমান ও ইসলামের কারণেই, অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য ছাড়াই, মুয়ালাত ও বন্ধুত্বের এবং সকল ইসলামী অধিকার পাওয়ার হক রাখে। আর যে এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়, অর্থাৎ যে শিরক বা কুফরে লিপ্ত (প্রত্যেক কুফর শিরকেরই বিভিন্ন প্রকার) তার সাথে 'মুয়ালাত' বা বন্ধুত্ব হারাম; বরং তা কুফরের আলামত।

এ প্রসঙ্গে কিছু আয়াতের শুধু তরজমা উল্লেখ করছি

(তরজমা) 'হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে ও আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য (ঘর থেকে) বের হয়ে থাক তাহলে আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে এমন বন্ধু বানিও না যে, তাদের কাছে ভালবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তা (এমনই) প্রত্যাখ্যান করেছে (যে), রাসূলকে ও তোমাদেরকে শুধু এই কারণে মক্কা থেকে বের করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহতে ঈমান এনেছ। তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব কর, অথচ তোমরা যা কিছু গোপনে কর এবং যা কিছু প্রকাশ্যে কর আমি তা ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হল।'–সূরা মুমতাহিনা (৬০) : ১

(তরজমা) 'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা কর তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে অমান্য করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেল যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। তবে ইবরাহীমের ঐ কথা (ব্যতিক্রম), যা সে তার পিতাকে বলেছিল, আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য মাগফিরাতের দুআ করব; যদিও আমি আল্লাহর সামনে আপনার কোনো উপকাব করার ইখতিয়ার রাখি না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনারই উপর নির্ভর করছি, আপনারই দিকে রুজু করছি এবং আপনারই কাছে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন।'–সূরা মুমতাহিনা (৬০) : ৪

(তরজমা) 'বড় হজ্বের দিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এক ঘোষণা যে, আল্লাহ মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন এবং তাঁর রাসূলও। সুতরাং (হে মুশরিকগণ) তোমরা যদি তওবা কর তবে তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। আর যদি বিমুখ হও তাহলে জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর এই কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শোনাও।'–সূরা তাওবা (৯) : ৩

(তরজমা) 'মুমিন নর ও মুমিন নারী একে অন্যের বন্ধু। তারা সৎ কাজে আদেশ করে, অসৎ কাজে বাধা দেয়, সালাতে পাবন্দি করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদের প্রতি অবশ্যই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'–সূরা তাওবা (৯) : ৭১

(তরজমা) 'হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ঈমানের বিপরীতে কুফরকে শ্রেয় মনে করে তাহলে তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করবে তারাই জালিম।

'বল, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের খান্দান, তোমাদের সেই সম্পদ, যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের সেই ব্যবসায়, যা মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং বসবাসের সেই ঘর, যা তোমরা ভালবাস তবে অপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ ফয়সালা প্রকাশ করেন। আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে লক্ষ্যে পৌঁছান না।'–সূরা তাওবা (৯৯) : ২৩-২৪

(তরজমা) 'আমি মানুষকে তার পিতামাতার সম্পর্কে আদেশ করেছি-(কেননা) তার মা কষ্টের পর কষ্ট সয়ে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে-তুমি কৃতজ্ঞ হও আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি। আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

'তারা যদি তোমাকে চাপ দেয় আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে থাকবে। আর চলবে এমন ব্যক্তির পথে, যে আমার অভিমুখী হয়েছে। অতপর তোমাদের সকলকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন তোমাদেরকে অবহিত করব, যা তোমরা করতে।'-সূরা লুকমান (৩১) ১৪-১৫

(তরজমা) 'তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করোনি, যারা ঐ সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে যাদের প্রতি আল্লাহ রুষ্ট। তারা তোমাদের দলভুক্ত নয়, তাদের দলভুক্তও নয়। এরা জেনেশুনে মিথ্যা শপথ করে।

'আল্লাহ এদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। তারা যা করে তা কত মন্দ।

'তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। আর আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। অতএব তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

'আল্লাহর শাস্তির মোকাবেলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি কোনো কাজে আসবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

'যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে তখন তারা আল্লাহর নিকট শপথ করবে যেরূপ তোমাদের নিকট শপথ করে এবং তারা মনে করে যে, তারা (ভালো) কিছুর উপর রয়েছে। সাবধান, এরাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী।

'শয়তান এদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

'যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

'আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি অবশ্যই বিজয়ী হব এবং আমার রাসূলগণ। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

'তুমি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে। যদিও তারা

হয় তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ ঈমানকে সুদৃঢ় করেছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন নিজের পক্ষ হতে রূহ দ্বারা। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।'–সূরা মুজাদালা (৫৮) : ১৪-২২

সূরায়ে মুজাদালার আয়াতগুলো থেকে একথাও পরিষ্কার হল যে, দল মূলত দুটি :

১. হিযবুল্লাহ বা আল্লাহর দল

২. হিযবুশ শয়তান বা শয়তানের দল।

যার অন্তরে ঈমান আছে এবং মুমিনদের সাথে মুয়ালাত ও হৃদ্যতা পোষণ করে আর কাফির-মুশরিকদের থেকে বারাআত ও সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করে সে হিযবুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। তাকে হিযুবল্লাহ থেকে খারিজ করা কিংবা হিযবুশ শয়তানের দিকে নিসবত করা সম্পূর্ণ হারাম। হিযবুল্লাহর মাপকাঠি হচ্ছে ঈমান, মুমিনদের প্রতি মুয়ালাত ও হৃদ্যতা এবং আহলে কুফর ও শিরকের সাথে মুআদাত ও শত্রুতা।

মুয়ালাত ও বারাআতের এই ইসলামী নীতি থেকে পরিষ্কার হয় যে, ঐক্যের অর্থ ঈমান ও ইসলামের সূত্রে একতাবদ্ধ থাকা। ঐক্যের ভিত্তি হবে তাওহীদ। তাওহীদ ত্যাগ করে এবং দ্বীনের মূলনীতি বিসর্জন দিয়ে কোনোরূপ ঐক্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ তা করলে সে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাওহীদ ও ইত্তিহাদ দুটোই তার হাতছাড়া হয়।

আয়াত : ৯.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। পরস্পর বিবাদ করো না তাহলে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য্য ধারণ কর। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।–সূরা আনফাল (৮) : ৪৬

এ আয়াতে 'তাওহীদ ফিততাশরী' তথা একমাত্র আল্লাহকেই বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করার আদেশ আছে। শর্তহীন আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর এবং আল্লাহর আদেশে তাঁর রাসূলের। অন্য সকলের আনুগত্য ও আনুগত্যের

অধীন। সাথে সাথে কলহবিবাদ থেকে বিরত থাকার আদেশ করা হয়েছে এবং এর বড় দুটি কুফল সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে : এক. এর দ্বারা উম্মাহ শক্তিহীন হয়ে পড়বে, দুই. তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি লোপ পাবে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, রাসূলের আনুগত্য তথা সুন্নাহর অনুসরণের আদেশের সাথে ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং কলহবিবাদ থেকে আত্মরক্ষার তাকীদ করা হয়েছে।

আয়াত : ১০.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ۞ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞

(তরজমা) 'মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মাঝে মীমাংসা করে দাও। আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।

'হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে। সে (অর্থাৎ যাকে উপহাস করা হচ্ছে) তার চেয়ে উত্তম হতে পারে। এবং কোনো নারীও যেন অপর নারীকে উপহাস না করে। সে (অর্থাৎ যে নারীকে উপহাস করা হচ্ছে) তার চেয়ে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অন্যকে দোষারোপ করো না এবং একে অন্যকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না। ঈমানের পর ফিসকের নাম যুক্ত হওয়া কত খারাপ! যারা এসব থেকে বিরত হবে না তারাই জালেম।

'হে মুমিনগণ! অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কোনো কোনো অনুমান গুনাহ। তোমরা কারো গোপন ত্রুটি অনুসন্ধান করবে না এবং একে

অন্যের গীবত করবে না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটা তো তোমরা ঘৃণা করে থাক। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তিনি বড় তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে এবং তোমাদের মাঝে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্র বানিয়েছি। যাতে একে অন্যকে চিনতে পার। নিশ্চিত জেনো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।'–সূরা হুজুরাত (৪৯) : ১০-১৩

এই আয়াতগুলোতে মুমিনদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের চেতনা জাগ্রত করা হয়েছে এবং মুমিনের কাছে মুমিনের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই আয়াতগুলো থেকে প্রমাণ হয়, ভ্রাতৃত্বের মানদণ্ড শুধু ঈমান। সুতরাং উল্লেখিত অধিকারগুলো মুমিনমাত্রেরই প্রাপ্য তার মুমিন ভাইয়ের কাছে।

শায়খ আবদুর রহমান বিন নাসির আসসাদী (১৩০৭ হি.–১৩৭৬ হি.) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ আয়াতের অধীনে লেখেন–

هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم . . .

ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض، وبما به يحصل التآلف والتودد والتواصل بينهم، كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض . . .

ثم أمر بالتقوى عموماً، ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى الله الرحمة، فقال : لعلكم ترحمون، وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة، ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة . . .

'আল্লাহ তাআলা সকল মুমিনকে এই অঙ্গিকারে আবদ্ধ করেছেন যে, দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিম যেখানেই এমন কোনো ব্যক্তি আছে, যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি, রাসূলগণের প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রয়েছে, সে সকল

মুমিনের ভাই। আর এই ভ্রাতৃত্বের দাবি এই যে, মুমিনরা তার জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজেদের জন্য পছন্দ করে। এবং তার জন্য তা-ই অপছন্দ করবে, যা নিজেদের জন্য অপছন্দ করে।

'আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন, মুমিনরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে এবং আপসের মিল-মহব্বত এবং ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখবে। এই সব কিছু প্রত্যেকের উপর প্রত্যেকের যে অধিকার রয়েছে তাকে আরো তাকীদ করে। ...

'(উপরের আয়াতগুলোতে) সাধারণভাবে তাকওয়া ও খোদাভীতির আদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করা ও মুমিনের অধিকার রক্ষার বিনিময়ে রহমতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে–لعلكم ترحمون আর রহমত লাভের অর্থ দুনিয়া-আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ লাভ। এ থেকে এটাও বোঝা যায় যে, মুমিনের হক্ব নষ্ট করা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার এক প্রধান কারণ। ...–তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান, পৃ. ৮০০-৮০১

ঈমানী ভ্রাতৃত্বের রয়েছে অনেক দাবি। এ আয়াতে বিশেষভাবে এমন কিছু দাবি উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পূরণ না করার কারণে সমাজে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়। তেমনি কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হলে এই বিষয়গুলো আরো বেশি লঙ্ঘিত হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, দ্বীনী-দুনিয়াবী মতভেদের ক্ষেত্রে একে অপরকে উপহাস ও তাচ্ছিল্য করা, গীবত করা, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, কুধারণা পোষণ করা, কটুক্তি করা, খারাপ নামে বা মন্দ উপাধিতে ডাকা–এই সব বিষয়ের চর্চা হতে থাকে। লোকেরা যেন ভুলেই যায় যে, কুরআন মজীদে এ বিষয়গুলোকে হারাম করা হয়েছে। প্রত্যেকের আচরণ থেকে মনে হয়, প্রতিপক্ষের ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করা হালাল! মতভেদের কারণে তার কোনো ঈমানী অধিকার অবশিষ্ট নেই। অথচ এ তো শুধু মুমিনের হক নয়, সাধারণ অবস্থায় মানুষমাত্রেরই হক। একজন মানুষ অপর একজন মানুষের কাছে এই নিরাপত্তাটুকু পাওয়ার অধিকার রাখে। এমনকি যদি সে মুসলিমও না হয়।

হায়! বিরোধ ও মতভেদের ক্ষেত্রে যদি আমরা প্রতিপক্ষকে অন্তত একজন মানুষ মনে করে তার গীবত-শেকায়েত থেকে, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া থেকে, উপহাস-বিদ্রূপ করা থেকে ও মন্দ নামে ডাকা থেকে বিরত থাকতাম! আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহয় তো জীবজন্তু, এমনকি জড় বস্তুরও হক ও অধিকার বর্ণিত হয়েছে। তো মতভেদকারী আর কিছু না হোক একজন প্রাণী তো বটে!!

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন–

بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

অর্থাৎ এই সকল হক যে ব্যক্তি রক্ষা করে না সে সমাজ ও শরীয়ত উভয়ের দৃষ্টিতে ফাসিক উপাধির উপযুক্ত হয়ে যায়। একজন মুমিনের জন্য তা কত বড় লজ্জা ও দুর্ভাগ্যের বিষয়?

তো দ্বীনী মতভেদের ক্ষেত্রে যদি এইসব আচরণ করা হয় এবং এ কারণে দ্বীনের পক্ষ হতেই ঐ 'খাদিমে দ্বীনে'র নামের সাথে ফাসিক উপাধি যুক্ত হয় তাহলে তা দ্বীন ও শরীয়তের কেমন খেদমত তা খুব সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন।

শেষ আয়াতে সমগ্র মানবজাতির জন্য ন্যায় ও সাম্যের এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি ঘোষণা করা হয়েছে যে, বংশীয়, গোত্রীয় বা আঞ্চলিক পরিচিতি মর্যাদা ও শরাফতের মাপকাঠি নয়। মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া ও খোদাভীরুতা। সকল মানুষ এক পুরুষ ও এক নারীর সন্তান। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আলাদা আলাদা কওম, গোত্র বা খান্দানের পরিচয় এজন্য দান করেননি যে, এরই ভিত্তিতে তারা একে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করবে। বরং এই বৈচিত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাদেরকে ছোট ছোট শ্রেণীতে ভাগ করা, যাতে অসংখ্য আদমসন্তানের মাঝে পারস্পরিক পরিচিতি সহজ হয়।

ভাষা, বর্ণ, গোত্র ও অঞ্চল এসব ছিল আরব জাহিলিয়াতে একতা ও জাতীয়তার মানদণ্ড। আধুনিক জাহিলিয়াতে এসবের সাথে আরো যোগ হয়েছে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দর্শন ও মতবাদকেন্দ্রিক একতা ও জাতীয়তা। এভাবে অসংখ্য বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে একতা শব্দটি একটি অসার শব্দে পরিণত হয়েছে।

প্রাচীন ও আধুনিক উভয় জাহিলিয়াতে মর্যাদা ও শরাফতের মাপকাঠি ধরা হয়েছে আপন আপন পসন্দের নিসবত ও সম্বন্ধকে। এর বিপরীতে ইসলামের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা–ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু তাওহীদ, উম্মাহর জাতীয়তা ইসলাম এবং মর্যাদা ও শরাফতের মাপকাঠি তাকওয়া। এভাবে শ্রেষ্ঠত্বের সকল জাহেলী মাপকাঠিকে ইসলাম বাতিল সাব্যস্ত করেছে এবং সব ধরনের আসাবিয়ত, অহংকার ও সাম্প্রদায়িকতাকে হারাম ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু বাণী আমরা উদ্ধৃত করব ইনশাআল্লাহ। (দেখুন : পরিচ্ছেদ ১, পৃষ্ঠা : ৫০)

আয়াতের উপরোক্ত শিক্ষা থেকে এ নীতিও প্রমাণিত হয় যে, পরিচিতির জন্য বংশীয় ও গোত্রীয় সম্বন্ধ ছাড়া আরো যে সকল জায়েয সম্বন্ধ ব্যবহার করা হয় সেগুলোকেও মর্যাদার মাপকাঠি মনে করা কিংবা সেসবের ভিত্তিতে মুয়ালাত ও বারাআত তথা বন্ধুত্ব ও শত্রুতার আচরণ করা হারাম। মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া। মুয়ালাত ও বন্ধুত্বের মানদণ্ড ঈমান আর কারো থেকে বারাআত ও বিচ্ছিন্নতার কারণ শুধু শিরক ও কুফরই হতে পারে।

এ সকল জায়েয সম্বন্ধের মাঝে জন্মস্থান বা আবাসস্থলের সম্বন্ধ, ফিকহী মাযহাবের সম্বন্ধ, সুলুক ও ইহসানের তরীকাসমূহের সম্বন্ধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধ সবই অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি তার শিক্ষাকেন্দ্রের হিসাবে নামের সাথে মাদানী, আযহারী, নদভী বা দেওবন্দী/কাসেমী লেখে তাহলে তা নাজায়েয নয়। তেমনি ফিকহী মাযহাবের হিসাবে মালেকী, হাম্বলী, হানাফী বা শাফেয়ী লিখলে, কিংবা হাদীস বোঝা ও হাদীস অনুসরণের ক্ষেত্রে বিশেষ মাসলাক ও মাশরাব তথা বিশেষ রুচি ও চিন্তা-চেতনার হিসাবে সালাফী বা আছারী লিখলে অথবা সুলূক ও ইহসানের তরীকা হিসাবে কাদেরী বা নকশবন্দী লিখলে তা নাজায়েয নয়। কিন্তু এই সম্বন্ধগুলোকেই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি মনে করা, এসবের ভিত্তিতে দল-উপদলে বিভক্ত হওয়া, এসবের প্রতি আসাবিয়াত ও অন্যায় পক্ষপাত লালন করা, নিজের সম্বন্ধের কোনো বিষয় সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা ভুল প্রমাণিত হলেও তার উপর জিদ করা এবং ঈমানী ভ্রাতৃত্বের দাবি পূরণের ক্ষেত্রে এসকল সম্বন্ধকে মাপকাঠি ও মানদণ্ড মনে করা সম্পূর্ণ হারাম ও ফাসেকী।

হকের মানদণ্ড হচ্ছে শরীয়তের দলিল, যাতে সীরাত ও আছারে সাহাবাও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কাছে মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া। ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ও তার হকসমূহের মানদণ্ড ঈমান। ঈমানের অতিরিক্ত অন্য কোনো নিসবত বা সম্বন্ধের উপর এই সব হককে মওকুফ মনে করা কিংবা মওকুফ রাখা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী, যা দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতার শামিল এবং সম্পূর্ণ হারাম।

হাদীস

কুরআন মজীদের আয়াতের পর আলোচ্য বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু হাদীস পেশ করছি। প্রথমে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বিষয়ে কিছু হাদীস উল্লেখ করব। এরপর ঐক্যের অপরিহার্যতা এবং অনৈক্যের বর্জনীয়তা সম্পর্কে কিছু হাদীস উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

হাদীস : ১.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المؤمن مَألَف، ولا خير فيمن لا يَألَف ولا يُؤلَف.

رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح.

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ঈমানদার মিত্রতাপ্রবণ। আর ঐ ব্যক্তির মাঝে কোনো কল্যাণ নেই, যে মিত্র হয় না এবং যাকে মিত্র বানানো যায় না।'—মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯১৯৯; মুসতাদরাকে হাকিম ১/২৩

হাদীস : ২.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يَكُفُّ عليه ضَيْعَتَه، ويَحُوطُه من ورائه.

رواه أبو داود في سننه في كتاب الأدب : باب في النصيحة والحياطة، قال العراقي في تخريج الإحياء ٢/١٨٢ : إسناده حسن.

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুমিন মুমিনের জন্য আয়না। এক মুমিন অন্য মুমিনের ভাই। সে তার জমি সংরক্ষণ করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে হেফাযত করে।'—সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪৯১৮

হাদীস

কুরআন মজীদের আয়াতের পর আলোচ্য বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু হাদীস পেশ করছি। প্রথমে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বিষয়ে কিছু হাদীস উল্লেখ করব। এরপর ঐক্যের অপরিহার্যতা এবং অনৈক্যের বর্জনীয়তা সম্পর্কে কিছু হাদীস উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

হাদীস : ১.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المؤمن مَألَف، ولا خير فيمن لا يَألَف ولا يُؤلَف.

رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح.

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ঈমানদার মিত্রতাপ্রবণ। আর ঐ ব্যক্তির মাঝে কোনো কল্যাণ নেই, যে মিত্র হয় না এবং যাকে মিত্র বানানো যায় না।'—মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯১৯৯; মুসতাদরাকে হাকিম ১/২৩

হাদীস : ২.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يَكُفُّ عليه ضَيْعَتَه، ويَحُوْطُه من ورائه.

رواه أبو داود في سننه في كتاب الأدب : باب في النصيحة والحياطة، قال العراقي في تخريج الإحياء ٢/١٨٢ : إسناده حسن.

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুমিন মুমিনের জন্য আয়না। এক মুমিন অন্য মুমিনের ভাই। সে তার জমি সংরক্ষণ করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে হেফাযত করে।'—সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪৯১৮

হাদীস : ৩.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المؤمن للمؤمن كالبُنيان يَشُدُّ بَعضُه بعضا، ثم شبك بين أصابعه.

আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুমিন মুমিনের জন্য দেয়ালের মতো, যার একাংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে।' এরপর তিনি তার হাতের আঙুলগুলো প্রবিষ্ট করে দেখালেন।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬০২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৫৮৫

হাদীস : ৪.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تَنَافَسُوا، ولا تَحَاسَدُوا، ولا تَبَاغَضُوا، ولا تَقَاطَعُوا، ولا تَهجُرُوا، ولا تَدَابروا، ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا كما أمركم الله عباد الله إخوانا . المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ههنا، ويشير إلى صدره، ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

رواه البخاري ومسلم، والسياق مأخوذ من مجموع رواياتهما .

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কারণ ধারণা হচ্ছে নিকৃষ্টতম মিথ্যা। তোমরা আঁড়ি পেতো না, গোপন দোষ অন্বেষণ করো না, স্বার্থের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ পোষণ করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না, পরস্পর কথাবার্তা বন্ধ করো না, একে অপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিও না, দাম-দস্তুরে প্রতারণা করো না এবং নিজের ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে ক্রয়-বিক্রয়ের চেষ্টা করো না। হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ যেমন আদেশ করেছেন, সবাই তোমরা আল্লাহর বান্দা

ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর জুলুম করে না; তার সাহায্য ত্যাগ করে না এবং তাকে ছোট মনে করে না। তাকওয়ার অবস্থান এইখানে–নিজ সীনার দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং তিনবার বললেন। কোনো ব্যক্তির জন্য এই খারাবিই তো যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তাচ্ছিল্য করে। আল্লাহ তোমাদের দেহের দিকে তাকান না। তিনি তাকান তোমাদের অন্তরের দিকে–এবং আঙ্গুল দ্বারা নিজের সীনার দিকে ইঙ্গিত করলেন। মুসলিমের সব কিছু অপর মুসলিমের জন্য হারাম–তার রক্ত, তার সম্পদ, তার ইজ্জত।'–বুখারী ও মুসলিম (দুই কিতাবের রেওয়ায়েতের সমষ্টি)। সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫১৪৩, ৬০৬৪, ৬০৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৫৬৩/২৮, ২৯, ৩০ ও ২৫৬৪/৩২, ৩৩

হাদীস : ৫.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : تُعْرَض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الإثنين ويوم الخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرء كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال : اركوا هذين حتى يصطلحا، اركوا هذين حتى يصطلحا.

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রতি সপ্তাহে দুইবার–সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। মহান আল্লাহ সেদিন এমন সকলকে ক্ষমা করে দেন, যারা তাঁর সাথে শরীক করে না। তবে ঐ দুই ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যারা পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করে। (তাদের সম্পর্কে) বলা হয়, পরস্পর মিলে যাওয়া পর্যন্ত এদেরকে মওকুফ রাখ। পরস্পর মিলে যাওয়া পর্যন্ত এদেরকে মওকুফ রাখ।'–সহীহ মুসলিম ২৫৬৫/৩৬, ৩৭

হাদীস : ৬.

عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا : بلى يا رسول الله. قال : إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة.

رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال : هذا حديث حسن صحيح.

আবুদ্দারদা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে সিয়াম, সালাত ও সদকার মর্তবা থেকেও শ্রেষ্ঠ বিষয় সম্পর্কে বলব না?' সবাই আরজ করলেন, 'আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন।' তিনি বললেন, 'বিবাদরতদের মাঝে শান্তি স্থাপন করা। আর জেনে রেখো, পরস্পর কলহ-বিবাদই তো মানুষকে মুড়িয়ে দেয়।'-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৭৫০৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪৯১৯; জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৫০৯

অন্য হাদীসে আছে-

لا أقول : تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين.

অর্থাৎ আমি বলি না, চুল মুড়িয়ে দেয়; বরং তা মানুষের দ্বীন মুড়িয়ে দেয়।-জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৫০৯, ২৫১০

হাদীস : ৭.

عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه ، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته ، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته ، إلا نصره الله في موطن يحب نصرته.

رواه أحمد وأبو داود، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، ولذا سكت عنه أبو داود، ومن شواهده ما عند أحمد برقم : ١٥٩٨٥ و ٢٧٥٣٦

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. ও আবু তালহা ইবনে সাহল আনসারী রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন কোনো মুসলিমের কোনো হক নষ্ট হতে থাকে এবং তার সম্মানহানী হতে থাকে তখন যে মুসলিম তাকে সাহায্য করে না তাকে স্বয়ং আল্লাহ ঐ সময় সাহায্য করবেন না যখন সে সাহায্যপ্রত্যাশী হবে। পক্ষান্তরে যে মুসলিম

অপর মুসলিমকে তার হক নষ্ট হওয়ার সময় এবং তার **সম্মান বিনষ্ট হওয়ার** সময় সাহায্য করবে স্বয়ং আল্লাহ তাকে ঐ ক্ষেত্রে সাহায্য **করবেন যেখানে** সে সাহায্যের প্রত্যাশী হবে।'–মুসনাদে আহমদ, হাদীস : **১৬৩৬৮; সুনানে** আবু দাউদ, হাদীস : ৪৮৮৪

হাদীস : ৮.

عن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته.

رواه أحمد وأبو داود، وهو صحيح لغيره، ومن شواهده حديث ثوبان عند أحمد برقم : ٢٢٤٠٢ وحديث ابن عمر عند الترمذي برقم : ٢١٥١ وابن حبان في صحيحه برقم : ٥٧٦٣

আবু বারযা আলআসলামী রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ওহে যারা মুখে মুখে ঈমান এনেছ, কিন্তু ঈমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি তারা শোন, মুসলমানের গীবত করো না এবং তাদের দোষত্রুটি অন্বেষণ করো না। কারণ যে তাদের দোষ খুঁজবে স্বয়ং আল্লাহ তার দোষ খুঁজবেন। আর আল্লাহ যার দোষ খুঁজবেন তাকে তার নিজের ঘরে লাঞ্ছিত করবেন।'–মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৯৭৭৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪৮৮০

এ সকল হাদীসের শিক্ষা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদীসে এক বাক্যে ইরশাদ করেছেন–

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

অর্থ : মুসলিম সে, যার মুখ ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে।–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১০

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর হক আদায়ের সাথে বান্দার হকও **আদায় করে** সে-ই প্রকৃত মুসলিম।

ইমাম নববী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন–

فيه جمل من العلم، ففيه الحث على الكف عما يؤذي المسلمين، بقول أو فعل، بمباشرة أو سبب، وفيه الحث على الإمساك عن احتقارهم، وفيه الحث على تألُّف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم، واستجلاب ما يُحصّل ذلك. قال القاضي عياض : والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة، ونظام شَمْل الإسلام.

এ হাদীসে রয়েছে অনেক ইলম : যেমন–নিজের কথা বা কাজের মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো মুসলিমকে কষ্ট না দেওয়ার আদেশ, কোনো মুসলিমকে উপহাস ও তাচ্ছিল্য না করার আদেশ, মুসলমানদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার এবং এর জন্য সহায়ক সকল পন্থা অবলম্বনের আদেশ ইত্যাদি।

কাযী ইয়ায রাহ. বলেছেন, সম্প্রীতি দ্বীনের অন্যতম ফরয, শরীয়তের অন্যতম রোকন এবং বৈচিত্রে পূর্ণ মুসলিমসমাজকে একতাবদ্ধ করার উপায়।–শরহু সহীহ মুসলিম ২/১০, বৈরুত

এই সকল হাদীসে যে হকগুলো বর্ণিত হয়েছে তা মুসলমানের সাধারণ হক। তা পাওয়ার জন্য মুমিন ও মুসলিম হওয়া ছাড়া আর কোনো শর্ত নেই। সুতরাং দুজন মুসলিমের মাঝে বা দুই দল মুসলমানের মাঝে কোনো দ্বীনী বা দুনিয়াবী বিষয়ে মতভেদ হলে সেখানেও এ সকল হক রক্ষা করতে হবে এবং শরীয়তের এ সকল বিধান মেনে চলতে হবে।

কোনো হাদীসে বলা হয়নি যে, দুই মুসলিমের মাঝে মতভেদ হলে তখন আর এ সকল হক রক্ষা করতে হবে না। বরং সেটিই তো আসল ক্ষেত্র এই হকগুলো রক্ষা করার। সাধারণত মতপার্থক্য দেখা দিলেই এই হকগুলো বিনষ্ট করা হয়। সুতরাং ঐ ক্ষেত্রেই যদি সকলে তা রক্ষায় সতর্ক না হয় তাহলে আর সুন্নাহর অনুসরণ ও হাদীস মোতাবেক আমলের কী অর্থ থাকে?

ইত্তিবায়ে সুন্নতের বিষয়ে এ হাদীস সবাই জানি–

من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة.

অর্থ : যে আমার সুন্নতকে ভালবাসে সে আমাকে ভালবাসে। আর যে আমাকে ভালবাসে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

কিন্তু এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ। সংশ্লিষ্ট পূর্ণ অংশটি এই-

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال لي : يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة.

رواه الترمذي في كتاب العلم، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

আনাস রা.কে সম্বোধন করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বেটা! সকাল-সন্ধ্যায় যদি এমনভাবে থাকতে পার যে, তোমার মনে কারো প্রতি বিদ্বেষ নেই তাহলে এমনভাবেই থাক। বেটা! এটি আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতকে যিন্দা করে সে আমাকে ভালবাসে। আর যে আমাকে ভালবাসে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।'-জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৬৭৮

এই সুন্নতের সম্পর্ক যেহেতু অন্তর্জগতের সাথে, তাই এর আলোচনা কম হয়ে থাকে। আমাদের কর্তব্য, ইত্তিবায়ে সুন্নতের সময় এ সুন্নতটি যেন না ভুলি এবং হাদীস অনুসরণের আহ্বানের সময় এ হাদীসটি যেন বিস্মৃত না হই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রসঙ্গত, একজন তালিবুল ইলম কেমন উস্তাদের সান্নিধ্যে থেকে ইলম হাসিল করবে; একজন সাধারণ মানুষ কেমন আলিমের কাছে যাবে, কেমন শায়খের মজলিসে বসবে; একজন সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি কাদের লেখা বইপত্র পড়বে-এ বিষয়ে যেমন ইস্তিখারা ও বিচার বিবেচনার প্রয়োজন তেমনি বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির মশোয়ারাও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধানও এই-

إنما هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.

অর্থ : এই ইলম হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং ভেবে দেখ, কার কাছ থেকে তোমার দ্বীন গ্রহণ করছ।-মুকাদ্দিমায়ে মুসলিম

কিন্তু এ মুহূর্তে এটি আলোচ্য বিষয় নয়। এখন আলোচনা আদাবুল মুআশারা বা সহাবস্থানের সাধারণ নীতি ও মুসলিম ভাইয়ের সাধারণ অধিকার সম্পর্কে। এই অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মুমিন হওয়া ছাড়া আর কোনো শর্ত নেই। তবে এ কথা সত্য যে, ইলম ও তাকওয়ার বিচারে যিনি যত অগ্রগামী তার হক তত বেশি; আমার উপর যার অবদান যত বেশি তার হকও আমার উপর তত বেশি।

শরীয়তের এ নীতি সর্বস্বীকৃত–

أنزلوا الناس منازلهم

মানুষকে তার উপযুক্ত স্থানে রাখ।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যে আমার শায়খ নয়, ইলমী মুরব্বী নয়, কিংবা দ্বীনের বিষয়ে যে ব্যক্তি অনুসরণযোগ্য নয় সেকি মুমিন মুসলমানও নয়? মুসলিমের যে হক তা কি সে পাবে না? ঈমানী ভ্রাতৃত্বের যে দাবি তা কি তার ক্ষেত্রে পূরণ করতে হবে না? অবশ্যই ঐ হক সে পাবে এবং অবশ্যই সে দাবি পূরণ করতে হবে।

এবার আমরা ঐক্য ও সম্প্রীতির অপরিহার্যতা এবং কলহ-বিবাদের বর্জনীয়তা সম্পর্কে কিছু হাদীস উল্লেখ করছি।

একতাবদ্ধ থাকা এবং আলজামাআর সাথে যুক্ত থাকার আদেশ

হাদীস : ১.

عن عمر رضي الله عنه قال : ... عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা জামাআর সাথে থাক এবং বিচ্ছিন্নতা পরিহার কর। কারণ শয়তান থাকে সঙ্গীহীনের সাথে আর দুজন থেকে সে থাকে দূরে। যে ব্যক্তি বেহেশতের মধ্যভাগ চায় সে যেন জামাআর সাথে থাকে। আর মুমিন ঐ ব্যক্তি, যাকে তার ভালো কাজ আনন্দিত করে এবং মন্দ কাজ দুঃখিত করে।'–জামে তিরমিযী, হাদীস : ২১৬৫; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১১৪

হাদীস : ২.

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومَنْ شَذَ شَذَ إلى النار.

رواه الترمذي، وهو في طبعة الشيخ شعيب برقم : ٢٣٠٥، وذكر طرقه وشواهده،

وقال : حديث حسن أو صحيح بطرقه وشواهده.

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ আমার উম্মতকে, কিংবা বলেছেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতকে গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না। আল্লাহর হাত রয়েছে জামাআর উপর। যে বিচ্ছিন্ন হয় সে জাহান্নাম অভিমুখে বিচ্ছিন্ন হয়।'—জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৩০৫; শায়খ শুআইব আরনাউতের তাহকীককৃত নুসখা)

হাদীস : ৩.

عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم

على المنبر : من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناسَ لم يشكر الله عز

وجل، والتحدُّث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب.

قال المنذري في الترغيب : بإسناد لا بأس به.

নুমান ইবনে বাশীর রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের বয়ানে বলেছেন, যে অল্প কিছুর উপর শোকরগোযারী করে না সে অনেক কিছুর উপরও শোকরগোযারি করে না। যে মানুষের শোকর করে না সে আল্লাহরও শোকর করে না। নেয়ামত পেয়ে তা বর্ণনা করাও শোকরগোযারি আর তা না করা নেয়ামতের না-শোকরী। জামাআ হল রহমত আর বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে আযাব।—যাওয়াইদুল মুসনাদ, হাদীস : ১৮৪৪৯, ১৯৩৫০; কিতাবুস সুন্নাহ, ইবনু আবী আসিম, হাদীস : ৯৩

হাদীস : ৪.

عن أبي سلمة رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا خرج

ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم.

رواه أبو داود موصولا، والصواب إرساله كما نقل الشيخ شعيب نصوص الأئمة.

আবু সালামা রাহ. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন ব্যক্তি সফরে গেলে একজনকে যেন আমীর বানায়।'–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৬০৮, ২৬০৯

মুসলমানের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য অনেক নীতি ও বিধান দেওয়া হয়েছে। ইসলামের এ সকল বিধানের উপর সংক্ষেপে নজর বুলিয়ে গেলেও পরিষ্কার হয়ে যায়, বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা পরিহার করা ইসলামের দৃষ্টিতে কত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবারে পুরুষকে কর্তা বানানো হয়েছে এবং স্ত্রী ও সন্তানদেরকে তার অনুগত থাকার আদেশ করা হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে বলা হয়েছে। জাতির সকল শ্রেণীর হক ও অধিকার নির্ধারণ করে একে অপরের সাথে যুক্ত করা হয়েছে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে–

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

অর্থ : প্রত্যেকেই তোমরা দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্ত দের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

অন্যদিকে একে অপরকে সালাম দেওয়া, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া এবং এ জাতীয় সাধারণ হক সম্পর্কে সচেতন করে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বীজ বপন করা হয়েছে।

সফরে বের হলে একজনকে আমীর বানানোর আদেশ করা হয়েছে। সুলতান ও তার স্থলাভিষিক্ত, যারা উলূল আমরের অন্তর্ভুক্ত, তাদের অনুগত থাকার জোরালো আদেশ করা হয়েছে। তবে এখানে শরীয়তের এ বিধানও আছে যে–

لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل

অর্থ : আল্লাহর অবাধ্য হয়ে মাখলুকের আনুগত্য বৈধ নয়।

ছোট ব্যক্তি, বড় ব্যক্তি, ক্ষুদ্র সমাজ, বৃহৎ সমাজ সবার আনুগত্যের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য।

মসজিদের জামাতে ইমামের অনুসরণ জরুরি। তার আগে দাঁড়ানো বা তার আগে কোনো রোকন আদায় করা নিষেধ। কাতার সোজা করা ওয়াজিব। কাতার বাঁকা হলে আছে মনের ঐক্য অন্তর্হিত হওয়ার হুঁশিয়ারি।

দ্বীন-দুনিয়ার যে কোনো যৌথ কাজে আছে শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের বিধান এবং উম্মাহর সকল শ্রেণীর জন্য রয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি–

وأمرهم شورى بينهم ও تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

কওমকে বলেছে আলিমের কাছে যাও এবং মাসাইল জিজ্ঞাসা করে সে অনুযায়ী চল। আরো বলা হয়েছে, দ্বীনদার, নেককার মানুষের সাহচর্য গ্রহণ কর। তালিবানে ইলমকে বলা হয়েছে উস্তাদের সোহবত ও সান্নিধ্য গ্রহণ কর। সর্বোপরি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে—

ليس منا من لم يُجِل كبيرنا، ويَرْحَمْ صغيرنا، ويَعْرِف لعالمنا .

قال الهيثمي في المجمع : ٨/١٤ : رواه أحمد والطبراني، وإسناده حسن .

অর্থাৎ যে আমাদের বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের দয়া করে না এবং আলিমের (হক) অনুধাবন করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।—শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস : ১৩২৮; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৭৫৫

—মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৪

উম্মাহর প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই দীক্ষা দেওয়া হয়েছে যে—

الدين النصيحة، لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم .

অর্থাৎ দ্বীন হল ওফাদারি—আল্লাহর সাথে, আল্লাহর রাসূলের সাথে, মুসলমানদের নেতৃবৃন্দের সাথে এবং আম মুসলমানদের সাথে।

মোটকথা, যৌথ ও সামাজিক জীবনের বিধিবিধান এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যেন সকল ক্ষেত্রে ঐক্য, সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার এক শান্তিময় পরিবেশ বিরাজ করে। গোটা সমাজ যেন হয় এ হাদীসের জীবন্ত নমুনা—

المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله .

অর্থাৎ মুসলিমেরা সকলে মিলে একটি দেহের মতো, যার চোখে ব্যথা হলে গোটা দেহের কষ্ট হয়, মাথায় ব্যথা হলেও গোটা দেহের কষ্ট হয়।—সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৫৮৬/৬৭

এই সুশৃঙ্খল ও শান্তিময় জীবনের সকল উপাদান সংরক্ষণ করতে হবে। কলহ-বিবাদের উপাদানগুলোকে ক্রিয়াশীল হতে দেওয়া যাবে না এবং শান্তির সমাজে অশান্তির আগুন জ্বলতে দেওয়া যাবে না। এটি ঐ হাদীসের দাবি, যাতে বলা হয়েছে, 'জামাআ হচ্ছে রহমত আর ফুরকা হচ্ছে আযাব।' ইমাম নববী ও কাযী ইয়াযের যে কথাগুলো ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাতেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

জামাআয় শামিল থাকার বিষয়ে অনেক হাদীস ও আছার রয়েছে, যা পাওয়া যাবে হাদীসগ্রন্থের কিতাবুল ফিতান, কিতাবুল ইমারাহ, কিতাবুল ইতিসাম বিলকিতাবি ওয়াস সুন্নাহ প্রভৃতি অধ্যায়ে।

এসকল হাদীস সামনে রেখে চিন্তা করলে প্রতীয়মান হয়, আলজামাআ শব্দে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শামিল আছে :

১. আমীরুল মুমিনীন বা সুলতানের কর্তৃত্ব স্বীকারকারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া এবং শরীয়তসম্মত বিষয়ে তার আনুগত্য বর্জন না করা। (দ্রষ্টব্য : ফাতহুল বারী ১৩/৩৭, হাদীস : ৭০৮৪-এর আলোচনায়)

২. শরীয়তের আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে উম্মাহর 'আমলে মুতাওয়ারাছ' তথা সাহাবা-তাবেয়ীন যুগ থেকে চলে আসা কর্মধারা এবং উম্মাহর সকল আলিম বা অধিকাংশ আলিমের ইজমা ও ঐক্যের বিরোধিতা না করা। (দ্রষ্টব্য : উসূলের কিতাবসমূহের ইজমা অধ্যায়)

৩. হাদীস-সুন্নাহ এবং ফিকহের ইলম রাখেন, এমন উলামা-মাশাইখের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখা। ইমাম তিরমিযী রাহ. আহলে ইলম থেকে আলজামাআর যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন তা এই–

أهل الفقه والعلم والحديث

অর্থাৎ জামাআ হচ্ছে ফিকহ ও হাদীসের ধারক আলিম সম্প্রদায়। (কিতাবুল ফিতান, বাবু লুযূমিল জামাআ, হাদীস : ২১৬৭-এর আলোচনায়)

৪. মুসলিমসমাজের ঐক্য, সংহতি এবং ঈমানী ভ্রাতৃত্বের উপাদানসমূহের সংরক্ষণ এবং অনৈক্য, বিবাদ ও হানাহানির উপকরণসমূহ থেকে সমাজকে মুক্ত করার প্রয়াস, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

এখানে যে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হল সাধারণত আলজামাআর ব্যাখ্যায় এগুলোকে আলাদা আলাদা মত হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এদের মাঝে কোনো সংঘর্ষ নেই। প্রত্যেকটি হচ্ছে আলজামাআর বিভিন্ন দিক। একেকজন একেকটি দিক আলোচনা করেছেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

এখানে যে কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে, উপরোক্ত হাদীসসমূহে 'আলজামাআ'র বিপরীতে এসেছে 'আলফুরকা', 'আলইখতিলাফ' নয়। অনেকে ফুরকা বা বিচ্ছিন্নতা শব্দের তরজমা করে ফেলেন ইখতিলাফ বা মতভেদ। এই তরজমা আপত্তিকর। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রথম পরিচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মতভেদ কখন বিভেদ হয়
যে বিষয়গুলো ঐক্যের পরিপন্থী নয়

মতভেদ কখন বিভেদ হয়

ভূমিকায় উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস থেকে ঐক্য ও সম্প্রীতির গুরুত্ব যেমন বোঝা যায় তেমনি এ কথাও বোঝা যায়, সকল মতভেদ বিভেদ নয়। কারণ কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী নবী ও রাসূলদের মাঝে কোনো বিভেদ ছিল না। তারা পরস্পর অভিন্ন ছিলেন। যদিও শরীয়তের বিধিবিধান সবার এক ছিল না, পার্থক্য ও বিভিন্নতা ছিল। কিন্তু তা ছিল দলিলভিত্তিক, খেয়ালখুশি ভিত্তিক–নাউযুবিল্লাহ–ছিল না। সুতরাং বোঝা গেল, ফুরূ বা শাখাগত বিষয়ে দলিলভিত্তিক মতপার্থক্য বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা নয়।

সবাই জানেন, দাউদ আ. ছিলেন আল্লাহর নবী। তাঁর পুত্র সুলায়মান আ.ও নবী ছিলেন। এক মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে দুজনের মাঝে ইজতিহাদগত মতপার্থক্য হল। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে তাদের মতপার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং সুলায়মান আ.-এর ইজতিহাদ যে তাঁর মানশা মোতাবেক ছিল সেদিকেও ইশারা করেছেন। তবে পিতাপুত্র উভয়ের প্রশংসা করেছেন। তো এখানে ইজতিহাদের পার্থক্য হয়েছে, কিন্তু বিভেদ হয়নি। এই পার্থক্যের আগেও যেমন পিতাপুত্র দুই নবী এক ছিলেন, তেমনি পার্থক্যের পরও। আয়াতটি এই–

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۝ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا.

–সূরা আম্বিয়া (২১) : ৭৮-৭৯

তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কুরতুবী (১১/৩০৭-৩১৯) ও অন্যান্য তাফসীরের কিতাব দেখে নেওয়া যায়।

বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার ছুরতগুলো ভালোভাবে জেনে নেওয়া চাই। আর তা এই–

১. দ্বীন ইসলামে দাখিল না হওয়া, ইসলামের বিরোধিতা করা বা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া–এগুলো সর্বাবস্থায় দ্বীনের ক্ষেত্রে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা।

তাওহীদ এবং দ্বীনের অন্যান্য মৌলিক বিষয়, যেগুলোকে পরিভাষায় 'জরূরিয়াতে দ্বীন' বলে, তার কোনো একটির অস্বীকার বা অপব্যাখ্যা হচ্ছে ইরতিদাদ (মুরতাদ হওয়া), যা দ্বীনের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার জঘন্যতম প্রকার। এ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় দ্বীন ইসলামকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা।

২. ইসলাম গ্রহণের পর কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী আকীদাসমূহ বোঝার ক্ষেত্রে খেয়ালখুশির অনুসরণ করে সাহাবীগণের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। এটাও বিচ্ছিন্নতা। হাদীস শরীফে কঠিন ভাষায় এর নিন্দা করা হয়েছে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য দুটি জিনিসকে দৃঢ়ভাবে ধারণের আদেশ করা হয়েছে : আসসুন্নাহ এবং আলজামাআ। এ কারণে যে জামাত সিরাতে মুসতাকীমের উপর অটল থাকে তাদের নাম 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ।'

তাদের পথ থেকে যারাই বিচ্যুত হয়েছে তারাই এই বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছে। অতপর কোনো দল ও ফের্কার জন্ম দিলে তা তো আরো জঘণ্য।

নিম্নোক্ত হাদীসগুলো লক্ষ্য করুন

প্রথম হাদীসটি সুনান-মাসানীদসহ অনেক কিতাবে আছে। এমনকি সহীহ শিরোনামে সংকলিত কোনো কোনো কিতাবেও আছে। যেমন, সহীহ ইবনে হিব্বান। আমি এখন ইমাম বুখারী রাহ. ও ইমাম আবু দাউদ রাহ.সহ আরো অনেক ইমামের উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর সংকলিত 'মুসনাদ' থেকে হাদীসটি উল্লেখ করছি।

আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. বলেন–

حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد حدثنا خالد بن معدان قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا : أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال عرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله

মতভেদ কখন বিভেদ হয়

ভূমিকায় উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস থেকে ঐক্য ও সম্প্রীতির গুরুত্ব যেমন বোঝা যায় তেমনি এ কথাও বোঝা যায়, সকল মতভেদ বিভেদ নয়। কারণ কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী নবী ও রাসূলদের মাঝে কোনো বিভেদ ছিল না। তারা পরস্পর অভিন্ন ছিলেন। যদিও শরীয়তের বিধিবিধান সবার এক ছিল না, পার্থক্য ও বিভিন্নতা ছিল। কিন্তু তা ছিল দলিলভিত্তিক, খেয়ালখুশি ভিত্তিক–নাউযুবিল্লাহ–ছিল না। সুতরাং বোঝা গেল, ফুরূ বা শাখাগত বিষয়ে দলিলভিত্তিক মতপার্থক্য বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা নয়।

সবাই জানেন, দাউদ আ. ছিলেন আল্লাহর নবী। তাঁর পুত্র সুলায়মান আ.ও নবী ছিলেন। এক মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে দুজনের মাঝে ইজতিহাদগত মতপার্থক্য হল। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে তাদের মতপার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং সুলায়মান আ.-এর ইজতিহাদ যে তাঁর মানশা মোতাবেক ছিল সেদিকেও ইশারা করেছেন। তবে পিতাপুত্র উভয়ের প্রশংসা করেছেন। তো এখানে ইজতিহাদের পার্থক্য হয়েছে, কিন্তু বিভেদ হয়নি। এই পার্থক্যের আগেও যেমন পিতাপুত্র দুই নবী এক ছিলেন, তেমনি পার্থক্যের পরও। আয়াতটি এই–

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۝ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا.

–সূরা আম্বিয়া (২১) : ৭৮-৭৯

তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কুরতুবী (১১/৩০৭-৩১৯) ও অন্যান্য তাফসীরের কিতাব দেখে নেওয়া যায়।

বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার ছূরতগুলো ভালোভাবে জেনে নেওয়া চাই। আর তা এই–

১. দ্বীন ইসলামে দাখিল না হওয়া, ইসলামের বিরোধিতা করা বা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া–এগুলো সর্বাবস্থায় দ্বীনের ক্ষেত্রে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা।

তাওহীদ এবং দ্বীনের অন্যান্য মৌলিক বিষয়, যেগুলোকে পরিভাষায় 'জরূরিয়াতে দ্বীন' বলে, তার কোনো একটির অস্বীকার বা অপব্যাখ্যা হচ্ছে ইরতিদাদ (মুরতাদ হওয়া), যা দ্বীনের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার জঘন্যতম প্রকার। এ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় দ্বীন ইসলামকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা।

২. ইসলাম গ্রহণের পর কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী আকীদাসমূহ বোঝার ক্ষেত্রে খেয়ালখুশির অনুসরণ করে সাহাবীগণের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। এটাও বিচ্ছিন্নতা। হাদীস শরীফে কঠিন ভাষায় এর নিন্দা করা হয়েছে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য দুটি জিনিসকে দৃঢ়ভাবে ধারণের আদেশ করা হয়েছে : আসসুন্নাহ এবং আলজামাআ। এ কারণে যে জামাত সিরাতে মুসতাকীমের উপর অটল থাকে তাদের নাম 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ।'

তাদের পথ থেকে যারাই বিচ্যুত হয়েছে তারাই এই বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছে। অতপর কোনো দল ও ফের্কার জন্ম দিলে তা তো আরো জঘণ্য।

নিম্নোক্ত হাদীসগুলো লক্ষ্য করুন

প্রথম হাদীসটি সুনান-মাসানীদসহ অনেক কিতাবে আছে। এমনকি সহীহ শিরোনামে সংকলিত কোনো কোনো কিতাবেও আছে। যেমন, সহীহ ইবনে হিব্বান। আমি এখন ইমাম বুখারী রাহ. ও ইমাম আবু দাউদ রাহ.সহ আরো অনেক ইমামের উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর সংকলিত 'মুসনাদ' থেকে হাদীসটি উল্লেখ করছি।

আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. বলেন–

حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد حدثنا خالد بن معدان قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا : أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال عرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله

والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

হাদীস : ১৭১৪৫, ২৮/৩৭৫; মুআসসাতুর রিসালা থেকে প্রকাশিত শায়খ শুআইব আলআরনাউত ও তাঁর সহকর্মীদের তাহকীককৃত (সম্পাদিত নুসখা)।

এরপর আরো দুটি সনদ আছে। ১৭১৪২নং হাদীসের টীকায় শায়খ শুআইব আলআরনাউত ও তাঁর সহকর্মীরা এ হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েত, সমর্থক বর্ণনা ও তাখরীজসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ এবং মুতালাক্কা বিলকবুল অর্থাৎ হাদীস ও ফিকহের ইমামগণের নিকট পরিচিত ও সমাদৃত।–আলমুসতাখরাজ, আবু নুআইম ১/৩

মূল হাদীসের তরজমা

ইরবায ইবনে সারিয়া রা. বলেন, একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। এরপর আমাদের দিকে ফিরে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করলেন। এতে আমাদের চোখ অশ্রুসজল হল এবং হৃদয় ভীতকম্পিত হল। একজন আরজ করলেন, আল্লাহ্ রাসূল! এ যেন বিদায়কালের উপদেশ। আপনি আমাদের (আরো) কী অসিয়ত করছেন? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদেরকে অসিয়ত করছি আল্লাহকে ভয় করার এবং হাবাশী গোলাম হলেও আমীরের আনুগত্য করার। কারণ আমার পর তোমাদের যারা বেঁচে থাকবে তারা বহু ইখতিলাফ দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নাহ ও আমার হেদায়েতের পথের পথিক খলীফাগণের সুন্নাহকে সর্বশক্তি দিয়ে ধারণ করবে। আর সকল নবউদ্ভাবিত বিষয় থেকে দূরে থাকবে। কারণ সকল নবউদ্ভাবিত বিষয় বিদআত। আর সকল বিদআত গুমরাহী।

হাদীসের ব্যাখ্যা

আল্লাহর রাসূলের বয়ান থেকে সাহাবায়ে কেরামের মনে হয়েছে, এটি তাঁর বিদায়ী বয়ান। তাই তাঁরা কিছু মৌলিক নীতি চেয়েছেন, যা তাঁর অনুপস্থিতিতে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে। জওয়াব থেকে বোঝা

যাচ্ছে, হয়ত তাঁরা একটি মানদণ্ড চেয়েছেন, যার দ্বারা দ্বন্দ্ব ও মতভেদের ক্ষেত্রে ফয়সালা করা যাবে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা আমার পর বেঁচে থাকবে তারা বহু ইখতিলাফ দেখতে পাবে। এখানে ইখতিলাফটা ব্যাপক। যে কোনো ধরনের ইখতিলাফ হতে পারে। ইখতিলাফ যখন হবে তখন করণীয় কী? আল্লাহর রাসূল বললেন, আমার সুন্নাহ ও আমার হেদায়েতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাহকে সর্বশক্তি দিয়ে ধরে রাখবে। অর্থাৎ যে সরল পথ ও উজ্জ্বল আদর্শের উপর তোমাদেরকে রেখে যাচ্ছি এর উপর অটল-অবিচল থাকতে চাইলে আমার সুন্নাহ এবং রাশেদ ও মাহদী খলীফাগণের সুন্নাহকে আকড়ে ধরে রাখবে। এরপর বলেছেন, নবআবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে দূরে থাকবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে–

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

যে আমাদের এই বিষয়ে (দ্বীন ও শরীয়তে) নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটায় তা পরিত্যাজ্য। এ হাদীসের আলোকে উপরের হাদীসের অর্থ হয়, দ্বীনের নামে যা কিছু প্রচার করা হয় অথচ তা দ্বীন হওয়ার কোনো দলিল নেই, তা পরিত্যাজ্য। এ হাদীসে وكل بدعة ضلالة পর্যন্ত আছে। অর্থাৎ সকল বিদআত গোমরাহী। সহীহ মুসলিমে জাবির রা.-এর হাদীসে আরেকটি কথা আছে। তা হল– وكل ضلالة في النار অর্থাৎ সকল গোমরাহীর ঠিকানা জাহান্নাম।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এটি বুনিয়াদী হাদীস। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইখতিলাফ হলে আমার সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে ধারণ করবে। তাহলে বোঝা গেল, নাজাতপ্রাপ্ত দলের একটি মানদণ্ড সুন্নাহ, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর দ্বিতীয় রোকন আলজামাআ। এটিও হাদীস শরীফে আছে। এ সংক্রান্ত হাদীসটি সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ ও সুনানে দারেমী ইত্যাদি কিতাবে আছে। সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদে হাদীসটি যেভাবে আছে তা হল–

عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال : حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الصلاة الظهر، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن

أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا الواحدة، وهي الجماعة . . . انتهى.

আবু আমির আবদুল্লাহ বলেন, আমরা মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর সাথে হজ্ব করলাম। যখন মদীনায় এলাম, যোহরের নামাযের পর তিনি দাঁড়ালেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পূর্বের দুই কিতাবধারী সম্প্রদায় তাদের ধর্মে বায়াত্তর মিল্লাতে বিভক্ত হয়েছিল। আর এই উম্মত বিভক্ত হবে তেয়াত্তর মিল্লাতে। অর্থাৎ নিজস্ব খেয়াল-খুশির অনুসারী বিভিন্ন দলে। সবগুলো দল জাহান্নামী হবে একটি ছাড়া। আর সেটি হচ্ছে 'আলজামাআ'।–মুসনাদে আহমদ ২৮/১৩৪; (মুয়াসসাতুর রিসালা থেকে প্রকাশিত, শায়খ শুআইব আলআরনাউত কর্তৃক সম্পাদিত নুসখা) হাদীস : ১৬৯৬৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪৫৯৭

হাদীসটির মান

এ হাদীস সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেছেন–

الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد، كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم

অর্থ : হাদীসটি সহীহ। এটি সুনান ও মাসানীদের কিতাবের মশহূর হাদীস। আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও অন্যান্যদের সুনানে তা আছে।–মাজমুউল ফাতাওয়া ৩/৩৪৫

জামে তিরমিযীতে হাদীসটির পাঠ এই–

تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا : من هي يا رسول الله؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي

অর্থাৎ আমার উম্মত তিয়াত্তর মিল্লাতে বিভক্ত হবে। একটি ছাড়া বাকি সবগুলোই যাবে জাহান্নামে। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর রাসূল! সেই এক দলে কারা থাকবেন? বললেন, 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী।' অর্থাৎ যারা আমার ও আমার সাহাবীদের আদর্শের উপর থাকবে।–জামে তিরমিযী ২/৯২, হাদীস : ২৮৩২

ইমাম তিরমিযী রাহ. বলেছেন–

هذا حديث حسن غريب مفسر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه

অর্থ : এটি হাসান, গরীব ও মুফাসসার হাদীস; হাদীসটি এভাবে শুধু এই সূত্রেই আমরা পাই।–জামে তিরমিযী ২/৯২, হাদীস : ২৮৩২

'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' অর্থাৎ নাজাতপ্রাপ্ত তারা যারা ঐ পথে আছে, যে পথে আমি ও আমার সাহাবীরা রয়েছি। এখানে 'মা' দ্বারা সুন্নাহকে নির্দেশ করা হয়েছে। তাহলে এই হাদীসে 'মা-আনা আলাইহি' শব্দে তাই বলা হয়েছে, যা আগের হাদীসে 'আলাইকুম বিসুন্নাতী' শব্দে বলা হয়েছিল। অর্থাৎ আমার সুন্নাহকে ধারণ কর।

তাহলে আমরা দুটি বিষয় পেলাম : ১. সুন্নাহ, তথা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ, যা সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহও বটে। ২. জামাআহ।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ নামটি এখনের নয়। সাহাবায়ে কেরামের যামানা থেকে চলে আসছে। কখনো পুরা নাম উল্লেখ করা হত, কখনো সংক্ষেপে শুধু আহলুস সুন্নাহ বলা হত। সূরা আল ইমরানের ১০৬ নং আয়াতের তাফসীরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে পুরা নাম বর্ণিত হয়েছে। আয়াতটি হল–يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন–

تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة

–তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৫৮৪

ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর মাজমুউল ফাতাওয়ায়ও (৩/২৭৮) তা আছে।

এ নামটি সংক্ষিপ্তভাবেও বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামায় ইবনে সীরীন রাহ.-এর বক্তব্যে। তিনি বলেন–

لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم أو ينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.

মনে রাখতে হবে, সুন্নাহ ও জামাআহ, একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারো মনে হতে পারে, কোনো দলের মাঝে 'জামাআহ' না থাকলেও 'সুন্নাহ' থাকতে পারে। তাদের নাম হতে পারে–'আহলুস সুন্নাতি ওয়াল ফুরকা'। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। কারণ

ফুরকা বা বিভেদ হচ্ছে মারাত্মক সুন্নাহ পরিপন্থী বিষয়। কাজেই বিভেদ সৃষ্টিকারী কখনো সুন্নাহর অনুসারী নয়। তেমনি বিদআতী হয়ে জামাআহ রক্ষাকারী কি হতে পারে? পারে না। কারণ বিদআতীর চরিত্রই হচ্ছে সুন্নাহ অনুসারীদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানানো। তো সুন্নাহ ত্যাগের কারণে এক বিভেদ তো প্রথমেই তৈরি করেছে, এখন সুন্নাহর অনুসারীদেরকে টার্গেট করে আরো বিভেদের জন্ম দিচ্ছে। মোটকথা, সুন্নাহ ও জামআহ একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর ভাষায়–

والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال : أهل السنة والجماعة، كما يقال : أهل البدعة والفرقة.

অর্থাৎ বিদআযুক্ত ফুরকার (বিভেদের) সাথে যেমন সুন্নাহ যুক্ত জামাআর সাথে।–আলইসতিকামাহ পৃ. ৩৭

৩. আলজামাআর ব্যাখ্যায় উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির প্রসঙ্গে প্রথম যে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে তার কোনো একটি ভঙ্গ করা কিংবা কোনো একটি থেকে বিচ্যুত হওয়া পরিষ্কার বিচ্ছিন্নতা।

ফুরূয়ী মাসাইল বা শাখাগত বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের যে মতপার্থক্য, যাকে ফিকহী মাযহাবের মতপার্থক্য বলে, তা দ্বীনের বিষয়ে বিচ্ছিন্নতা নয়। আগেও এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কারণ ফিকহের এই মাযহাবগুলো তো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ইমামগণেরই মাযহাব। এগুলো 'বিচ্ছিন্নতা নয়; বরং গন্তব্যে পৌঁছার একাধিক পথ, যা স্বয়ং গন্তব্যের মালিকের পক্ষ হতে স্বীকৃত ও অনুমোদিত। ফির্কা ও ফিকহী মাযহাবের পার্থক্য বুঝতে ব্যর্থ হওয়া খুবই দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক বিষয়।

সাহাবায়ে কেরামের যুগেও ফিকহের মাযহাব ও ফিকহের মতপার্থক্য ছিল, অথচ তাঁরা খেয়ালখুশির মতভেদ কখনো সহ্য করতেন না। তাদের কাছে এ জাতীয় মতভেদকারীদের উপাধি ছিল 'আহলুল আহওয়া', 'আহলুল বিদা ওয়াদ দ্বলালাহ' এবং 'আহলুল বিদআতি ওয়াল ফুরকা'। সাহাবায়ে কেরামের যুগের ফিকহের মাযহাব সম্পর্কে ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রাহ.-এর বিবরণ শুনুন :

১. ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রাহ. (১৬১ হি.–২৩৪ হি.) ইমাম বুখারী রাহ.-এর বিশিষ্ট উস্তাদ ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সেসব ফকীহের

কথা আলোচনা করেছেন, যাদের শাগরিদগণ তাঁদের মত ও সিদ্ধান্তগুলো সংরক্ষণ করেছেন, তা প্রচার প্রসার করেছেন এবং যাদের মাযহাব ও তরীকার উপর আমল ও ফতওয়া জারি ছিল। আলী ইবনুল মাদীনী রাহ. এই প্রসঙ্গে বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন ব্যক্তি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. (মৃত্যু : ৩২ হিজরী), যাইদ ইবনে ছাবিত রা. (জন্ম : হিজরতপূর্ব ১১ ও মৃত্যু : ৪৫ হিজরী) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. (জন্ম : হিজরতপূর্ব ৩ ও মৃত্যু : ৬৮ হিজরী)।

তাঁর আরবী বাক্যটি নিম্নরূপ–

ولم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صُحَيْبَةٌ، يذهبون مذهبه، ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته، إلا ثلاثة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فإن لكل منهم أصحابا يقومون بقوله ويفتون الناس.

এরপর আলী ইবনুল মাদীনী রাহ. তাঁদের প্রত্যেকের মাযহাবের অনুসারী ও তাঁদের মাযহাব মোতাবেক ফতওয়া দানকারী ফকীহ তাবেয়ীগণের নাম উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর যে শাগরিদগণ তাঁর কিরাত অনুযায়ী মানুষকে কুরআন শেখাতেন, তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানুষকে ফতওয়া দিতেন এবং তাঁর মাযহাব অনুসরণ করতেন তারা হলেন নিম্নোক্ত ছয়জন মনীষী। আলকামাহ (মৃত্যু : ৬২ হিজরী), আসওয়াদ (মৃত্যু : ৭৫ হিজরী), মাসরূক (মৃত্যু : ৬২ হিজরী), আবীদাহ (মৃত্যু : ৭২ হিজরী), আমর ইবনে শারাহবীল (মৃত্যু : ৬৩ হিজরী) ও হারিস ইবনে কাইস (মৃত্যু : ৩৬ হিজরী)।

ইবনুল মাদীনী রাহ. বলেছেন, ইবরাহীম নাখায়ী রাহ. (৪৬-৯৬ হিজরী) এই ছয়জনের নাম উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রাহ.-এর উপরোক্ত বিবরণের সংশ্লিষ্ট আরবী পাঠ নিম্নরূপ–

الذين يقرؤن الناس بقراءته ويفتونهم بقوله ويذهبون مذهبه . . .

এরপর আলী ইবনুল মাদীনী রাহ. লিখেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর (ফকীহ) শাগরিদদের সম্পর্কে এবং তাঁদের মাযহাবের বিষয়ে সবচেয়ে বিজ্ঞ ছিলেন ইবরাহীম (নাখায়ী) (৪৬-৯৬ হিজরী) ও আমের ইবনে শারাহীল শাবী (১৯-১০৩ হিজরী)। তবে শাবী মাসরূক রাহ.-এর মাযহাব অনুসরণ করতেন।

আরবী পাঠ নিম্নরূপ–

وكان أعلم أهل الكوفة بأصحاب عبد الله ومذهبهم إبراهيم والشعبي إلا أن الشعبي كان يذهب مذهب مسروق.

এরপর লিখেছেন–

وكان أصحاب زيد بن ثابت الذين يذهبون مذهبه في الفقه ويقومون بقوله هؤلاء الاثنى عشر . . .

অর্থাৎ যাইদ ইবনে ছাবিত রা.-এর যে শাগরিদগণ তাঁর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং তাঁর মত ও সিদ্ধান্তসমূহ সংরক্ষণ ও প্রচার প্রসারে মগ্ন ছিলেন তাঁরা বারো জন।

তাদের নাম উল্লেখ করার পর ইবনুল মাদীনী রাহ. লেখেন, এই বারো মনীষী ও তাদের মাযহাবের বিষয়ে সবচেয়ে বিজ্ঞ ছিলেন ইবনে শিহাব যুহরী (৫৮-১২৪ হিজরী), ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ আনসারী (মৃত্যু : ১৪৩ হিজরী), আবুয যিনাদ (৬৫-১৩১ হিজরী),আবু বকর ইবনে হাযম (মৃত্যু ১২০ হিজরী)।

এদের পরে ইমাম মালেক ইবনে আনাস রাহ. (৯৩-১৭৯ হিজরী)।

এরপর ইবনুল মাদীনী রাহ. বলেছেন–

وكما أن أصحاب ابن عباس ستة الذين يقومون بقوله ويفتون به ويذهبون مذهبه.

তদ্রূপ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর যে শাগরিদগণ তার মত ও সিদ্ধান্তসমূহ সংরক্ষণ ও প্রচারে মগ্ন ছিলেন, সে অনুযায়ী ফতওয়া দিতেন এবং তার অনুসরণ করতেন, তাঁরা ছয়জন।

এরপর তিনি তঁদের নাম উল্লেখ করেন।

ইমাম ইবনুল মাদীনী রাহ.-এর পূর্ণ আলোচনা তাঁর 'কিতাবুল ইলালে' (পৃষ্ঠা : ১০৭-১৩৫, প্রকাশ : দারুবনিল জাওযী রিয়ায, ১৪৩০ হিজরী।) বিদ্যমান আছে এবং ইমাম বাইহাকী রাহ.-এর 'আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা'তেও (পৃষ্ঠা : ১৬৪-১৬৫) সনদসহ উল্লেখিত হয়েছে। আমি উক্তিটি দোনো কিতাব সামনে রেখেই উদ্ধৃত করছি। এই কথাগুলো আলোচ্য বিষয়ে এতই স্পষ্ট যে, এখানে আর কোনো টীকা-টিপ্পনীর প্রয়োজন নেই।

সুতরাং মনে রাখতে হবে, ইমামগণের ফিকহী মাযহাবের যে মতপার্থক্য তাকে বিভেদ মনে করা অন্যায় ও বাস্তবতার বিকৃতি এবং সাহাবায়ে কেরামের নীতি ও ইজমার বিরোধিতা। আর এ মতপার্থক্যের বাহানায় মাযহাব অনুসারীদের থেকে আলাদা হয়ে তাদের নিন্দা-সমালোচনা করা সরাসরি বিচ্ছিন্নতা, যা দ্বীনের বিষয়ে বিভেদের অন্তর্ভুক্ত।

তেমনি মাযহাবের অনুসারী কোনো ব্যক্তি বা দল যদি মাযহাবকে জাহেলী আসাবিয়াত ও দলাদলির কারণ বানায় তাহলে তার/তাদের এই কাজও নিঃসন্দেহে ঐক্যের পরিপন্থী এবং বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার শামিল।

দেখুন, 'মুহাজিরীন' ও 'আনসার' কত সুন্দর দুটি নাম এবং কত মর্যাদাবান দুটি জামাত। উভয় জামাতের প্রশংসা কুরআন মজীদে রয়েছে। কিন্তু এক ঘটনায় যখন এ দুই নামের ভুল ব্যবহার হয়েছে তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে তাম্বীহ করেছেন।

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, এক সফরে এক মুহাজির তরুণ ও এক আনসারী তরুণের মাঝে কোনো বিষয়ে ঝগড়া হয়। মুহাজির আনসারীকে একটি আঘাত করল। তখন আনসারী ডাক দিল, يا للأنصار! হে আনসারীরা!; মুহাজির তরুণও ডাক দিল-يا للمهاجرين হে মুহাজিররা!; আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আওয়াজ শোনামাত্র বললেন-ما بال دعوى جاهلية এ কেমন জাহেলী ডাক! কী হয়েছে? ঘটনা বলা হল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন জাহেলী ডাক ত্যাগ কর। এ তো দুর্গন্ধযুক্ত ডাক!

অন্য বর্ণনায় আছে, এতে তো বিশেষ কিছু ছিল না। (কেউ যদি কারো উপর জুলুম করে তাহলে) সকলের কর্তব্য, তার ভাইয়ের সাহায্য করা। সে জুলুম করুক বা তার উপর জুলুম করা হোক। জালিম হলে তাকে বাধা দিবে। এটাই তার সাহায্য। আর মাজলুম হলে তার সাহায্য করবে (জুলুম থেকে রক্ষা করবে)।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৯০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৫৮৪/৬২, ৬৩

হাদীসের অর্থ হচ্ছে, কারো উপর জুলুম হতে থাকলে সাহায্যের জন্য ডাকতে বাধা নেই। কিন্তু ডাকবে সব মুসলমানকে। যেমন উপরোক্ত ঘটনায় আনসারী মুহাজিরদেরকেও ডাকতে পারতেন এবং মুহাজির আনসারীদেরকে ডাকতে পারতেন। কিংবা ভাইসব! মুসলমান ভাইরা! বলেও ডাকা যেত। কিন্তু এমন কোনো ডাক মুসলমানের জন্য শোভন নয়, যা থেকে আসাবিয়ত ও দলাদলির দুর্গন্ধ আসে। কারণ তা ছিল জাহেলী যুগের প্রবণতা। ঐ সময়

সাহায্য ও সমর্থনের ভিত্তি ছিল বংশীয় বা গোত্রীয় পরিচয়। ইসলামে সাহায্যের ভিত্তি হচ্ছে ন্যায় ও ইনসাফ।

وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

এ কারণে ইসলামের নিয়ম, জালিমকে আটকাও সে যেই হোক না কেন। তোমার দলের বা তোমার বংশেরই হোক না কেন। হাদীসে আছে–

ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل عصبية، وليس منا من مات على عصبية

'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আসাবিয়তের দিকে ডাকে, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আসাবিয়তের কারণে লড়াই করে এবং সে-ও নয়, যে আসাবিয়তের উপর মৃত্যুবরণ করে।'–আবু দাউদ, হাদীস : ৫১২১

অন্য হাদীসে আছে–

يا رسول الله! ما العصبية؟ قال : أن تعين قومك على ظلم.

'আল্লাহর রাসূল! আসাবিয়ত কী? বললেন, নিজের কওমকে তার অন্যায়-অবিচারের বিষয়ে সাহায্য করা।'–আবু দাউদ, হাদীস : ৫১১৯

তো ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, 'মুহাজির' ও 'আনসার' দুটি আলাদা নাম, আলাদা জামাত, আলাদা পরিচয়–এতে আপত্তির কিছু নেই। আপত্তি তখনই হয়েছে যখন নাম দুটি এমনভাবে ব্যবহার করা হল, যা থেকে আসাবিয়তের দুর্গন্ধ আসে। এ শিক্ষা ফিকহি মাযহাবের ভিত্তিতে আলাদা জামাত ও আলাদা পরিচয় কিংবা অন্য কোনো বৈধ বা প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণী ও পরিচয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ নীতি সব ক্ষেত্রেই মনে রাখা উচিত। অর্থাৎ এ ধরনের বিভিন্নতায় কোনো অসুবিধা নেই, যদি তাকে বিভিন্নতার মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা পর্যন্ত না নেওয়া হয়; একে মুয়ালাত ও মুআদাত তথা বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মানদণ্ড এবং আসাবিয়াতের কারণ না বানানো হয়। উপরের হাদীস থেকে আসাবিয়াতের অর্থও পরিষ্কার হয়ে গেছে। তা এই যে, কোনো ব্যক্তি বা মত কিংবা কোনো গোত্র বা দলের শুধু এজন্য সমর্থন করা যে, তারা আমার আপন। চাই তারা হকের উপর থাকুক অথবা বাতিলের উপর, সঠিক বলুক অথবা ভুল! অথচ ইসলামে সমর্থনের ভিত্তি হচ্ছে দলিল ও ইনসাফ। জুলমের ক্ষেত্রে কারো সহযোগিতা করা হারাম সে যতই আপন হোক না কেন। তেমনি দলিলের বিপরীতে কোনো

মত বা মাযহাবের সমর্থন করা হারাম। কারণ দলিলহীন বিয়ষেরই যখন কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই তখন দলিল বিরোধী বিষয়ের কথা তো বলাই বাহুল্য।

কথা দীর্ঘ হয়ে গেল। আমি আরজ করছিলাম, ফুরূয়ী ইখতিলাফকে দ্বীনের বিষয়ে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার মধ্যে দাখিল করা এবং ফিকহী মাযহাবের অনুসরণকে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা সাব্যস্ত করা জায়েয নয়। প্রসঙ্গত আরো দু'চারটি কথা বলি। যদিও সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

শরীয়তের রীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে যাদের সঠিক ধারণা নেই তারা ইখতিলাফ শব্দটি শোনামাত্রই ভ্রূকুঞ্চিত করেন এবং কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়েন, বিশেষত নামাযের মতো মৌলিক ইবাদতের বিষয়ে ইখতিলাফ, যা ঈমানের পর ইসলামের সবচেয়ে বড় রোকন, তাদের পক্ষে একেবারেই যেন অসহনীয়!

তাদের জানা থাকা উচিত, ইখতিলাফমাত্রই পরিত্যাজ্য নয়। কেননা কিছু ইখতিলাফ বা মতভেদ আছে, যার প্রেরণা দলীলের অনুসরণ। স্বয়ং দলীলই ওই মতভেদের উৎস। আর কিছু মতভেদ আছে, যা সৃষ্টি হয় মূর্খতা ও হঠকারিতার কারণে। দলীল সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা দলীলের শাসন মানতে অস্বীকৃতিই এই মতভেদের উৎস। প্রথম ইখতিলাফ বা মতভেদ শরীয়তে স্বীকৃত আর দ্বিতীয়টা নিন্দিত। বিষয়গত দিক থেকে ঈমানিয়াত ও আকাইদ অর্থাৎ ইসলামের সকল মৌলিক আকীদা এবং শরীয়তের সকল অকাট্য মাসআলা ঐ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যেখানে দলীলভিত্তিক কোনো ইখতিলাফ-মতভেদ হতেই পারে না। এজন্য দেখবেন, এসব বিষয়ে দ্বীনের ইমামগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। এক্ষেত্রে কেউ মতভেদ করলে তা অবশ্যই হঠকারিতা। আর ওই মতভেদকারী হয় মুবতাদি (বিদআতী) কিংবা মুলহিদ (বেদ্বীন)। কিন্তু ফুরূয়ী মাসাইল, এতেও শ্রেণীভেদ রয়েছে, এর ধরন ভিন্ন। এখানে দলীলভিত্তিক মতভেদ হতে পারে এবং হয়েছে। শরীয়তে এটা স্বীকৃত এবং শরীয়তই একে বহাল রেখেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ এবং সাহাবা ও তাবেয়ীন যুগেও এটা ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এই মতভেদের বিষয়ে শরীয়তের বিধান হল তা বিলুপ্ত করার চেষ্টা ভুল এবং একে বিবাদ-বিসংবাদের মাধ্যম বানানো অপরাধ। দলীলভিত্তিক মতভেদ স্বীকৃত; বরং নন্দিত, কিন্তু বিবাদ-বিসংবাদ হারাম ও নিষিদ্ধ।

এই শ্রেণীর ফুরূয়ী ইখতিলাফ (শাখাগত বিষয়ে মতভেদ) প্রকৃতপক্ষে গন্তব্যে পৌছার একাধিক পথ। সিরাতে মুস্তাকীমেরই বিভিন্ন পথরেখা। এগুলোর কোনোটাকেই প্রত্যাখ্যান করা কিংবা অনুসরণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। এটা ইলাহী নীতির বিরোধী, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যবান মুবারকে উচ্চারিত হয়েছে–

كلاكما محسن فاقرءا

'দুজনই সঠিক, অতএব পড়তে থাক।' (সহীহ বুখারী হাদীস : ৫০৬২)

এবং তার কর্ম দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে–

فما عنّفَ واحدا من الفريقين

'অতঃপর কোনো দলকেই তিনি ভর্ৎসনা করলেন না।'

এ ধরনের আরো বহু দলীলে যা উল্লেখিত হয়েছে।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, এই মতভেদ বহাল রাখার তাৎপর্য কী, তাহলে এর সুনিশ্চিত ও বিস্তারিত উত্তর তো আখিরাতেই আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জানা যেতে পারে–কেন তিনি দ্বীনের সকল বিষয় এক পর্যায়ের দলীল قطعيُّ الثُّبوت وقطعيُّ الدَّلالة -এর মাধ্যমে দিলেন না, তাহলে তো বাস্তব/যৌক্তিক মতভিন্নতার সুযোগই থাকত না। আর ফিকহী যেসব মাসআলায় মতভিন্নতা দেখা যায় সেসব ক্ষেত্রেও তখন আমরা বলে দিতে পারতাম যে, বাইয়্যিনাত থাকার পর তো কোনো মতভিন্নতা বৈধ নয়! আখিরাতেই বিস্তারিত জানা যাবে যে, আল্লাহ তাআলা অভিন্ন গন্তব্যের জন্য বিভিন্ন পথ কেন নির্দেশ করলেন, সিরাতে মুস্তাকীমে বিচিত্র পথ-রেখার সমাবেশ কেন ঘটালেন। তিনি কি ইচ্ছা করলে ফুরূয়ের মধ্যেও সিরাতে মুস্তাকীমের একটিমাত্র ধারাই জারি করতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন। যেমন করেছেন মৌলিক আকায়েদ ও জরুরিয়াতে দ্বীনের ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানে রয়েছে প্রজ্ঞার অতল গভীরতা, যার সবটা জেনে ফেলার আকাঙ্খাই হাস্যকর। তবে যতটুকু তিনি বান্দাদের সামনে প্রকাশ করেছেন তা-ও প্রশান্তির জন্য যথেষ্ট। যারা এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক তারা 'আসবাবুল ইখতিলাফ' ও 'আদাবুল ইখতিলাফ' বিষয়ে বিশদ ও গ্রহণযোগ্য কিতাবপত্র অধ্যয়ন করতে পারেন।

মনে রাখা দরকার, যে মতভেদের ভিত্তি দলীলের উপর নয়; মূর্খতা, হঠকারিতা এবং ধারণা ও সংশয়ের উপর, তা আপাদমস্তক নিন্দিত। দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদি এবং অকাট্য ও ইজমায়ী মাসআলাগুলোতে দ্বিমত প্রকাশ

এই নিন্দিত মতভেদেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এটা 'মতভেদ' নয়, 'দলীলের বিরোধিতা'; 'ইখতিলাফ' নয় 'মুখালাফাত'। এই বিরোধী ব্যক্তি সিরাতে মুসতাকীম থেকে বিচ্যুত। তার গন্তব্য ও ন্যায়নিষ্ঠ মুমিনের গন্তব্য এক নয়। সে তো এক ভিন্ন লক্ষ্যের অভিযাত্রী, যার পরিচয় হল–

مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النار

বলাবাহুল্য, সিরাতে মুসতাকীমের অন্তর্গত বিভিন্ন পথ এবং সিরাতে মুসতাকীম থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন পথের হুকুম এক নয়। প্রথম ক্ষেত্রে পথরেখা বাহ্যত বিভিন্ন হলেও প্রকৃত পক্ষে তা একই পথের অন্তর্গত। আর লক্ষ্য ও মঞ্জিল যে অভিন্ন তা তো বলাই বাহুল্য। আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে পথও ভিন্ন, লক্ষ্যও ভিন্ন। প্রথম ক্ষেত্রে পথগুলো নিরাপদ ও স্বীকৃত আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিপদসঙ্কুল ও পরিত্যাক্ত।

এ কারণে সিরাতে মুসতাকীমের উপর পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ইমাম ও আলিমদের মাঝে ফুরূয়ী মতপার্থক্য হলেও বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার কোনো আলামত প্রকাশিত হয়নি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের তরীকাকে বিভেদ ও বিদআত থেকে বাঁচার মানদণ্ড বলেছেন, অথচ ফুরূয়ী মাসআলায় তাঁদের মাঝেও মতপার্থক্য হয়েছে, কিন্তু এ কারণে বিভেদ হয়নি এবং প্রীতি ও সম্প্রীতি নষ্ট হয়নি। তাঁদের দিল অভিন্ন ছিল। ঐ ইখতিলাফ তাঁদের ইজতিমায়ী যিন্দেগীতে কোনো প্রকারের অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারেনি। তো বোঝা গেল, দলিল ও ইজতিহাদভিত্তিক এই মতপার্থক্য বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা নয়। হ্যাঁ, কেউ যদি ঐ ফুরূয়ী ইখতিলাফকে বিভেদের কারণ বানায় তাহলে সেটা তার অজ্ঞতা, যা সংশোধন করা ফরয।

আবু আবদুল্লাহ আলউকবুরী রাহ. (৩৮৭ হি.) 'আলইবানা'য় (খ- : ১, পৃষ্ঠা : ২০৫-২১১) এবং আবুল মুযাফফর আসসামআনী রাহ. (৪৮৯ হি.) 'আলইনতিসার লিআহলিল হাদীস' কিতাবে এ বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। আবুল মুযাফফরের বক্তব্য আবুল কাসিম আততাইমী রাহ.ও (৫৩৫ হি.) 'আলহুজ্জা ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ' ও 'শরহু আকীদাতি আহলিস সুন্নাহ'য় (খ- : ২, পৃষ্ঠা : ২৩৭-২৪৪) নকল করেছেন।

আবুল মুযাফফরের বক্তব্যের কিছু অংশ নকল করছি :

وبهذا يظهر مفارقة الاختلاف في مذاهب الفروع اختلاف العقائد في الأصول، فإنا

الدين فلم يفترقوا ولم يصيروا شيعا، لأنهم لم يفارقوا الدين، ونظروا فيما أذن لهم فاختلفت أقوالهم وآراؤهم في مسائل كثيرة . . .

فصاروا باختلافهم في هذه الأشياء محمودين، وكان هذا النوع من الاختلاف رحمة من الله لهذه الأمة، حيث أيدهم باليقين، ثم وسع على العلماء النظر فيما لم يجدوا حكمه في التنزيل والسنة، فكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة ونصح، وبقيت بينهم أخوة الإسلام، ولم يقطع عنهم نظام الألفة.

فلما حدثت هذه الأهواء المردية الداعية صاحبها إلى النار ظهرت العداوة وتباينوا (أي المبتدعين أصحاب الأهواء) وصاروا أحزابا، فانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة،

فهذا يدل على أن هذا التباين والفرقة إنما حدثت من المسائل المحدثة . . . إلى آخر ما قال فأجاد وأفاد.

এই পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ

সারকথা এই যে, ইখতিলাফে মাযমূম (নিন্দিত ইখতিলাফ) তো গোড়া থেকেই বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার শামিল। এই বিচ্ছিন্নতার পর যতই ঐক্যের প্রদর্শনী করা হোক এবং প্রীতি ও সম্প্রীতির আহ্বান জানানো হোক কিংবা বাস্তবেও তা করা হোক সর্বাবস্থায় তা বিচ্ছিন্নতা। প্রীতি ও সম্প্রীতির দ্বারা দ্বীনের ক্ষেত্রে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার খারাবি দূর হয় না; বরং আরো বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে ইখতিলাফে মাহমূদ (নন্দিত ইখতিলাফ) বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা নয়, কিন্তু যে তাকে বিভেদের কারণ বানায় সে নিজে বিচ্ছিন্নতার শিকার। তার উপর ফরয, ইখতিলাফের নীতি ও বিধান সম্পর্কে জানা এবং সকল ইখতিলাফকে স্ব স্ব পর্যায়ে রাখা।

নন্দিত ইখতিলাফ বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা যেভাবে হয়–

১. দলিল দ্বারা প্রমাণিত অন্য মত বা পদ্ধতিকে অস্বীকার করা।

২. দ্বিতীয় মত বা পদ্ধতির অনুসারীদের সম্পর্কে কটূক্তি করা। তাদেরকে হাদীস বিরোধী ও সুন্নাহ বিরোধী আখ্যা দেওয়া, বিদআতী বা গোমরাহ বলা ...

৩. দ্বিতীয় মত বা পদ্ধতি অনুসরণে বাধা দেওয়া কিংবা অনুসারীর জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর উপর আক্রমণ করা, তাকে শারীরিকভাবে কষ্ট দেওয়া।

৪. দ্বিতীয় মত ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার সময় ঐ মত ও পদ্ধতি বা তার দলিল বর্ণনার ক্ষেত্রে ইলমী খিয়ানত করা বা কোনো ধরনের না-ইনসাফী করা।

৫. এই ইখতিলাফের কারণে মানবীয় হকসমূহ এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্বের হকসমূহ রক্ষা না করা, যার কিছু আলোচনা ভূমিকায় পৃ. ২২-২৬ এসেছে।

৬. এই ইখতিলাফের কারণে দ্বীনের সম্মিলিত কাজসমূহে একে অপরের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকা।

৭. এই ইখতিলাফের কারণে পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

৮. এইসব বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে উম্মতের সামষ্টিক সমস্যা থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া এবং জরুরিয়াতে দ্বীন ও শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহের প্রচার-প্রতিষ্ঠায় উদাসীন হয়ে যাওয়া।

৯. নিজের মত ও মাযহাবের লোকদের ভুল-ভ্রান্তির প্রতিবাদ না করা এবং তাদের সংশোধনের বিষয়ে উদাসীন থাকা।

১০. অন্যান্য তরীকা ও মাযহাবের অনুসারীদের গুণাবলি অস্বীকার করা এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করা।

সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে বর্তমান যুগের সর্বজনপ্রিয় মুহাক্কিক আলিম মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর কিছু কথা নকল করছি, যা ইনশাআল্লাহ মতভেদকে বিভেদ বানানো থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। তিনি জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ আলইসলামিয়ার সাবেক প্রফেসর, মুহাদ্দিসে শাম, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. (১৩৩-১৪১৭ হি.)-এর ইন্তেকালের পর মাসিক আলবালাগে প্রকাশিত তার অনুভূতিতে লিখেছিলেন–

'হযরত শায়খ রাহ. আল্লামা মুাহম্মাদ যাহিদ আলকাউসারী রাহ.-এর খাস শাগরিদ ছিলেন। আল্লামা কাওসারী রাহ-এর বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি তার অগাধ পাণ্ডিত্যের দ্বারা মাযহাবে হানাফী ও মাসলাকে আশাইরার পক্ষে মজবুত মোকাবেলা করেছেন এবং যারা ফুরূয়ী ইখতিলাফকে কেন্দ্র করে হানাফী ও আশআরী আলিমদেরকে নিন্দা ও কটূক্তির লক্ষ্যবস্তু

বানিয়েছে তাদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। অন্যান্য আলিমদের মতো আল্লামা কাওসারী রাহ.-এরও কোনো কোনো কথা ও উপস্থাপনার সাথে দ্বিমত পোষণের অবকাশ আছে, কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি ঐ মজলূম আহলে ইলম জামাতের পক্ষ হতে জবাব দেওয়ার ফরযে কিফায়া দায়িত্ব পালন করেছেন, যাদের উপর কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়াই গোমরাহ আখ্যা দেওয়া এবং কটুক্তি সমালোচনার তীরবৃষ্টি করা হয়েছে।

হযরত শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. এ বিষয়েও তাঁর উস্তায আল্লামা কাওসারী রাহ.-এর উত্তরসূরীর হক আদায় করেছেন। তবে পার্থক্য এই যে, হযরত শায়খ রাহ.-এর লিখনীতে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী উলামায়ে সালাফের বিরুদ্ধে আক্রমণ বা বেআদবীর লেশমাত্র প্রবেশ করতে পারেনি। ঐসব বিষয়ে তিনি তার আলোচনা খাঁটি ইলমী ও শাস্ত্রীয় সীমানায় সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং সর্বদা ইলমী সীমানায় থেকে তাহকীকের হক আদায় করেছেন। একে ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছতে দেননি। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. ও হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রাহ.-এর সাথে এসব বিষয়ে তার ইখতিলাফ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট, কিন্তু এই ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে কোনো ভারী বাক্য তার যবান বা কলম থেকে বের হতে আমি কখনো দেখিনি। বরং আমি নিজে সাক্ষী যে, হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রাহ.-এর ইলমী মাকাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে একবার তিনি কেঁদে দিয়েছিলেন। তাঁর সামনে একবার আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর আলোচনা কেউ এমন ভাষায় করেছিল, যা তার শায়ানে শান ছিল না। এ কারণে তিনি নারাজি প্রকাশ করেছিলেন।

এই সতর্কতার পরও কোনো কোনো মহল তার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে শুধু পর্যালোচনাই নয়, এমন নিন্দা ও কটুক্তির লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল, যা কোথাও কোথাও গালিগালাজের সীমানাতেও প্রবেশ করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সব যুগে আল্লাহর দ্বীনের খাদিমদের এ ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে, যা তাদের জন্য তরক্কির উপায় হয়েছে। হায়! যদি মুসলিম উম্মাহর মাঝে ইখতিলাফকে ইখতিলাফের গণ্ডির মাঝে সীমাবদ্ধ রাখার রুচি পয়দা হত তাহলে আমাদের কাতারে সৃষ্টি হওয়া কত শূন্যস্থান যে পূরণ হয়ে যেত!

এক্ষেত্রে আমাদের ওয়ালিদ মাজিদ (হযরত মাওলানা মুফতী শফী ছাহেব রাহ.)-এর সুচিন্তিত কর্মপন্থা এই ছিল যে, ফুরূয়ী ইখতিলাফসমূহকে

আম মানুষের মাঝে বিস্তারের পরিবর্তে খালিস ইলমী ও তাহকীকী হালকাসমূহের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। আর যে পর্যন্ত কারো চিন্তাধারা স্পষ্ট গোমরাহী বা কুফর পর্যন্ত না পৌঁছে তার সাথে ফুরূয়ী ইখতিলাফকে লড়াইয়ের ক্ষেত্র না বানানো উচিত। এর পরিবর্তে ঐসকল মুসলমান, যারা দ্বীনের মূলনীতিতে একমত, সম্মিলিতভাবে বর্তমান যুগের ঐ সকল ফিতনার মোকাবেলা করা উচিত, যা সরাসরি উসূলে দ্বীনের উপর আক্রমণরত। হযরত ওয়ালিদ মাজিদ রাহ. এ বিষয়ে 'ওয়াহদাতে উম্মত' নামে একটি রিসালাও লিখেছিলেন, যার আরবী তরজমা أخلاف أم شقاق নামে সৌদী আরবেও ব্যাপক পঠিত হয়েছে। ঐ রিসালার মূল আহ্বান এটিই ছিল।

হযরত ওয়ালিদ মাজিদ রাহ.-এর এই রুচি ও মেযাজ আল্লাহর ফযল ও করমে উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের হিস্যাতেও এসেছে। এ কারণে যাদের সাথে ফুরূয়ী ইখতিলাফ আছে, তাদের সাথেও ইলমী ইখতিলাফ ও সম্মিলিত কাজে অংশগ্রহণের মাঝে ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি সাধারণত চিন্তায় থাকে। সৌদী আরবের সালাফী আলিমদের সাথে ইলমী ইখতিলাফ এখনো স্বস্থানে রয়েছে। এসব বিষয়ে ব্যক্তিগত মজলিসে খোলামেলা আলোচনাও হয়ে থাকে। কিন্তু এই ইখতিলাফ তাদের সাথে সুসম্পর্ক, যৌথ কাজকর্মে পরস্পর সহযোগিতা এবং তাদের ভালো কাজের মূল্যায়নের বিষয়ে আলহামদুলিল্লাহ কোনো প্রভাব ফেলে না।

বিগত সময়ে অধমের এই কর্মপন্থার ভুল ব্যাখ্যা করে কেউ হযরত শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ.-এর কাছে এই কথা পৌঁছিয়েছিল যে, আমি আমার মাসলাকের ক্ষেত্রে শিথিলতা বা আপোষপ্রবণতার শিকার হচ্ছি। ফলে তিনি আপত্য স্নেহের সাথে আমার কাছে তার এই আশঙ্কার কথা প্রকাশ করলেন, কিন্তু আমি যখন আমার উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থা শায়খ রাহ.-এর কাছে বিস্তারিতভাবে বললাম তখন তিনি শুধু আশ্বস্তই হলেন না; বরং এ বিষয়ে সমর্থন করে বললেন, এসব বিষয়কে না ঝগড়া-বিবাদের কারণ বানানো উচিত, না তা সম্মিলিত দ্বীনী কাজে পরস্পর সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত। বিষয়টি তারাই বরবাদ করেছে, যারা ইলমী ইখতিলাফের সীমা অতিক্রম করে গোমরাহ-ফাসিক আখ্যা দেওয়া এবং নিন্দা-সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছে।—নুকূশে রফতেগাঁ, পৃষ্ঠা : ৩৯০-৩৯২

যে বিষয়গুলো ঐক্যের পরিপন্থী নয়

উপরোক্ত আলোচনায় ঐ বিষয়গুলো সামনে এসেছে, যা উম্মাহর ঐক্যের পরিপন্থী। সংক্ষেপে ঐ বিষয়গুলোও উল্লেখ করে দেওয়া প্রয়োজন, যেগুলোকে কোনো জাহিল লোক ঐক্যের পরিপন্থী মনে করে বা করতে পারে অথচ তা উম্মাহর ঐক্য রক্ষার জন্যই জরুরি। যেমন : ১. আহলে কুফর ও আহলে শিরক থেকে আলাদা থাকা। তাদের বাতিল বিষয়াদিতে সঙ্গ না দেওয়া। তাদের জাতীয় নিদর্শন ও সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকা। তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা না রাখা। রাজনৈতিক প্রয়োজনে (মুসলিম উম্মাহর রাজনীতি হবে সর্বদা দ্বীনের অধীন) তাদের সাথে সন্ধির প্রয়োজন হলে তা শরীয়তের বিধান মোতাবেক হতে পারে।

২. 'আহলুল বিদআ ওয়াল ফুরকা'র সাথে তাদের বিদআতের বিষয়ে একমত না হওয়া। তালীম-তরবিয়ত, সুলূক ও তাযকিয়ার প্রয়োজনে তাদের সাহচর্য গ্রহণ না করা। কারণ সাহচর্যের দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। 'আহলুল আহওয়া'র সাহচর্য গ্রহণ করার বিষয়ে সাহাবা-তাবেয়ীন নিষেধ করেছেন।
৩. প্রকাশ্যে ফিসক-ফুজুরে লিপ্ত ব্যক্তিদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকা।
৪. অন্যায় ও ভুল কাজে কারো সাহায্য না করা। আসাবিয়ত ও দলাদলির ক্ষেত্রে কাউকে সঙ্গ না দেওয়া।
৫. 'যাল্লাত' (যেসব ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে ভুল হয়েছে এমন) ক্ষেত্রে আকাবির ও মাশাইখের তাকলীদ না করা।
৬. জালিমকে জুলুম থেকে বিরত রাখা।
৭. ওয়াজ-নসীহত
৮. শরীয়তের নীতি ও বিধান অনুযায়ী আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার করা।
৯. ইলমী আদব রক্ষা করে মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে মতভেদপূর্ণ ইজতিহাদী বিষয়াদিতে দলিলের ভিত্তিতে আলোচনা-পর্যালোচনা করা।
১০. কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনে শরীক না হওয়া, কিংবা বলুন, পশ্চিমাদের পদ্ধতিতে রাজনীতিকারী কোনো সংগঠনে শামিল না হওয়া।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুন্নাহর প্রতি আহ্বানের অনুসৃত ও সুন্নাহসম্মত পন্থা

সুন্নাহর বিভিন্নতা সম্বলিত বিষয়ে মতপার্থক্যের ধরন

মাসাইলুল ইজতিহাদে মতপার্থক্যের ধরন ও তার শরঈ বিধান

ইমামগণের মতভিন্নতার বড় কারণ কি হাদীস না জানা কিংবা না মানা?

ফকীহ ইমামগণ কি হাদীস কম জানতেন?

হাদীসের শরণাপন্ন হলেই কি সকল প্রকার মতপার্থক্য দূর হয়ে যাবে?

কোনো আয়াত-হাদীস থাকলেই কি বিষয়টি ইজতিহাদের উর্ধ্বে চলে যায়?

ইজতিহাদী মাসাইল বা ফুরুয়ী মাসাইলে মতভিন্নতার ক্ষেত্রে সঠিক কর্মপন্থা

শাখাগত মতভেদের ক্ষেত্রে সুন্নাহ অনুসরনের এবং সুন্নাহর প্রতি আহ্বানের অনুসৃত ও সুন্নাহসম্মত পন্থা

ভূমিকা ও প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচনায় সম্ভবত স্পষ্ট হয়েছে যে, শরীয়তের অপ্রধান ও শাখাগত বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের মতভিন্নতাকে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা মনে করা ভুল। কুরআন-সুন্নাহয় যে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং বাইয়িনাত তথা কিতাব-সুন্নাহর অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিল থাকার পরও মতভেদ করার যে নিন্দা করা হয়েছে মুজতাহিদ ইমামগণের মতপার্থক্যকে তার অন্তর্ভুক্ত করা প্রকৃতপক্ষে জেনে কিংবা না জেনে উপরোক্ত নুসূসেরই অপব্যাখ্যা। কেননা এসব নুসূসের উদ্দেশ্য নিষিদ্ধ মতভেদ, যা স্পষ্টত বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা। যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

তবে কোনো ব্যক্তি বা দল যদি শাখাগত মতভিন্নতার ক্ষেত্রে শরীয়তের নীতি ও বিধান অনুসরণ না করে উম্মাহর মাঝে কলহ-বিবাদ ছড়ায় তাহলে সে উম্মতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। তাই আমাদেরকে এসব নীতি ও বিধান জানতে হবে এবং শাখাগত মতভিন্নতার ক্ষেত্রে সুন্নাহর অনুসরণ ও সুন্নাহর প্রতি দাওয়াতের মাসনুন ও মুতাওয়ারাছ তথা সুন্নাহসম্মত ও অনুসৃত পন্থা জানতে হবে। যেন সেসব নীতি ও বিধানের বিরোধিতার কারণে বিচ্ছিন্নতার শিকার না হয়ে যাই।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কোনো কোনো বন্ধু বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ইমামদের ফিকহী মাযহাবের উপর আপত্তি তুলছেন এবং এর থেকে লোকদেরকে বিমুখ করে সমাজে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছেন। তারা একটুও চিন্তা করছেন না যে, নির্ভরযোগ্য ফিকহি মাযহাবের মতভিন্নতা সম্পূর্ণ বৈধ ও শরীয়তসম্মত। এটি নিষিদ্ধ বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার আওতাভুক্ত নয়। অথচ ফিকহের মাযহাবগুলোকে হাদীসের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে তার সম্পর্কে লোকদেরকে বিরূপ করে ও বৈধ মতভিন্নতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তারা

নিজেরাই বিভেদ-বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত। এজন্য প্রথমে শাখাগত বিষয়ে ফিকহের ইমামগণের মতভিন্নতার প্রকার ও বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত।

ফিকহি মাসায়েলের প্রকারসমূহ

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর যে কোনো ফিকহী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, মাসায়েলের এক বিরাট অংশ 'মুজমা আলাইহি'। অর্থাৎ সকল মাযহাবে তার বিধান এক ও অভিন্ন। যেমন-পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয, সর্বমোট সতের রাকাত নামায ফরয, প্রতি রাকাতে একটি রুকু ও দুইটি সিজদা, তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে নামায শুরু হয় এবং সালামের মাধ্যমে শেষ হয় ইত্যাদি। ইবাদত থেকে মীরাছ পর্যন্ত শত শত নয়; হাজার হাজার মাসআলা আছে, যা 'মুজমা আলাইহি'। অর্থাৎ এসব মাসআলায় গোটা উম্মাহর; বরং বলুন, মুজতাহিদ ইমামগণের ইজমা রয়েছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবে ভিন্ন বিধান পাওয়া যাবে না।

এসব বিষয়ে ইজমা এ কারণেই হয়েছে যে, এই বিধানগুলো হয়তো কোনো আয়াত বা মুতাওয়াতির সুন্নাহয় সরাসরি বিদ্যমান আছে। কিংবা এমন কোনো সহীহ হাদীসে আছে, যা উসূলে হাদীসের মানদণ্ডে দলিলযোগ্য হওয়ার বিষয়ে হাদীস বিচারক মুহাদ্দিসদের মাঝে কোনো মতভিন্নতা নেই। অথবা সাহাবা-তাবেয়ীনের যুগে কিংবা পরবর্তী ফকীহগণের মাঝে ঐ বিষয়ে ইজমা সংগঠিত হয়েছিল।

২. পক্ষান্তরে ফিকহের কিতাবসমূহে অনেক মাসআলা এমনও পাওয়া যায়, যেসব মাসআলায় ইমামগণের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। এই মতভিন্নতা সম্পর্কে কিছু মানুষের মাঝে এই কুধারণা লক্ষ্য করা যায় যে, এ মতভিন্নতার সূচনা হয়েছে খায়রুল কুরুনের পর। আর তা হয়েছে হাদীস বিষয়ে ইমামগণের অজ্ঞতা কিংবা হাদীস অনুসরণে অনীহার কারণে। অথচ ইসলামী ফিকহের ইতিহাস যারা পড়েছেন এবং মুজতাহিদ ইমামগণের মর্যাদা, ইলম-আমল ও খোদাভীরুতা সম্পর্কে যারা অবগত অথবা অন্তত ফিকহের দীর্ঘ ও দলিল-প্রমাণের আলোচনা সম্বলিত কিতাবাদি অধ্যয়নের সুযোগ যাদের হয়েছে তারা জানেন, এই কু-ধারণা কত জঘণ্য ও অবাস্তব।

বাস্তবতা এই যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ফিকহের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে যেসব মাসআলায় মতভিন্নতা পাওয়া যায় তার অধিকাংশেই সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের যুগ থেকেই মতভিন্নতা চলে আসছে কিংবা বিষয়টিই এমন যাতে কোনো আয়াত বা সহীহ হাদীস নেই, এমনকি এ

বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা অথবা কোনো আছারও পাওয়া যায় না। মুজতাহিদ ইমামগণ শরঈ কিয়াসের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে এসব সমাধান বের করেছেন।

হ্যাঁ, ফিকহের কিতাবসমূহে হাতে গোনা কয়েকটি মাসআলাকে 'যাল্লাহ' (বিচ্যুতি), শায, কিংবা আলইখতিলাফু গায়রুস সায়েগ (অগ্রহণযোগ্য মতভেদ) বলা হয়। এসব মাসআলায় কোনো মুজতাহিদ থেকে নিশ্চিত ভ্রান্তি হয়ে গেছে। এজন্য উসূলে ফিকহ ও উসূলে ইফতার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এসব মাসআলা 'মামুল বিহী ফিকহ' (আমলযোগ্য ফিকহ) ও 'মুফতা বিহী কওল' (ফতওয়া প্রদানযোগ্য সিদ্ধান্ত) নয়। কোনো মাযহাবের দায়িত্বশীল কোনো মুফতী এসব মাসআলা অনুযায়ী ফতওয়া প্রদান করেন না। এ ধরনের হাতে গোনা কিছু মাসআলা ছাড়া ফিকহের অন্যান্য সকল মতভেদপূর্ণ মাসআলা তিন প্রকারে বিভক্ত।

প্রথমে তিন প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করব। এরপর প্রত্যেকটির উপর বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

১. সুন্নাহর বিভিন্নতার ক্ষেত্রে মতভেদ

অর্থাৎ কোনো ইবাদতের পদ্ধতি (যেমন-নামায, হজ্ব ইত্যাদি) সম্পর্কিত এমন কিছু পার্থক্য, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও ছিল এবং খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের যুগেও ছিল। কারণ এসব ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই একাধিক সুন্নাহ বা পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরামের মাঝেও উভয় পদ্ধতি অনুসারেই কমবেশি আমল হয়েছে। এভাবে পরবর্তী যুগেও উভয় পদ্ধতি অনুযায়ী আমল হয়েছে। এ ধরনের মতভিন্নতার অপর নাম 'ইখতিলাফুত তানাওউ' অর্থাৎ সুন্নাহর বিভিন্নতার কারণে মতভিন্নতা। আরেক নাম 'আলইখতিলাফুল মুবাহ' অর্থাৎ এমন মতপার্থক্য, যার উভয় পদ্ধতি সকল মুজতাহিদের নিকট বৈধ।

২. দলিলের মর্মোদ্ধার, গ্রহণযোগ্যতা বিচার ও দলিলসমূহের পরস্পর বিরোধের ক্ষেত্রে মতভেদ

অর্থাৎ কোনো বিষয়ের বিধান কোনো আয়াত বা হাদীস থেকে গ্রহণ করা যায়, তবে ঐ আয়াত বা হাদীসটি ঐ সিদ্ধান্তের জন্য نص محكم নয়। অর্থাৎ আরবী ভাষার নিয়ম-কানুন ও মর্মোদ্ধারের নীতিমালা, এক শব্দে বললে, উসূলে ফিকহের নীতিমালা অনুযায়ী এ আয়াত বা হাদীসে একাধিক

অর্থের বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে মুজতাহিদ ইমাম কিংবা ফকীগণের মাঝে মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

আবার এমনও হয় যে, মাসআলার বিধান সম্পর্কে কোনো হাদীস আছে, কিন্তু ইলমুল ইসনাদ বা উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী তা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত কি না; পারিভাষিক শব্দে বললে, ঐ হাদীসটি সহীহ বা দলিলযোগ্য কি না–এ বিষয়ে হাদীস বিচারক মুহাদ্দিসগণের মাঝে মতভিন্নতা আছে।

প্রসঙ্গত মনে রাখা উচিত, মুজতাহিদ ইমামগণও হাফিযুল হাদীস হয়ে থাকেন এবং হাদীস বিচারেও পারদর্শী হয়ে থাকেন।

হাদীসটি যেহেতু এমন যে, ইলমুল হাদীসের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সহীহ, অন্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যয়ীফ, মালুল কিংবা শায ও মুনকার তাই যে ইমাম হাদীসটি সহীহ মনে করেছেন তিনি এই মাসআলায় এক ধরনের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আর যিনি একে দলিল হওয়ার যোগ্য মনে করেননি তিনি অন্য কোনো দলিল দ্বারা, যেমন-কোনো সাহাবী বা তাবেয়ীর আছর দ্বারা কিংবা শরঈ কিয়াস দ্বারা ইজতিহাদ করে সমাধান দিয়েছেন এবং তার সিদ্ধান্ত ভিন্ন হয়েছে।

তো সারকথা এই যে, এই প্রকারের মাসআলায় কুরআন-হাদীসের দলিল বিদ্যমান থাকার পরও মতভেদ হয়েছে। কারণ সংশ্লিষ্ট আয়াতটি نص محكم নয়। আর হাদীসটি হয়তো সর্বসম্মত সহীহ নয় অর্থাৎ তার সহীহ হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং হাদীস বিচারকদের মাঝেই মতভেদপূর্ণ। অথবা তা نص محكم নয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট মাসআলায় তা দ্ব্যর্থহীন নয়, একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে।

দলিলের বিশুদ্ধতা বা অর্থের ক্ষেত্রে যেখানে মতভেদের অবকাশ রয়েছে সেখানে মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহগণকে ইজতিহাদের মাধ্যমেই সমাধান করতে হয়।

এরচেয়েও জটিল বিষয় হল বিভিন্ন দলিলের বিরোধ। অর্থাৎ যেসব মাসআলায় মুজতাহিদ ফকীহ তার সামনে বিদ্যমান দলিলসমূহের মাঝে বিরোধ অনুভব করেন সেখানে মাসআলার বিধান নির্ণয়ের জন্য তাঁকে ঐ বিরোধ নিরসন করতে হয়। আর এর জন্য যে কাজগুলো করতে হয় তার পারিভাষিক নাম এই :

১. الجمع বা التطبيق সমন্বয়।

২. الترجيح বা معرفة الراجح والمرجوح অগ্রগণ্য নির্ণয়।

৩. النسخ বা معرفة الناسخ والمنسوخ নাসিখ-মানসূখ নির্ণয়।

দলিলসমূহের গবেষণা ও তা থেকে বিধান গ্রহণের সময় এই তিনটি কাজ একজন মুজতাহিদ ফকীহকে করতে হয়। আর কাজ তিনটি করা হয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে। যার দরুণ মুজতাহিদ ফকীগণের মাঝে এই কাজগুলো সম্পন্ন করে মাসআলার বিধান নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতভিন্নতা হয়ে থাকে।

এটি অতি দীর্ঘ ও গভীর একটি বিষয়। সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্যও দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রয়োজন। তাই এখানে শুধু সামান্য ইঙ্গিত করা হল।

৩. রায় ও কিয়াসের বিভিন্নতাজনিত মতভেদ

অর্থাৎ ঐ সকল নতুন সমস্যা, যা নবী-যুগ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের পরে সৃষ্টি হয়েছে, যার সমাধান না কোনো আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, না কোনো হাদীসে, আর না এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ফকীগণের ইজমা আছে। এক্ষেত্রে যা আছে তা হল, কোনো সাহাবীর আছর বা কোনো তাবেয়ীর কোনো ফতওয়া এবং তাতেও দুই মত অথবা এর সমাধান কোনো সাহাবী বা বড় তাবেয়ীর আছরে পাওয়া যায় না। এ ধরনের বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণকে 'রায়' ও শরঈ কিয়াসের দ্বারা ইজতিহাদ করতে হয়েছে। আর ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

উপরোক্ত উভয় প্রকারের মাসআলাকে (অর্থাৎ যেসব মাসআলায় দলিলের গ্রহণযোগ্যতা বিচার কিংবা মর্মোদ্ধার কিংবা বিরোধ নিষ্পত্তিজনিত মতপার্থক্য হয়েছে এবং যেসব মাসআলায় রায় ও কিয়াসের বিভিন্নতাজনিত মতপার্থক্য হয়েছে) ইলমুল ফিকহের পরিভাষায় 'মাসাইলুল ইজতিহাদ' বা 'ইজতিহাদী মাসাইল' বলে। যদিও একাধিক সুন্নাহ সম্বলিত বিষয়েও ইজতিহাদের কিছু প্রয়োজন হয় (এ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ তৃতীয় পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।) তবে পরিভাষায় শেষোক্ত দুই প্রকারের নাম 'মাসাইলুল ইজতিহাদ'। এ প্রকারের মাসআলায় ইমামগণের মাঝে মতভিন্নতা কেন হয়েছে তা উপরোক্ত আলোচনা থেকেই অনুমান করা যায়। তারপরও এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা بيان أسباب اختلاف الفقهاء ফকীহগণের মতভিন্নতার কারণ শীর্ষক কিতাবসমূহে পাওয়া যাবে।

এ বিষয়ের কোনো ভালো কিতাব কেউ বুঝে বুঝে পড়লে সে বলতে বাধ্য হবে যে, ইমামগণের মাঝে যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য হয়েছে সেখানে বাস্তবে মতপার্থক্য হওয়া অনিবার্য ছিল।

আসবাবুল ইখতিলাফ (তথা ইমামগণের মাঝে যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য হয়েছে তা কেন হয়েছে) এবং আদাবুল ইখতিলাফ (যেসব মাসআলায়

মতপার্থক্য হয়েছে তাতে আমাদের কর্মপন্থা কী?) এই দুই বিষয়ে মাশাআল্লাহ ভালো ভালো কিতাব পাওয়া যায়। আমি এখানে কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করছি। এরপর একাধিক সুন্নাহ সম্বলিত বিষয়ে ও ইজতিহাদী বিষয়ে যে মতপার্থক্য হয়েছে তার প্রকারভেদ ও শরয়ী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার পর মূল বিষয়ে আসব। আর তা হল, এসব বিষয়ে সুন্নাহর প্রতি দাওয়াতের মাসনুন ও মুতাওয়ারাছ (সুন্নাহসম্মত ও অনুসৃত) পদ্ধতি কী?

আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা ও আদাবুল ইখতিলাফ বিষয়ক কয়েকটি কিতাব

الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم.

ইবনুস সীদ আলবাতালইয়াউছী (৪৪৪-৫২১ হি.)। আর এই কিতাবটির সারসংক্ষেপ إتحاف السادة المتقين-এর শুরুতে রয়েছে।

رفع الملام عن الأئمة الأعلام.

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হি.)। এই পুস্তিকাটি মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াতেও রয়েছে।

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف

ইমাম ওলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি.)। এই পুস্তিকাটি তাঁর কিতাব হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাতেও আছে। এছাড়া তার অন্য কিতাব 'ইকদুল জীদ ফিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ'-এর মধ্যেও এ বিষয়ে কিছু আলোচনা রয়েছে।

أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء

শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ, মুকীম-মদীনা মুনাওয়ারাহ

اختلاف المفتين

শরীফ হাতিম ইবনে আরিফ আওনী। তিনি জামিআ উম্মুল কুরার অধ্যাপক ও সৌদী মজলিসে শুরার সদস্য

أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين

শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ, মুকীম-মদীনা মুনাওয়ারাহ

أدب الاختلاف في الإسلام

ড. তহা জাবির

ضوابط الاختلاف في ميزان السنة

ড. আবদুল্লাহ শাবান

الدعوة إلى الجماعة والائتلاف والنهي عن التفرق والاختلاف

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আলমু'তাব।

সুন্নাহর বিভিন্নতা সম্বলিত বিষয়ে মতপার্থক্যের ধরন

সংক্ষিপ্ততার উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে শুধু শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. (৭২৮ হি.) ও তার শাগরিদ ইমাম ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়া (৭৫১ হি.)-এর কিছু কথা উল্লেখ করছি।

১. শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ.বলেন–

وَقَاعِدَتُنَا فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ الْقَوَاعِدِ أَنَّ جَمِيعَ صِفَاتِ الْعِبَادَاتِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ إذَا كَانَتْ مَأْثُورَةً أَثَرًا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ لَمْ يُكْرَهْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُشْرَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ كَمَا قُلْنَا فِي أَنْوَاعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَفِي نَوْعَيْ الْأَذَانِ التَّرْجِيعِ وَتَرْكِهِ وَنَوْعَيْ الْإِقَامَةِ شَفْعِهَا وَإِفْرَادِهَا وَكَمَا قُلْنَا فِي أَنْوَاعِ التَّشَهُّدَاتِ وَأَنْوَاعِ الِاسْتِفْتَاحَاتِ وَأَنْوَاعِ الِاسْتِعَاذَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقِرَاءَاتِ وَأَنْوَاعِ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ الزَّوَائِدِ وَأَنْوَاعِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَسُجُودِ السَّهْوِ وَالْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ وَالتَّحْمِيدِ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ وَحَذْفِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ قَدْ يُسْتَحَبُّ بَعْضُ هَذِهِ الْمَأْثُورَاتِ وَيُفَضَّلُ عَلَى بَعْضٍ إذَا قَامَ دَلِيلٌ يُوجِبُ التَّفْضِيلَ وَلَا يُكْرَهُ الْآخَرُ .

এক্ষেত্রে আমাদের নীতিই সর্বাধিক সঠিক যে, ইবাদতের বিষয়ে একাধিক পদ্ধতি যদি গ্রহণযোগ্য বর্ণনায় পাওয়া যায় তবে কোনো পদ্ধতিকেই মাকরূহ বলা যাবে না। বরং সবগুলো শরীয়তসম্মত হবে। যেমন-সালাতুল খাওফের বিভিন্ন পদ্ধতি; তারজীসহ আযান ও তারজীবিহীন আযান; ইকামতের শব্দাবলি একবার করে উচ্চারণ করা বা দুবার করে

উচ্চারণ করা; তাশাহহুদের বিভিন্ন প্রকার; নামাযের শুরুতে পড়ার বিভিন্ন দুআ; কুরআন মজীদের বিভিন্ন কিরাত; ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীরের বিভিন্ন নিয়ম; জানাযার নামায ও সিজদায়ে সাহুর বিভিন্ন তরীকা; রাব্বানা লাকাল হামদ বা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ বলা ইত্যাদি সব বিষয়ে আমরা এটাই বলে থাকি। তবে কখনো কোনো একটি নিয়ম মুস্তাহাব হিসেবে বিবেচিত হয় এবং দলিলের কারণে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে এক্ষেত্রেও অপরটিকে মাকরূহ বলা যায় না।—মাজমূউল ফাতাওয়া ২৪/২৪২-২৪৩; আরো দেখুন : আলফাতাওয়াল কুবরা ১/১৪০

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহ. বলেন—

وهذا يعني القنوت في الفجر وتركه من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه، و هذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة، وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع.

ফজরের নামাযে কুনূত পড়া ও না পড়ার মতভেদ ইখতিলাফে মোবাহ বা বৈধ মতভেদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে পড়ে তাকে যেমন তিরস্কার করা যাবে না তেমনি যে পড়ে না তাকেও। এটি নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করা বা না করার মতো বিষয়। তাশাহহুদের বিভিন্ন প্রকার নিয়ে ইখতিলাফ, এমনিভাবে আযান-ইকামতের পদ্ধতি, হজ্বের বিভিন্ন পদ্ধতি তথা ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তুর ইখতিলাফ।—যাদুল মাআদ ১/২২৬; মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত

আরো দেখুন : রিসালাতুল উলফা বাইনাল মুসলিমীন, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা রাহ.

এ প্রকার মতভেদ সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রাহ. অন্য কিতাবে লেখেন—

واختلاف التنوع على وجوه : منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة، حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال : كلاكما محسن، ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات، وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه وإن كان قد يقال : إن بعض أنواعه أفضل.

ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم، ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

ইখতিলাফে তানাওউ (যা বাহ্যত মতভেদ বলে মনে হলেও মূলত মতভেদ নয়) বরং বিভিন্নতা ও বৈচিত্রতা কয়েক প্রকার : তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এমন ইখতিলাফ, যেখানে প্রত্যেক বক্তব্যই সঠিক এবং প্রত্যেক আমলই বিলইজমা শরীয়তসম্মত। যেমন ঐ সমস্ত কিরাত (যেগুলো 'সাবআতু আহরুফে'র অন্তর্ভুক্ত। তথাপি মূল বিষয়টি জানার পূর্বে) সাহাবায়ে কেরামের মাঝে (কোনো কোনোটি) নিয়ে বিবাদ হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে এ নিয়ে ঝগড়া করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, তোমাদের উভয়ের পড়া সঠিক।

'এমনভাবে আযান-ইকামতের পদ্ধতি; নামাযের শুরুতে পড়ার দুআ, তাশাহহুদ, সালাতুল খাওফ, জানাযা ও ঈদের নামাযের তাকবীর সংক্রান্ত ইখতিলাফ যেখানে সব পদ্ধতিই শরীয়তসম্মত। যদিও কিছু পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

'অনেক লোককে দেখা যায়, ইকামতের শব্দ একবার বলা–দুইবার বলা বা এ ধরনের বিষয় নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। এটা একেবারেই হারাম। আর কেউ কেউ এ পর্যায়ে না পৌঁছলেও দেখা যায়, তারা কোনো একটি পদ্ধতির প্রতি অন্যায় পক্ষপাত পোষণ করে এবং অপরটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিংবা মানুষকে তা গ্রহণ করতে নিষেধ করে। ফলে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিষেধের আওতায় এসে যায়। (অর্থাৎ তারা ঐ বিবাদে লিপ্ত হল, যা থেকে রাসূল নিষেধ করেছেন। কারণ তিনি বৈধ মতভিন্নতাকে বিবাদের ভিত্তি বানাতে নিষেধ করেছেন।)–ইকতিযাউস সিরাতিল মুসতাকীম ১/১৩২-১৩৩

তিনি আরো বলেন–

وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي.

আর এ প্রকার ইখতিলাফ, যাকে আমরা বলছি-اختلاف التنوع বা আমলের পদ্ধতির বিভিন্নতার ইখতিলাফ) এতে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া প্রত্যেক পক্ষ সঠিক। কিন্তু এ ধরনের ইখতিলাফের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি অন্যের উপর বাড়াবাড়ি করে সে নিন্দিত। কারণ কুরআন মজীদ থেকে বুঝে আসে যে, এ ধরনের ইখতিলাফের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই প্রশংসনীয়। যদি এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর বাড়াবাড়ি না করে।'–ইকতিযাউস সিরাতিল মুসতাকীম ১/১৩৫; আরো দেখুন : মাজমূউল ফাতাওয়া ২৪/২৪৫-২৪৭

বৈধ মতভিন্নতার এই প্রকার সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। এখানে কেবল শায়খ ইবনে তাইমিয়ার ঐ কথার প্রতি (যা উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য যে, এ প্রকারের মতপার্থক্য বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা নয়; বরং এ ক্ষেত্রে কোনো পক্ষকে মন্দ বলা ও বাড়াবাড়ি করাই হচ্ছে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা। তাহলে নিজেরা বিভেদ-বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত হয়ে ফকীহ ইমাম, ফিকহের মাযহাব ও তাদের অনুসারীদের প্রতি বিচ্ছিন্নতার অপবাদ দেওয়া কীভাবে বৈধ হবে?

মাসাইলুল ইজতিহাদে মতভিন্নতার ধরন ও তার শরঈ বিধান

ইজতিহাদী মাসআলায় মতভিন্নতার ধরন সম্পর্কে প্রথমে বর্তমান যুগের আনুমানিক সব মাযহাবের বড় বড় মনীষী, যাদেরকে সমগ্র ইসলামী বিশ্বের প্রতিনিধি হিসেবে 'রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী'র আলমাজমাউল ফিকহী (ফিকহী বোর্ড)- এ এই বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল তদের ঐ মজলিসের সিদ্ধান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হল :

ان اختلاف المذاهب الفكرية القائم في البلاد الإسلامية نوعان : أ . اختلاف في المذاهب الاعتقادية، ب . واختلاف في المذاهب الفقهية.

فأما الأول : وهو الاختلاف الاعتقادي، فهو في الواقع مصيبة جرت إلى كوارث في البلاد الإسلامية، وشقت صفوف المسلمين، وفرقت كلمتهم، وهي مما يؤسف له، ويجب أن لا يكون، وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة الذي يمثل الفكر الإسلامي النقي السليم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة

التي أعلن الرسول أنها امتداد لسنته بقوله : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ .

وأما الثاني : وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل، فله أسباب علمية اقتضته، ولله سبحانه في ذلك حكمة بالغة، ومنها : الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق حكم شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما، أو في أمر ما، وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا سواء أكان ذلك في شؤون العبادة أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات، على ضوء الأدلة الشرعية.

فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب، وهو الاختلاف الفقهي، ليس نقيصة ولا تناقضا في ديننا، ولا يمكن أن لا يكون، فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي.

فالواقع أن هذا الاختلاف لا يمكن أن لا يكون، لأن النصوص الأصلية كثيرا ما تحتمل أكثر من معنى واحد، كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة، لأن النصوص محدودة والوقائع غير محدودة، كما قال جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى، فلا بد من اللجوء إلى القياس والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع والمقاصد العامة للشريعة، وتحكيمها في الواقع والنوازل المستجدة.

وفي هذا تختلف فهوم العلماء وترجيحاتهم بين الاحتمالات، فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد، وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج.

فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي الذي أوضحنا ما فيه من الخير والرحمة، وأنه في الواقع نعمة ورحمة من الله بعباده المؤمنين، وهو في الوقت ذاته ثروة تشريعية عظمى ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية، ولكن المضلين من الأجانب الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم، ولا سيما الذين يدرسون لديهم في الخارج، فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا، كما لو كان اختلافا اعتقاديا ليوحوا إليهم ـ ظلما وزورا ـ بأنه يدل على تناقض الشريعة دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين، وشتان ما بينهما ! .

ثانيا، وأما تلك الفئة الأخرى التي تدعوا إلى نبذ المذاهب وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها، وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة، وفي أئمتها، أو بعضهم، ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية، ومزايا وجودها وأئمتها : ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم، ويفرقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام، بدلا من هذه الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها .

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.

মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত চিন্তানৈতিক মতবিরোধ সাধারণত দু ধরনের
(ক) আকীদা ও বিশ্বাসগত মতবিরোধ
(খ). আহকাম ও বিধানগত মতবিরোধ

'প্রথমোক্ত মতবিরোধ মুসলিম বিশ্বের জন্য এক মহাবিপদ এবং মারাত্মক বিপর্যয়, যা মুসলমানদের ঐক্যকে বিনষ্ট করেছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং এমন মতভেদ না হওয়া অপরিহার্য। বরং সমগ্র উম্মত

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদা-বিশ্বাসের উপর অটল-অবিচল থাকবে, যা নবী যুগ ও খেলাফতে রাশেদা-যুগের নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন ইসলামী চিন্তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। যে খেলাফতে রাশেদার সুন্নাহ মূলত তাঁরই সুন্নাহ, যা তিনি নিজেই ঘোষণা দিয়ে গেছেন। ইরশাদ করেছেন–

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার পরে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আকড়ে ধর এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে তা মজবুতভাবে ধরে রেখ।

'আর দ্বিতীয়টি হল কিছু বিধানের ক্ষেত্রে ফিকহী মাযহাবসমূহের মতপার্থক্য, যার অনেক শাস্ত্রীয় কারণ রয়েছে। এবং যাতে আল্লাহ তাআলার নিগূঢ় হিকমত রয়েছে। যেমন বান্দাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ এবং নুসূস থেকে আহকাম ও বিধান উদঘাটনের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করা। তাছাড়া এটা হল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক বিরাট নেয়ামত এবং ফিকহ ও কানুনের মহাসম্পদ, যা মুসলিম উম্মাহকে দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা দিয়েছে। ফলে তা নির্ধারিত একটি হুকুমের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না, যা থেকে কোনো অবস্থাতেই বের হওয়ার সুযোগ নেই। বরং যে কোনো সময়ই কোনো বিষয়ে যদি কোনো একজন ইমামের মাযহাব সংকীর্ণতার কারণ হয়ে যায় তাহলে শরঈ দলিলের আলোকেই অন্য ইমামের মাযহাবে সহজতা ও প্রশস্ততা পাওয়া যাবে। তা হতে পারে ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে অথবা মুআমালা সংক্রান্ত অথবা পারিবারিক কিংবা বিচার ও অপরাধ সংক্রান্ত। তো আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে এ ধরনের মাযহাবী ইখতিলাফ আমাদের দ্বীনের জন্য দোষের কিছু নয় এবং তা স্ববিরোধিতাও নয়। এ ধরনের মতভেদ না হওয়া অসম্ভব। এমন কোনো জাতি পাওয়া যাবে না যাদের আইন-ব্যবস্থায় এ ধরনের ইজতিহাদী মতপার্থক্য নেই।

'অতএব বাস্তব সত্য এই যে, এ ধরনের মতভেদ না হওয়াই অসম্ভব। কেননা একদিকে যেমন নুসূসে শরঈ অনেক ক্ষেত্রে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে অন্যদিকে শরঈ নস সম্ভাব্য সকল সমস্যাকে সুস্পষ্টভাবে বেষ্টন করতে পারে না। কারণ নুসূস হল সীমাবদ্ধ আর নিত্যনতুন সমস্যার তো কোনো সীমা নেই।

'অতএব কিয়াসের আশ্রয় নেওয়া এবং আহকাম ও বিধানের ইল্লত, বিধানদাতার মাকসাদ; শরীয়তের সাধারণ মাকসাদসমূহ বোঝার জন্য চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং এর মাধ্যমে নিত্যনতুন সমস্যার সমাধান গ্রহণ করতে হবে।

'এখানে এসেই উলামায়ে কেরামের চিন্তার বিভিন্নতা দেখা দেয় এবং সম্ভাব্য বিভিন্ন দিকের কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হয়। ফলে একই বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আসে। অথচ প্রত্যেকের উদ্দেশ্য হক্ব ও সত্যের অনুসন্ধান। কাজেই যার ইজতিহাদ সঠিক হবে সে দুটি বিনিময় পাবে এবং যার ইজতিহাদ ভুল হবে সে একটি বিনিময় পাবে। আর এভাবেই সংকীর্ণতা দূর হয়ে প্রশস্ততার সৃষ্টি হয়।

'সুতরাং যে মতপার্থক্য কল্যাণ ও রহমতের ধারক তা বিদ্যমান থাকলে দোষ কেন হবে? বরং এ তো মুমিন বন্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহ। বরং মুসলিম উম্মাহর গর্ব ও গৌরবের বিষয়।

'কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কিছু মুসলমান তরুণ, বিশেষত যারা বাইরে লেখাপড়া করতে যায় তাদের ইসলামী জ্ঞানের দুর্বলতার সুযোগে কিছু গুমরাহকারী লোক তাদের সামনে ফিকহী মাসআলার এ জাতীয় মতপার্থক্যকে আকীদার মতভেদের মতো করে তুলে ধরে। অথচ এ দু'য়ের মাঝে আকাশ-পাতালের ব্যবধান!

দ্বিতীয়ত যে শ্রেণীর লোকেরা মানুষকে মাযহাব বর্জন করার আহ্বান করে এবং ফিকহের মাযহাব ও তার ইমামগণের সমালোচনা করে এবং মানুষকে নতুন ইজতিহাদের মধ্যে নিয়ে আসতে চায় তাদের কর্তব্য, এই নিকৃষ্ট পন্থা পরিহার করা। যা দ্বারা তারা মানুষকে গুমরাহ করছে এবং তাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করছে। অথচ এখন প্রয়োজন ইসলামের দুশমনদের ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নিজেদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করা।-মাজাল্লাতুল মাজমায়িল ফিকহী, রাবিতাতুল আলামিল ইসলামী, মক্কা মুকাররমা বর্ষ : ১, সংখ্যা : ২, পৃষ্ঠা : ৫৯, ২১৯

উপরোক্ত রেজুলেশনে যাঁদের স্বাক্ষর রয়েছে :

আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায, রঈস
ড. আবদুল্লাহ উমর নাসিফ, নায়েবে রঈস
মুহাম্মাদ আশশাযিলী আননাইফার, সদস্য
মুহাম্মাদ আলহাবীব ইবনুল খোজা, সদস্য
ড. বকর আবদুল্লাহ আবু যাইদ, সদস্য
মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুবায়্যিল, সদস্য
আবুল হাসান আলী নদভী, সদস্য
আবু বকর জুমী, সদস্য
মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর, সদস্য
সালেহ ইবনে ফাওযান আলফাওযান, সদস্য

মুহাম্মাদ মাহমুদ আসসাওয়াফ, সদস্য
আবদুল্লাহ আবদুর রহমান আলবাসসাম, সদস্য
মুস্তফা আহমদ আযযারকা, সদস্য
মুহাম্মাদ রশীদ রাগেব কাবানী, সদস্য
ড. আহমাদ ফাহমী আবু সুন্নাহ, সদস্য
মুহাম্মাদ সালেম ইবনে আবদুল ওয়াদূদ, সদস্য।

এই সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে শায়খ ইবনে বায রাহ. (১৪২০ হি.) ও শায়খ আবদুল্লাহ উমর নাসীফ-এর স্বাক্ষরও আছে। ইজতিহাদী বিষয়ে মতভিন্নতার এই পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য যদি প্রত্যেকের স্মরণ থাকে তাহলে এর ভিত্তিতে পরস্পর কলহ-বিবাদে লিপ্ত হওয়ার সুযোগই হবে না।

পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে ইজতিহাদী মাসায়েলের পরিচয় এবং তাতে মতপার্থক্য হওয়ার কারণ সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণার নিরসন প্রয়োজন। পূর্বের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি বোঝা গেলেও আরো স্পষ্ট করার জন্য আলাদা শিরোনামে কিছু কথা আরজ করছি।

ইখতিলাফের প্রধান কারণ কি হাদীস না জানা বা না মানা?

অনেকে মনে করেন, মতভিন্নতার মৌলিক কারণ হল, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যদিকের হাদীস সম্পর্কে অবহিত না থাকা বা সহীহ হাদীস পরিত্যাগ করে যুক্তি বা কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করা। অথচ আইম্মায়ে দ্বীন ও উলামায়ে হকের মধ্যে যে মতভিন্নতা হয়ে থাকে সে সম্পর্কে এ ধারণা করা মোটেও সঠিক নয়। কেননা তাদের কেউ কিয়াস বা যুক্তিকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দেন না। তাদের কোনো কোনো ফতওয়া যদিও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হাদীসের ব্যাপারে অবগতি না থাকার কারণে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এর সংখ্যা নিতান্তই কম।

আহলে হক উলামায়ে কেরামের মধ্যে বিদ্যমান মতভিন্নতার অধিকাংশের মূলেই ইখতিলাফে মাহমুদ বা ইখতিলাফে মাশরূ-এর শরীয়ত স্বীকৃত বাস্তবিক কারণ বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য হাদীসের ইমামগণের মধ্যেও বহু বিষয়ে ইখতিলাফ হয়েছে। ইমাম আহমদ, ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, দাউদ জাহেরী, ইবনে হাযম জাহেরী তাদের ব্যাপারে হাদীসের বিরোধিতা বা হাদীসের ব্যাপারে অনবগতির অভিযোগ কি কেউ করতে পারে?

শুধু তাই নয়, পরবর্তী যুগের এবং বর্তমানের ঐসব আলেমের মধ্যেও ইখতিলাফ হয়েছে, যারা আহলে হাদীস বা সালাফী নামে পরিচিত। এদের ব্যাপারে সকল আহলে হাদীস বা সালাফী বন্ধু একমত যে, এরা সবাই হাদীসবিশারদ এবং হাদীসের অনুসারী ছিলেন।

প্রথম উদাহরণ

মিসরের প্রসিদ্ধ আলিম শায়খ সাইয়েদ সাবেক রাহ. (১৩৩৩–১৪২৫ হি.) 'ফিকহুস সুন্নাহ' নামে একটি বেশ বড়, সহজ ও ভালো কিতাব রচনা করেছেন–আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন–যা মাশাআল্লাহ নতুন প্রজন্মের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত। অনেক তরুণ-যুবক এটিকে মুতাওয়ারাছ ফিকহী কিতাবের উত্তম বিকল্প মনে করে বরণ করে নিয়েছে। তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীনের স্বল্পতার কারণে অনেকে এমনও মনে করে যে, ফিকহের কিতাবগুলোতে আছে ইমামদের ফিকহ আর এই কিতাবে আছে হাদীস ও সুন্নাহর ফিকহ। অথচ মূল বিষয় এই যে, হাদীস ও সুন্নাহর ফিকহ সেটাও এবং এটাও। পার্থক্য শুধু এই যে, এখানে ফকীহ ও লেখক হলেন শায়খ সাইয়েদ সাবেক আর ওখানে ফকীহ হলেন খায়রুল কুরূন বা তার নিকটতম যুগের মুজতাহিদ ইমাম আর লেখক হলেন পরবর্তী সময়ের কোনো ফকীহ বা আলেম।

যাই হোক, আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে, এ কিতাবের শুরুতে লেখক লেখেন–

أما بعد ! فهذا الكتاب "فقه السنة" يتناول مسائل من الفقه الإسلامي مقرونة بأدلتها من صريح الكتاب وصحيح السنة، ومما أجمعت عليه الأمة . . .

والكتاب في مجلداته مجتمعة يعطي صورة صحيحة للفقه الإسلامي الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويفتح للناس باب الفهم عن الله وعن رسوله، ويجمعهم على الكتاب والسنة، ويقضي على الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب، كما يقضي على الخرافة القائلة : بأن باب الاجتهاد قدسد .

উপরোক্ত কথায় যে চিন্তাগত বিচ্ছিন্নতা রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনায় না গিয়ে শুধু এটুকু বলছি যে, তাঁর দাবি, এই কিতাবের মাসআলাগুলো সরাসরি কুরআনের আয়াত, সহীহ সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মাহর দলিলনির্ভর।

এ কিতাবটি যখন বর্তমান যুগের একজন প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ. (১৩৩২-১৪২০ হি.)-এর সামনে এল, যিনি চিন্তা-চেতনায় সাইয়েদ সাবেকের থেকে আলাদা নন, একই ঘরানার–শায়খ আলবানীর কিতাবাদি; বিশেষত 'ছিফাতুস সালাহ'র ভূমিকা পাঠ করলেই তা বোঝা যাবে। তিনি যখন এই কিতাবটি অধ্যয়ন করলেন তখন এর উপর টীকা লেখার প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং 'তামামুল মিন্নাহ ফিততালীক আলা ফিকহিস সুন্নাহ' নামে চার শতাধিক পৃষ্ঠায় তা লিখলেন। এর পঞ্চম সংস্করণ (১৪২৬ হি.) আমার সংগ্রহে আছে।

এতে তিনি ফিকহুস সুন্নাহর মাত্র সিয়াম অধ্যায় পর্যন্ত টীকা লিখেছেন, যা মূল কিতাবের চার ভাগের এক ভাগ। ১ রজব ১৪০৮ হিজরীর তথ্য অনুযায়ী তিনি শুধু এটুকুরই টীকা লিখতে পেরেছেন। অবশিষ্ট অংশের টীকা লেখার জন্য দুআ করেছেন।

শায়খ আলবানী রাহ. 'তামামুল মিন্নাহ'র ভূমিকায় 'ফিকহুস সুন্নাহ'র ভুল-ত্রুটির প্রকার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত সূচি উল্লেখ করেছেন, যাতে চৌদ্দটি প্রকার রয়েছে। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হল :

১. সাইয়েদ সাবেক অসংখ্য যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে নীরব থেকেছেন।

২. অন্যদিকে অনেক 'ওয়াহী' (মারাত্মক যয়ীফ) হাদীসকে শক্তিশালী বলেছেন।

৩. কিছু হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন, অথচ তা সহীহ।

৪. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতিতে হাদীস উল্লেখ করেছেন অথচ তাতে সে হাদীস নেই।

৫. এমন কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন, যা হাদীসের কোনো কিতাবেই নেই।

৬. যাচাই বাছাই ছাড়া কোনো কিতাবের উদ্ধৃতিতে কোনো হাদীস উল্লেখ করেছেন অথচ খোদ ঐ কিতাবের লেখকই তাতে হাদীসটি সম্পর্কে এমন মন্তব্য করেছেন, যা তার সহীহ হওয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

৭. কখনো কখনো দলিল ছাড়া মাসআলা উল্লেখ করেছেন, কখনো কিয়াসের ভিত্তিতে মাসআলা প্রমাণ করেছেন। অথচ সে বিষয়ে সহীহ হাদীস বিদ্যমান। আবার কখনো সাধারণ দলিল উল্লেখ করেছেন, অথচ সেই মাসআলার সুনির্দিষ্ট দলিল রয়েছে।

৮. কখনো কখনো এমন মত বা সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যার প্রমাণ দুর্বল। অথচ বিপরীত মতটির দলিল শক্তিশালী।

৯. সবচেয়ে আপত্তিকর কাজ এই যে, যে কিতাব সুন্নাহ মোতাবেক আমলের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার জন্য লেখা হয়েছে তাতে এমন অনেক মাসআলা আছে, যা সহীহ হাদীসের বিপরীত। অথচ ঐ সহীহ হাদীসগুলোর বিরোধী কোনো হাদীসও নেই।

শায়খ আলবানী রাহ.-এর সব আপত্তি সঠিক নাও হতে পারে। তবে তার গবেষণা ও বিশেস্নষণ অনুযায়ী তো 'ফিকহুস সুন্নাহ'য় এ ধরনের অনেক ভুল রয়েছে।

তামামুল মিন্নাহ প্রকাশিত হওয়ার পরও শায়খ সাইয়েদ সাবেক রাহ. দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। কিন্তু দু'/চারটি স্থান ব্যতীত তিনি 'ফিকহুস সুন্নাহ'য় অন্য কোনো পরিবর্তন করেননি। এর দ্বারা বোঝা যায়, তার দৃষ্টিতে শায়খ আলবানী রাহ.-এর এই আপত্তিগুলো সঠিক নয়। কিংবা তা গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়।

এই দুই ব্যক্তিত্বের কেউই হানাফী নন। অন্য কোনো মাযহাবেরও অনুসারী নন। তারা ছিলেন নিজেদের পছন্দনীয় রুচি অনুসারে সরাসরি সুন্নাহর অনুসরণ ও হাদীস অনুযায়ী আমলের প্রতি আহ্বানকারী নিষ্ঠাবান দুই ব্যক্তি। দুজনই ছিলেন হাদীসের আলেম এবং নির্ঘন্ট ও কম্পিউটার যুগের আলেম। তারা উভয়েই উম্মতের সামনে তাঁদের মতে 'ফিকহুল মাযাহিব' স্থলে 'ফিকহুস সুন্নাহ' পেশ করতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন এই যে, ফিকহি মতভিন্নতার প্রধান কারণ যদি শুধু এই হয় যে, যাদের মাঝে মতভিন্নতা হয়েছে তাদের একজন হয়তো হাদীস জানতেন না কিংবা হাদীস মানতেন না, অন্তত ঐ মাসআলার হাদীসটি তিনি জানতেন না তাহলে এই দুই শায়খের মাঝে এত বড় বড় এবং এত অধিক মাসআলায় মতভেদ কেন হল?

দ্বিতীয় উদাহরণ

সম্প্রতি ১৪৩০ হি., মোতাবেক ২০০৯ ঈ. সালে ড. সাদ ইবনে আবদুল্লাহ আলবারীকের দুই খণ্ডের একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে, যার নাম الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز رحمهم الله تعالى কিতাবটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ শ'র অধিক।

কিতাবটির নাম থেকেই বোঝা যায়, এই কিতাবে তিনি এমন কিছু মাসআলা উল্লেখ করেছেন, যেসব মাসআলায় এ যুগের তিনজন সম্মানিত সালাফী আলেম : শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায রাহ. (১৩৩০-১৪২০ হি.), শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ ইবনে উছাইমীন রাহ.

(১৪২১ হি.) ও শায়খ (মুহাম্মাদ ইবনে নূহ) নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ. (১৩৩২-১৪২০ হি.)-এর মাঝে মতভেদ হয়েছে।

কিতাবের নাম থেকে এ বিষয়টিও স্পষ্ট যে, তিনজনের মাঝে যেসব মাসআলায় মতপার্থক্য হয়েছে তার সবগুলো লেখক এখানে উল্লেখ করেননি। তাছাড়া তিনি শুধু 'কিতাবুর রাযাআ' দুগ্ধপান অধ্যায় পর্যন্ত মাসআলাগুলো এখানে এনেছেন। এরপরও এতে মাসআলার মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৬। আকীদা সংক্রান্ত কিছু মাসআলাও এতে রয়েছে, যেগুলো আকীদার মৌলিক নয়, শাখাগত মাসআলা এবং যার কিছু নমুনা উদ্ধৃতিসহ

البشارة والإتحاف بما بين ابن تيمية والألباني في العقيدة من الاختلاف

নামক পুস্তিকায়ও রয়েছে।

জেনে রাখা দরকার যে, 'আলইজায' কিতাবে 'মাসাইলুল ইজতিহাদে'র উভয় প্রকারের মাসআলাই উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ কিছু মাসআলা এমন, যার কোনো শরঈ নস নেই অথবা শরঈ নস পাওয়া গেলেও তা থেকে সংশ্লিষ্ট মাসআলার বিধান আহরণ করতে হলে ইজতিহাদ প্রয়োজন।

তৃতীয় উদাহরণ

ড. বকর ইবনে আবদুল্লাহ আবু যায়েদ রিয়ায-এর পুস্তিকা 'লা-জাদীদা ফী আহকামিস সালাহ'। ইন্টারনেট সংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) অনুযায়ী এতে তিনি নামাযের এমন আটটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন, যে সম্পর্কে কিছু সালাফী আলেমের ফতওয়া বা আমল তার দৃষ্টিতে প্রমাণহীন ও সুন্নাহবিরোধী।

চতুর্থ উদাহরণ

ড. ইউসুফ কারযাবী–হাফিযাহুল্লাহু তাআলা ওয়া রাআহু–এর কিতাব 'আলহালাল ওয়াল হারাম ফিলইসলাম'-এর সাথে ড. সালেহ ফাওযানের পুস্তিকা 'আলই'লাম বিনাকদি কিতাবিল হালালি ওয়াল হারাম' ও শায়খ আলবানী রাহ.-এর কিতাব 'গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদীসিল হালালি ওয়াল হারাম' অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

ফকীহ ইমামগণ কি হাদীস কম জানতেন?

কেউ কেউ মনে করেন যে, হাদীস সংকলন ও হাদীসের কিতাবসমূহ (যেমন প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব ইত্যাদি) সংকলনের উপরই হাদীসের জ্ঞান নির্ভর

করে। এজন্য এসব কিতাব সংকলন হওয়ার আগে যেসব ইমাম ইন্তেকাল করেছেন তারা তাঁদের উপর হাদীস না জানা বা কম জানার অভিযোগ আরোপ করেন। অথচ এই ধারণাও ভুল। কেননা হাদীসের জ্ঞান নির্ভর করে হাদীস অন্বেষণ, হাদীস সংগ্রহের জন্য সফর এবং হাদীসের হিফয ও যবতের উপর। যদি হাদীসের কিতাবসমূহের উপরই হাদীসের জ্ঞান নির্ভর করত তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়–এসব হাদীসগ্রন্থ কীভাবে সংকলিত হল?

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন–

بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير . . . فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين. وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية.

(হাদীস ও সুন্নাহর) এই সব গ্রন্থ সংকলনের পূর্ববর্তী (ইমাম) গণ পরবর্তীগণের তুলনায় হাদীস ও সুন্নাহ অনেক বেশি জানতেন ...। তাদের গ্রন্থ তো ছিল তাদের সীনা, যাতে এইসব গ্রন্থের তুলনায় হাদীস ও সুন্নাহ অনেক অনেক গুণ বেশি পরিমাণে সংরক্ষিত ছিল। এ ব্যাপারে সংশিস্নষ্ট বিষয়ে অবগত কোনো ব্যক্তিই সন্দেহ পোষণ করতে পারে না।–মাজমূউল ফাতাওয়া ২০/২৩৯

যাদের ধারণা, পরবর্তী আলেমগণ পূর্ববর্তী আলেমগণের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ তাদেরকে লক্ষ্য করে ইমাম বুখারী রাহ. বলেন–

قال معمر : أهل العلم كان الأول فالأول أعلم، وهؤلاء الآخر فالآخر عندهم أعلم.

মামার ইবনে রাশেদ রাহ. বলেন, আলেমগণের মধ্যে যিনি যত আগের অর্থাৎ যিনি নবী-যুগের যত নিকটবর্তী তিনি তুলনামূলক অধিক জ্ঞানী। অথচ এরা মনে করে, যিনি যত পরের তিনি তত জ্ঞানী।–জুযউ রাফয়িল ইয়াদাইন ১০৭

বলাবাহুল্য, শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. ও ইমাম মামার ইবনে রাশেদ রাহ.-এর উল্লেখিত নীতিটির ব্যতিক্রমও যে নেই তা নয়। তবে সাধারণ বাস্তবতা তা-ই, যা তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

হাদীসের শরণাপন্ন হলে কি মতপার্থক্য দূর হয় না বিবাদ?

কারো কারো ধারণা, সবাই যদি কুরআন ও হাদীসের অনুসরণের ব্যাপারে সম্মত হয়ে যায় তাহলে ইখতিলাফ দূর হয়ে যাবে। ইখতিলাফ শুধু

এ জন্যই হয় যে, একপক্ষ কুরআন-হাদীস অনুসরণ করে, অপরপক্ষ কুরআন-হাদীস অনুসরণ করে না। এ প্রসঙ্গে তারা নিম্নোক্ত আয়াতটিও উল্লেখ করে থাকে–

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

(তরজমা) যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট পেশ কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখ। এটা উত্তম ও এর পরিণাম সুন্দর।–সূরা নিসা (৫) : ৫৯

অথচ উপরোক্ত আয়াতে এ কথা বলা হয়নি যে, কুরআন-হাদীসের শরণাপন্ন হলে ইখতিলাফ দূর হয়ে যাবে। বরং বলা হয়েছে, বিবাদের ক্ষেত্রসমূহে কুরআন-হাদীসের শরণাপন্ন হও। এর অর্থ হল তাহলে বিবাদ মিটে যাবে। এরা বিবাদ মিটে যাওয়াকে ইখতিলাফ মিটে যাওয়ার সমার্থক ধরে নিয়েছে এবং এখানেই ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে। কেননা বিবাদ মিটে যাওয়া ও ইখতিলাফ মিটে যাওয়া এক বিষয় নয়। অনেক ক্ষেত্রে ইখতিলাফ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিবাদ মিটে যায়। পক্ষান্তরে অনেক ক্ষেত্রে ইখতিলাফ ও বিবাদ দু'টোই মিটে যায়। যেমন বিবাদরতদের মাঝে এক পক্ষ জালিম, অপর পক্ষ মাজলূম। এক পক্ষ হকের উপর, অন্য পক্ষ বাতিলের উপর। তারা যদি কিতাব-সুন্নাহর শরণাপন্ন হয় এবং কুরআন-সুন্নাহর ফয়সালা মেনে নেয় তাহলে বিবাদও দূর হবে, মতভেদও থাকবে না। পক্ষান্তরে যেখানে শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে একাধিক মত হয়েছে কিংবা সুন্নাহর বিভিন্নতার ক্ষেত্রে একজন এক সুন্নাহ অন্যজন অন্য সুন্নাহ অনুসরণ করছে–এ ধরনের ক্ষেত্রে যদি পরস্পর বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং উপরোক্ত আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী তারা কিতাব-সুন্নাহর শরণাপন্ন হয় তাহলে কিতাব-সুন্নাহ তাদেরকে এই নির্দেশনাই দিবে যে, বিবাদ করো না। কারণ তোমরা উভয়ে সঠিক পথে আছ। কারো অধিকার নেই অন্যের উপর আক্রমণ করার। তো এখানে মতপার্থক্য বহাল থাকা সত্ত্বেও বিবাদ দূর হবে।

সহীহ বুখারীর ঐ হাদীস কারো অজানা নয়, যে হাদীসে হযরত উমর রা. ও হযরত হিশাম ইবনে হাকীম রা.-এর মধ্যকার বিরোধের কথা বর্ণিত হয়েছে। যা সাময়িক ঝগড়ার রূপ ধারণ করেছিল। মতবিরোধটি হয়েছিল কুরআনের কিরাত নিয়ে। হযরত উমর রা. হযরত হিশাম রা.কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হাজির করে তার বিরুদ্ধে নালিশ

করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকের পড়া শুনলেন এরপর প্রত্যেককেই বললেন—

هكذا أنزلت

অর্থাৎ এভাবে কুরআন নাযিল হয়েছে।

—সহীহ বুখারী ৮/৬৩৯-৬৪০ (ফাতহুল বারী)

এ ধরনের আরেকটি ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেন—كلاكما محسن، فاقرآ

তোমাদের দুজনই ঠিক পড়েছ। তাই পড়তে থাক।

—সহীহ বুখারী ৮/৭২০ (ফাতহুল বারী)

বনু কুরাইজার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর মর্ম বোঝার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ হয়েছিল। উভয় দল হাদীসের মর্ম যা বুঝেছেন সে অনুযায়ী আমল করেছেন। এরপর সরাসরি আল্লাহর রাসূলের শরণাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু তিনি কোনো দলকে তিরস্কার করেননি। বিস্তারিত ঘটনা উদ্ধৃতিসহ সামনে আসছে।

তো দেখুন, প্রথম ঘটনা ছিল কিরাআতের পার্থক্য সংক্রান্ত, যা সুন্নাহর বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। এই মতভেদের ক্ষেত্রে যখন আল্লাহর রাসূলের শরণ নেওয়া হল তিনি বিবাদ মিটিয়ে দিলেন, কিন্তু ইখতিলাফ বহাল রাখলেন এবং বললেন, উভয় পদ্ধতি সঠিক।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল রায় ও ইজতিহাদের মতপার্থক্য। এখানে প্রত্যেক পক্ষ হাদীস থেকে যা বুঝেছেন সে অনুযায়ী আমল করেছেন। এখানে তাদের মাঝে কোনো বিবাদ হয়নি। এরপরও তাঁরা বোধ হয় এজন্যই আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, তাঁর আদেশের সঠিক অর্থ জানবে না। কিন্তু হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী, আল্লাহর রাসূল তা বলেননি। শুধু এটুকু করেছেন যে, কোনো পক্ষকেই তিরস্কার করেননি। তাহলে এখানে তিনি ইজতিহাদ এবং সঠিক প্রেরণা তথা হাদীস অনুসুরণের প্রেরণা থেকে প্রকাশিত সিদ্ধান্তকে বহাল রেখেছেন। এই শ্রেণীর মতভেদকে তিনি বাতিল করেননি। তাহলে ইখতিলাফে মাহমূদ বা ইখতিলাফে মাশরূ, যে নামই দেওয়া হোক, কুরআন-সুন্নাহর সামনে উপস্থাপন করা হলে বিলুপ্ত হবে না। কারণ এ তো কুরআন-সুন্নাহর দলিলের ভিত্তিতেই হয়েছে। হ্যাঁ, এসব বিষয়ে কেউ যদি বিবাদে লিপ্ত হয় সে কুরআন-সুন্নাহর শরণাপন্ন হলে বিবাদ থেকে ফিরে আসবে। কারণ কুরআন তাকে বলবে—

وكلا آتينا حكما وعلما

আর তাদের প্রত্যেককে দিয়েছি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।

এবং হাদীস তাকে বলবে–

فما عنف واحدا من الفريقين এবং كلاكما محسن فاقرءا

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরণাপন্ন হওয়ার ফলে ঝগড়া তো মিটল বটে, কিন্তু মতভিন্নতা মিটেনি। এজন্যই মিটেনি যে, এ মতভিন্নতা ইখতিলাফে মাহমুদ বা প্রশংসিত মতভিন্নতার অন্তর্ভুক্ত। আর প্রশংসিত বা অনুমোদিত মতভিন্নতার উদ্দেশ্য একমাত্র দলিলের অনুসরণই হয়ে থাকে, দলিলের বিরোধিতা নয়। তাই এসব ক্ষেত্রে এ ধরনের উক্তি একেবারে অবান্তর যে, দলিলের শরণাপন্ন হলেই ইখতিলাফ মিটে যাবে।

হ্যাঁ, ইখতিলাফে মাযমুম বা নিন্দিত মতভেদের ভিত্তি যেহেতু দলিল-প্রমাণের বিরোধিতা অথবা মূর্খতা ও হঠকারিতা কিংবা প্রবৃত্তি ও দুর্বল ধারণার অনুসরণের উপর তাই এ ধরনের ইখতিলাফ কুরআন-হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন ও অনুসরণের দ্বারা মিটে যায়।

পক্ষান্তরে ইখতিলাফে মাহমুদ বা ইখতিলাফে মাশরূ হয়েই থাকে কুরআন ও হাদীসের উপর অটল থাকার কারণে। তাই কুরআন-হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তনের কারণে এ ইখতিলাফ মিটে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই। এজন্য এ ধরনের ইখতিলাফ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন ও আইম্মায়ে দ্বীনের মাঝেও হয়েছে এবং পরবর্তীতে আহলে হাদীস ও সালাফী উলামায়ে কেরামের মাঝেও হয়েছে।

যারা আসবাবে ইখতিলাফে ফুকাহা এবং ফিকহে মুকারান-এর কিতাবসমূহের সঠিক ধারণা রাখেন তাদের নিকট বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট ও বাস্তব সত্য, তবে কিছু কিছু মানুষ নিজের অজ্ঞতার কারণে এ ধরনের ইখতিলাফকে হাদীস মানা বা না মানার ইখতিলাফ বলে মানুষকে বিশ্বাস করাতে চায়।

মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো আয়াত বা হাদীস থাকলেই কি তা ইজতিহাদের ঊর্ধ্বে চলে যায়?

অনেকে এ কথা তো মানে যে, যে সমস্ত মাসআলার মধ্যে ইজতিহাদের অবকাশ আছে সেগুলোতে অন্য পক্ষের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া জরুরি এবং তাতে নিজের মত অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা ঠিক নয়। কিন্তু পরক্ষণে তারা আরেকটি ভুলের মধ্যে পতিত হয়। তা হচ্ছে, কোনো

মাসআলায় একটি আয়াত বা হাদীস পেলেই (যদিও আয়াতটি মুহকাম বা মুফাসসার নয় এবং হাদীসের সহীহ হওয়ার বিষয়টি মুজমা আলাইহি তথা সর্বসম্মত নয় বা হাদীসের মর্মের বিষয়টি অকাট্য নয় তাদের নিকট ঐ মাসআলা ইজতিহাদের উর্ধ্বে চলে যায়। তাদের ধারণায় ঐ মাসআলাটি এমন 'মানসূস আলাইহি' হয়ে যায় যে, কেউ যদি এতে মতবিরোধ করে তাহলে এজন্যই করবে যে, সে হয়তো উক্ত আয়াত ও হাদীসের সন্ধান পায়নি কিংবা পেলেও তা মানতে চায় না।

এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ উসূলে তাফসীর বা তাফসীরের মৌলিক নীতিমালাসমূহের প্রতি যথার্থ লক্ষ্য রেখে তাফসীরের গ্রহণযোগ্য উৎস থেকে কুরআন বুঝার চেষ্টা করলেও মুহকাম বা মুফাসসার নয় এমন আয়াতের অর্থ বুঝা বা তা থেকে বিধান বের করার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হতে পারে।

এজন্যই খোদ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ইমামগণের মাঝে এবং খায়রুল কুরূনের মনীষীগণের মাঝে কুরআন বোঝা এবং কুরআন থেকে হুকুম-আহকাম উদঘাটন করার ক্ষেত্রে অনেক স্থানে মতবিরোধ হয়েছে। তাফসীরের নির্ভরযোগ্য কিতাব এবং আহকামুল কুরআন বিষয়ক কিতাবসূমহে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে।

এমনিভাবে কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে কোনো হাদীস পাওয়া গেলেই মাসআলাটি ইজতিহাদের সীমারেখা থেকে বের হয়ে যায় না; বরং তখনই বের হয় যখন হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ বলে প্রমাণিত হবে। সাথে সাথে হাদীসটির মর্মার্থ এতই স্পষ্ট হবে যে, ভাষাগত নিয়মাবলি ও উসূলে ফিকহের দৃষ্টিতে তাতে একাধিক অর্থের অবকাশ নেই এবং তা অন্য কোনো শরঈ দলিলেরও বিরোধী হবে না। কেননা যেসব হাদীস 'আখবারে আহাদ'-এর অন্তর্ভুক্ত তার যাচাই-বাছাই, একাধিক অর্থের অবকাশ রাখে এমন জায়গায় হাদীসের অর্থ নির্ধারণ এবং 'মুখতালিফুল হাদীস' তথা বিরোধপূর্ণ হাদীসসমূহের মধ্যে রাজেহ ও মারজুহ নির্ধারণ ইজতিহাদ ছাড়া অন্য উপায়ে সম্ভব নয়। কারণ এসব বিষয়ের সমাধান তো কুরআন-হাদীসে উল্লেখ নেই।

তাই এমতাবস্থায় কোনো মাসআলায় ছুবুত ও দালালত তথা মর্ম ও প্রামাণ্যতার দিক থেকে অকাট্য নয় এমন কোনো হাদীস থাকলেও তা মুজতাহাদ ফী মাসআলাই থেকে যায় এবং সেখানে ইজতিহাদের অবকাশ থাকে। এজন্যই শত শত মাসআলা এমন পাওয়া যায়, যেগুলোর ব্যাপারে হাদীস থাকা সত্ত্বেও তা নিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ইমামগণের

মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে। শুধু জামে তিরমিযী অধ্যয়ন করলেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর বর্তমান সময়ের আকাবির সলফী উলামাদের মাঝে মতভিন্নতাপূর্ণ মাসআলা সংক্রান্ত যে কয়েকটি কিতাবের নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হল সেগুলো অধ্যয়ন করলেও এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। তারপরও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইজতিহাদী বিষয় ও একাধিক সুন্নাহ সম্বলিত বিষয়ে সুন্নাহর প্রতি আহ্বানের সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি

আলহামদুলিল্লাহ এ শিরোনামের বেশ কিছু জরুরি কথা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন শিরোনামের আলোচনায় এসে গেছে। কিছু কথা সামনের শিরোনামগুলোতেও আসবে। তবে গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতার কারণে কিছু কথা আলাদা শিরোনামেও নিবেদন করছি।

ইখতিলাফুত তানাওউ বা একাধিক সুন্নাহ সম্বলিত বিষয়ে আহ্বানের বিধান

প্রথমে 'ইখতিলাফুত তানাওউ' সম্পর্কে আলোচনা করছি।

যেহেতু এখানে মতপার্থক্যের ক্ষেত্র এমন বিষয়, যাতে একাধিক সুন্নাহ রয়েছে, তাই এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা কর্তব্য।

১. যেহেতু সুন্নাহ মোতাবিক আমল হওয়াই উদ্দেশ্য তাই যে এলাকায় যে সুন্নাহর উপর আমল হচ্ছে এবং যে মসজিদে যে সুন্নাহর অনুসরণ হচ্ছে সেখানে তা-ই বহাল থাকতে দেওয়া উচিত। ঐ এলাকায়, ঐ মসজিদে সাধারণ মানুষকে দ্বিতীয় সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া মোটেই উচিত নয়। এ দাওয়াত খাইরুল কুরূন তথা সাহাবা-তাবেয়ীনের যুগে ছিল না। যেসব ক্ষেত্রে সুন্নাহ একটি সেখানে সেই সুন্নাহর বিষয়ে অবহেলা করা হলে সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দিতে হবে। তদ্রূপ কেউ সুন্নাহ ছেড়ে বিদআতে লিপ্ত হলে তাকে বাধা দিতে হবে এবং সুন্নাহর দিকে আসার দাওয়াত দিতে হবে। এ দাওয়াত সালাফের যুগে ছিল।

একাধিক সুন্নাহর ক্ষেত্রগুলোতে বেশির চেয়ে বেশি এই তো হবে যে, আপনার বা আপনার উস্তাদের গবেষণা অনুযায়ী, কিংবা আপনার প্রিয় মুহাদ্দিস বা প্রিয় ইমামের গবেষণা অনুযায়ী যে সুন্নাহ মোতাবেক আপনি আমল করছেন তা অপর সুন্নাহ থেকে অগ্রগণ্য বা সুন্নত হওয়ার দিকটি তাতে বেশি স্পষ্ট। তো এটুকু অগ্রগণ্যতা সাধারণ মানুষকে সেদিকে আহ্বান করার জন্য যথেষ্ট নয়। নতুবা একই কথা অন্য পক্ষেরও বলার অবকাশ থাকবে। তো উভয় পক্ষ যখন নিজেদের দিকে আহ্বান করতে

থাকবে তখন ফলাফল কী হবে? সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে সাধারণ মানুষের মাঝে অস্থিরতা ছড়ানো হবে না কি?

এ শ্রেণীর মতভেদকে তো ইসলাম ও কুফর কিংবা সুন্নাহ ও বিদআর মতো বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার মতভেদ সাব্যস্ত করা যায় না। এখানে অন্য পক্ষের মতামতের দালিলিক ভিত্তি স্বীকার করতে হবে (যদি ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠা থাকে)। তাহলে একের দৃষ্টিতে যে প্রাধান্য ও অগ্রগণ্যতা তা অন্যের উপর কেন আরোপ করা হবে?

২. এ ধরনের বিষয়ে সর্বোচ্চ যা হতে পারে তা এই যে, আলিমগণ নিজেদের মাঝে আলোচনা করতে পারেন এবং পারস্পরিক মতবিনিময় ও চিন্তার আদান-প্রদান হতে পারে। এ জাতীয় বিষয়ে সালাফের ফকীহ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদের থেকে এটুকুই পাওয়া যায়।

৩. এই বিষয়গুলোকে 'নাহি আনিল মুনকারে'র আওতায় নিয়ে আসা এবং কোনো একটি পন্থার উপর মুনকার ও অসৎ কাজের মতো প্রতিবাদ করা, সেই পন্থার অনুসারীদের নিন্দা-সমালোচনা করা, তাদেরকে সুন্নাহবিরোধী ও হাদীসবিরোধী আখ্যা দেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয ও সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ।

এই কথাগুলোর দলিল এই–

ক. যেহেতু দুটো পন্থাই নির্ভরযোগ্য হাদীস বা আছার দ্বারা প্রমাণিত তাই কোনো একটি পন্থার উপর যদি 'আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারে'র বিধান প্রয়োগ করা হয় তাহলে দ্বিতীয় পন্থাটিকে, যা শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত, প্রত্যাখ্যান করা হয়, যা ভুল।

খ. এর দ্বারা 'ইবতালুস সুন্নাহ বিল হাদীস' বা 'ইবতালুস সুন্নাহ বিস সুন্নাহ' অর্থাৎ হাদীস দ্বারা সুন্নাহকে বাতিল করা, কিংবা এক সুন্নাহ দ্বারা অন্য সুন্নাহকে বাতিল করা হয়। এ তো ঐ ক্ষেত্রেও বৈধ নয়, যেখানে দলিলসমূহের মাঝে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ঐ ক্ষেত্রেও তো একটি দলিলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, অন্য দলিলকে বাতিল করা হয় না। তাহলে যে ক্ষেত্রে বিরোধ নয়, সুন্নাহর বিভিন্নতা, সেক্ষেত্রে কীভাবে তা বৈধ হতে পারে?

গ. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় একটি ঘটনায় যখন তাঁর আদেশের মর্ম বোঝার ক্ষেত্রে সাহাবীদের মাঝে মতপার্থক্য হল, আর তা হল ফরয নামায কাযা করার মতো কঠিন বিষয়ে, এরপর এ মতপার্থক্য আল্লাহর রাসূলের দরবারে পেশ করা হল তখন তিনি কোনো পক্ষকেই কিছু বলেননি। সুন্নাহর বিরোধিতার অভিযোগ তো দূরের

কথা। অথচ আদেশটি (হাদীসটি) তাঁরই ছিল। সুতরাং আদেশের উদ্দেশ্যও তাঁর নিশ্চিতভাবেই জানা ছিল। এরপরও কোনো পক্ষকে আদেশ পালনে ব্যর্থ ঘোষণা করেননি। আল্লাহর রাসূল কি উম্মতের জন্য আদর্শ নন? তাহলে উম্মত কীভাবে সুন্নাহর বিভিন্নতার ক্ষেত্রে এ ঘোষণা দিয়ে দেয়?

ঘ. উম্মাহর সালাফ-খালাফ তথা আগের পরের মনীষীগণের ইজমা এই যে-'লা ইনকারা ফী মাসাইলিল ইজতিহাদ' অর্থাৎ 'ইজতিহাদী বিষয়ে প্রতিবাদ নয়'। তাহলে যেসব ক্ষেত্রে সুন্নাহর বিভিন্নতামূলক মতপার্থক্য সেখানে প্রতিবাদ করা কীভাবে বৈধ হয়?

ঙ. আর বিশেষভাবে একাধিক সুন্নাহ সম্বলিত ক্ষেত্রগুলোতে সাহাবা-যুগ থেকে সালাফের নীতি ও অবস্থান 'তাওয়াতুর' তথা উম্মাহকে অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে প্রমাণিত। তাঁরা এ জাতীয় বিষয়ে একে অন্যের প্রতিবাদ করতেন না। আলিমগণ নিজেদের মাঝে আলোচনা করতেন।

উল্লেখিত দলিল-প্রমাণের আলোকে যে কথাগুলো নিবেদন করা হল বড় বড় আলিম ও মনীষীগণও তা বলেছেন। তাদের কিছু উদ্ধৃতি তৃতীয় পরিচ্ছেদে আসছে। কিছু উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে আলোচনায় চলে গেছে। আপাতত আমি দুটি কিতাবের দিকে শ্রোতাবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১. রিসালাতুল উলফা বাইনাল মুসলিমীন (শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর কিছু পুস্তিকা ও ফতোয়ার সমষ্টি)।

সংকলনটি হালাবের মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া থেকে শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ.-এর সম্পাদনায় ও তাঁর টীকা সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রচ্ছদে লেখা আছে-

وفيها أمر الإسلام بالتوحد والائتلاف وحظره التنازع والتفرق عند الاختلاف.

অর্থাৎ এ পুস্তিকায় আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকার আদেশ করে এবং মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার শিকার হতে নিষেধ করে।

সংকলনটিতে তানাওউয়ে সুন্নাহ বা সুন্নাহর বিভিন্নতা সম্পর্কেও শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর একটি পুস্তিকা আছে। তাতে তিনি ইজমা ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, একাধিক সুন্নাহর ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য তাতে উপরোক্ত কর্মপন্থাই অনুসরণীয়।

তিনি লেখেন, 'প্রথমত সালাফের ইজমা আছে যে, এ ধরনের একাধিক সুন্নাহ সম্বলিত ক্ষেত্রগুলোতে হাদীস-সুন্নাহয় বর্ণিত প্রতিটি পন্থাই জায়েয ও

বৈধ। দ্বিতীয়ত এসব বিষয়ের হাদীস ও আছার থেকেও এই প্রশস্ততা প্রমাণিত হয়।'

তিনি লেখেন, 'এই সবগুলো পন্থাই যখন জায়েয ও বৈধ এবং সকল পন্থায় ইবাদত সহীহ হয় তখন কোন পন্থাটি উত্তম ও অগ্রগণ্য–এ মতপার্থক্যে ক্ষতি নেই; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো দুটো পন্থাই সমান, যদিও কোনো আলিমের কাছে কোনো একটি পন্থা অগ্রগণ্য। আর বাস্তবেই যদি কোনো একটি পন্থা উত্তম ও অগ্রগণ্য হয় তাহলেও যিনি তুলনামূলক অনুত্তম পন্থা গ্রহণ করেছেন তার প্রতি জুলুম-অবিচারের অবকাশ নেই। তার নিন্দা-সমালোচনা অবৈধ ও নাজায়েয হওয়ার বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে। আর শুধু এ সকল বিষয়ই নয়, যেক্ষেত্রে স্বয়ং মুজতাহিদের ভুল হয়েছে সেখানেও তো নিন্দা-সমালোচনা মুসলিম উম্মাহর ইজমার ভিত্তিতে নাজায়েয ও অবৈধ।

তিনি আরো বলেন, 'এ সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে উম্মতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা জায়েয নয়। তেমনি কোনো মুস্তাহাব বিষয়কে তার পর্যায় থেকে উপরে উঠানোও জায়েয নয়। হতে পারে, যিনি এই মুস্তাহাব অনুযায়ী আমল করেননি তিনি অন্যান্য ওয়াজিব ও মুস্তাহাব অনুযায়ী আমল করেন এবং এই মুস্তাহাব অনুযায়ী আমলকারীদের চেয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। তো মুস্তাহাবকে ওয়াজিব পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং মনে করা যে, তা কোনো অবস্থাতেই ছাড়া যাবে না, কেউ ছাড়লে সে দ্বীন থেকেই খারিজ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমান, মোটেই জায়েয নয়!

ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন, 'বরং কখনো তো মুস্তাহাব আদায় করার চেয়ে তা ছেড়ে দেওয়া উত্তম হয়ে থাকে, যখন এমন কোনো দ্বীনী তাকাযা এসে যায়, যা ঐ মুস্তাহাবের চেয়ে অগ্রগণ্য।

'এ তো স্বীকৃত বিষয় যে, মুসলমানের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির গুরুত্ব এ ধরনের কিছু মুস্তাহাব থেকে অনেক বেশি। সুতরাং পরস্পর প্রীতি ও সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে এমন কোনো মুস্তাহাব ছেড়ে দিতে বাধা নেই; বরং এটিই উত্তম। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে আপোসে মিল-মহব্বতের প্রয়োজন ঐ মুস্তাহাবের প্রয়োজন থেকে অগ্রগণ্য।

'সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، ولألصقتها بالأرض، ولجعلت لها

بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه.

জাহেলী যুগের সাথে তোমার জাতির ব্যবধান অতি নিকটবর্তী না হলে আমি কাবার বর্তমান ইমারত ভেঙ্গে ফেলতাম এবং তার মেঝে ভূমির সমতলে নিয়ে আসতাম। আর তাতে দুটো দরজা রাখতাম। এক দরজা দিয়ে লোকেরা প্রবেশ করত, অন্য দরজা দিয়ে বের হত।

'ইমাম বুখারী রাহ. এ হাদীসের আলোকে বলেছেন, মানুষকে মিত্র বানানো এবং তাদের মনে ঘৃণা ও বিরক্তির উদ্রেক থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে খলীফাতুল মুসলিমীনের কর্তব্য, কোনো কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা।'–রিসালাতুল উলফা, পৃ. ৪৬-৪৮

শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর পুরা পুস্তিকাটিই এ বিষয়ে। উপস্থিত আলিম ও তালিবে ইলমগণকে আমি কিতাবটি পড়ার আবেদন করছি।

দ্বিতীয় পুস্তিকাটি শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে জইফুল্লাহ আররুহাইলী লিখিত। হিজাযের বগ আলিমদের মাঝে তাঁকে গণ্য করা হয়। তিনি ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তাঁর এই সারগর্ভ ও দলিল সম্বলিত পুস্তিকাটির নাম–

دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجا وأسلوبا

অত্যন্ত দরদের সাথে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে। তাই সেরকম দরদের সাথেই তা পাঠ করা উচিত। আমার সামনে এ পুস্তিকার প্রথম সংস্করণ রয়েছে, যা দারুল কলম বৈরুত থেকে ১৪১০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে।

এতে তিনি উলামা-তালাবা ও দায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, আমরা সুন্নাহর অনুসরণ করতে চাই, সুন্নাহর দিকে আহ্বান করতে চাই, কিন্তু আমাদের এ কাজও তো সুন্নাহ অনুসারেই হতে হবে। সুন্নাহর অনুসরণ করতে গিয়ে, সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে কোনো কাজ যদি সুন্নাহবিরোধী হয়ে যায় তাহলে কেমন হবে?

পুস্তিকার শুরুতে তেরোটি আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং তার আলোকে সর্বমোট ২৪টি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরপর بعض مظاهر المخالفة للسنة 'সুন্নাহ-বিরোধিতার কিছু দৃষ্টান্ত' শিরোনামে তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এমন কিছু সুন্নাহ-বিরোধী কাজ চিহ্নিত করেছেন, যেগুলো সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে এবং সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে করা হয়। এরপর বিভিন্ন শিরোনামে বিস্তারিত ও দালিলিক আলোচনা করেছেন। দীর্ঘ আলোচনা করেছেন একাধিক সুন্নাহর ক্ষেত্রগুলোতে নিজের কাছে অগ্রগণ্য পন্থার দিকে দাওয়াত দেওয়ার বিধান সম্পর্কে। এ পুস্তিকাটিও আদ্যোপান্ত পড়ার মতো। আমি শুধু প্রাসঙ্গিক কিছু কথা তুলে দিচ্ছি।

الإشارة إلى خطأ في مفهومنا لمعنى الالتزام بالكتاب والسنة

وخطأ آخر من أخطائنا في هذا العصر، ارتكبناه في سبيل الدعوة إلى السنة وإلى الاحتكام إلى الكتاب والسنة، وهذا الخطأ هو الجمود باسم الاتباع. لا شك في أن الاتباع للكتاب والسنة واجب، وأن الخضوع والتسليم لهما لازم لكل مسلم، ولا خيرة للمسلم أمام حكم الله وحكم رسوله، كما أنه لا يصلُحُ أن يتقدم بين يدي الله ورسوله بالقول أو التشريع والحكم، هذا أمر لا جدال فيه، ولكن الخطأ والجناية على الكتاب والسنة هما في الحرص على الجمود، وعدم الفقه وسعة البصيرة في فهم الكتاب والسنة في ضوء نصوصهما ومقاصدهما الشرعية.

فترى فينا :

ـ من يتسرع إلى القول بالتحريم

ـ ومن يميل إلى التشديد في فهم الأحكام

ـ من يتجه إلى القول الواحد دائما في المسائل، وإبطال ما عداه.

ـ ومن ينظر إلى المستحبات النظر إلى الواجبات.

ـ ومن يتوهم أن السنة في كل الأمور ليست إلا شيئا واحدا. فيحجر المرء بهذا واسعا. في حين أن السنة في مسألة ما قد تكون على وجهين. وليست وجها واحدا، أو يكون الأصل في بعض الأمور أن السنة فيه الإطلاق، وليس التقييد والتحديد.

সংক্ষিপ্ত তরজমা

কিতাব-সুন্নাহর অনুসরণের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের একটি ভুল

এ যুগের একটি ভুল, যা কিতাব ও সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে আমরা করে থাকি তা হচ্ছে ইত্তিবার নামে স্থবিরতা। কিতাব ও সুন্নাহ যে অবশ্যঅনুসরণীয় এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর জন্য তো জ্ঞান ও

প্রজ্ঞা লাগবে এবং কিতাব ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝতে হবে। আজ আমাদের ভুল এখানেই যে, আমরা ইত্তিবা ও অনুসরণের নামে জুমুদ ও স্থবিরতার আশ্রয় নিয়েছি। সঠিকভাবে বোঝা ছাড়াই নিজের বুঝের দিকে দাওয়াত দিচ্ছি।

– কারো কারো প্রবণতা এই যে, কোনো কিছুকে হারাম বলার আগে পর্যাপ্ত চিন্তা-ভাবনা করে না।

– কেউ শরীয়তের বিধান বোঝার ক্ষেত্রে কাঠিন্য ও কড়াকড়ির দিককে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

– কেউ ইখতিলাফী মাসায়েলের ক্ষেত্রে সর্বদা একটি মতই স্বীকার করে এবং অন্যসব মত প্রত্যাখ্যান করে।

– কেউ মুস্তাহাব বিষয়ের সাথে ওয়াজিবের মতো আচরণ করে

– কেউ মনে করে, সকল বিষয়ে সুন্নাহ কেবল একটিই হয়। এভাবে একটি প্রশস্ত ক্ষেত্রকে তারা সংকীর্ণ বানিয়ে ফেলে। অথচ কোনো কোনো বিষয়ে সুন্নাহর দুটি পন্থা থাকে (অর্থাৎ উভয় পন্থা সুন্নাহসম্মত হয়)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু মূল বিষয়টি সুন্নাহ হয়ে থাকে, বিশেষ কেনো পন্থা নয়। *(পৃ. ৫০-৫১)*

তিনি আরো লেখেন–

الإشارة إلى مسلك خاطئ في فهمنا لمسائل الخلاف الفرعية وطريقة دعوتنا إلى الراجح فيها

لقد ابتليت الأمة الإسلامية في هذا العصر بظهور شيء من الروح الجدلية لدى كثير من المسلمين الصالحين مع نزعة إلى الشدة والغلظة والفظاظة في طريقة الدعوة وفي الحوار الموقف حتى في المسائل الفقهية الخلافية.

وقد ترتب على هذه الطريقة كثير من المفاسد التي لا يقرها الإسلام، ومن ذلك :

_ تفرق الصف الإسلامي على مسائل فرعية، ففي سبيل الحماس لها والأخذ بالصواب فيها نسِيَتْ بعض الأصول في كثير من الأحيان في سبيل التمسك بالصواب في المسائل الخلافية في تلك الفروع!

_ وترتب على ذلك ظهور التعصبات والتحيّزات التي يرافقها الجهل والظلم، بدعوى الحرص على الحق والصواب في تلك الأمور الخلافية من المسائل الفرعية والأساليب والوسائل ! ! .

_وترتب على ذلك تجرؤ كثير من صغار الطلاب على الاجتهاد والفتيا وآداب العلم و"المشيخة" أو "الزعامة" العلمية أو الدعوية من قِبَل هؤلاء الصغار، الذين لم يأتوا بجديد سوى الخلاف والفُرقة والابتعاد عن الجادة، وكان يسعهم الحرص على الخير في منهج وسط يبعدهم عن كل هذه الأنواع من الشر ! .

_ لقد نَتَجَ عن هذه المسالك الخاطئة في الدعوة وفي طلب العلم والتفقه في الدين والتعامل مع المخالفين تضخيم بعض الأحكام الفرعية والغلوّ في السنن والمستحبات، وذلك أمر لا يقره الدين، لأن السنن والمستحبات هي من الدين وينبغي أن تؤخذ على أنها كذلك، ولا يجوز أن يتجاوز بها قدرها، كما أنه لا يجوز أن تنقص عن قدرها الذي وضعها الله فيه، والدين بين الغالي والجافي والمُفْرِط والمفرّط ونتج عن هذا الخلل _ كما قلت _ الوقوع فيما نهى الله تعالى عنه من التفرق في الدين والتفرق في الصف، وآيات الله تعالى أعظم شاهد في نهي الله تعالى أشد النهي عن الأمرين كليهما، وكذا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة فقهاء هذه الأمة : أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة السلف، فمن تأمل ذلك كله أدرك الحق في هذه المسألة.

وإن المصلِحَ الحق هو ذلك الذي يسعى في الإصلاح من غير أن يرافق إصلاحه إفساد، أو من غير أن يلبس إصلاحه بإفساد يَعْلَمُهُ أو لا يَعْلَمُهُ ! .

তার আলোচনার মূল আরবী পাঠ উল্লেখ করা হয়েছে। শাখাগত বিষয়ে নিজের কাছে অগ্রগণ্য মতের দিকে আহ্বান করার উপর তিনি কঠিন ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন।

তিনি বলেন, এর দ্বারা মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল বিষয়ের পিছনে পড়ে উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির বিষয়টি ভুলে যাওয়া হয়েছে; বরং শাখাগত মাসাইলের পিছনে পড়ে কিছু মৌলিক বিষয়ও চিন্তা থেকে অন্তর্হিত হয়েছে।

– এসব বিষয়ে বাহাস-বিতর্কের পন্থা অনুসরণ করে সময়ের অপচয় করা হয়েছে। ঈমানী মহব্বত খতম করা হয়েছে। শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে, যা কোনো মুসলিম তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি পোষণ করতে পারে না।

– (যে মতপার্থক্য শরীয়তসম্মত ছিল তাতে মতপার্থক্যের নীতি ও বিধান ত্যাগ করে ভুল পন্থা অনুসরণ করার ফলে) মানুষের মাঝে অন্যায় পক্ষপাত ও দলীয় চেতনা সৃষ্টি হয়েছে, যার অনিবার্য ফল হচ্ছে, মূর্খতা ও অবিচার।

– এই কর্মপদ্ধতির কারণে ছোট ছোট তালিবুল ইলমও নির্দ্বিধায় ইজতিহাদ ও ফতোয়ার ময়দানে প্রবেশ করেছে, যা বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা ছাড়া নতুন কোনো সুফল দিতে সক্ষম হয়নি।

– এই ভুল কর্মপন্থার কারণে শাখাগত বিষয়গুলোকে বড় বানিয়ে পেশ করা, সুন্নত-মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা এবং এমনসব বিষয় পয়দা হচ্ছে, যা ইসলামে বৈধ নয়। সুন্নত-মুস্তাহাবকে না তার অবস্থান থেকে উপরে তোলা যাবে, না নীচে নামানো যাবে। দ্বীনের মাঝে কোনো প্রকারের প্রান্তিকতাই বৈধ নয়।

কর্মপন্থার ভুলে দ্বীনের বিষয়ে বিভেদ ও উম্মাহর মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহই সাক্ষ্য দেয়, কত কঠিনভাবে তিনি তা নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাত, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের সীরাতও এ বিষয়ে সাক্ষী।

সত্যিকারের সংস্কারক তো তিনিই, যার সংস্কার-কর্মে ধ্বংসের উপাদান থাকে না।–পৃ. ৪৮-৪৯

আমার ধারণা, একাধিক সুন্নাহ বিষয়ে যে মতপার্থক্য সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার জন্য এটুকু আলোচনাই যথেষ্ট ইনশাআল্লাহ।

ইজতিহাদী মাসাইল বা ফুরুয়ী মাসাইলে মতভিন্নতার ক্ষেত্রে সঠিক কর্মপন্থা

ইজতিহাদী মাসাইল কাকে বলে তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এর অপর নাম **আলফুরু'** বা ফুরূয়ী মাসাইল। এসকল মাসআলায় দলিলের ধরনই এমন যে, আলিম ও গবেষকদের মাঝে মতপার্থক্য হতে পারে। এবং হয়েছে। তাই এই মতপার্থক্য বিলুপ্ত করার চেষ্টা কোনো সমাধান নয়; এতে মতভেদ আরো বাড়বে। এখানে করণীয় হচ্ছে, ইখতিলাফের নীতি ও বিধান কার্যকর করে ইখতিলাফকে তার সীমায় আবদ্ধ রাখা; একে কলহ-বিবাদের কারণ হতে না দেওয়া।

আজ মুসলিম উম্মাহর ট্রাজেডি এই যে, শাখাগত বা অপ্রধান বিষয়কে কেন্দ্র করে তারা কলহ-বিবাদে লিপ্ত হচ্ছে এবং নিজেদের শক্তি খর্ব করছে। যেন কুরআন মজীদের নিষেধ–ولا تنازعوا فتفشلوا এর বাস্তব দৃষ্টান্ত। বিষয়টা আরব-আজমের সংবেদনশীল উলামা-মাশাইখকে অস্থির করে রেখেছে। তাঁরা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন এবং দিয়ে যাচ্ছেন।

গত শতাব্দীতে আরবের কিছু ব্যক্তি তাকলীদের বিরুদ্ধে এত বলেছেন এবং ফূরূয়ী মাসাইলের ক্ষেত্রে এত কড়াকড়ি করেছেন যে, যুবশ্রেণীর মাঝে দ্বীনের বিষয়ে স্বেচ্ছাচার ও লাগামহীনতার বিস্তার ঘটেছে, যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেখানের বড়দেরকে রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয়েছে। তো এখানেও ঐ তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায় না থেকে আগেভাগেই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

আমি প্রথমে সালাফে সালেহীনের কিছু ঘটনা ও নির্দেশনা উল্লেখ করছি। এরপর ইনশাআল্লাহ বর্তমান যুগের আরব-আজমের কয়েকজন মুরব্বী আলিমের নির্দেশনা তুলে ধরব।

১. ইমাম দারিমী রাহ. (১৮১–২৫৫ হি.) তাঁর কিতাবুস সুনানে বর্ণনা করেছেন যে, (তাবেয়ী) হুমাইদ আততবীল (আমীরুল মুমিনীন) উমার ইবনে আবদুল আযীয রাহ.কে বললেন, 'আপনি যদি সকল মানুষকে এক বিষয়ে (এক মাযহাবে) একত্র করতেন তাহলে ভালো হত।' তিনি বললেন, 'তাদের মাঝে মতপার্থক্য না হলে আমি খুশি হতাম না।' এরপর তিনি ইসলামী শহরের গভর্ণরদের উদ্দেশে ফরমান পাঠালেন–

ليقض كل قوم بما اجتمع عليه فقهاءهم

প্রত্যেক কওম যেন ঐ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফায়সালা করে, যে বিষয়ে তাদের ফকীহগণ (আলিমগণ) একমত।–সুনানুদ দারিমী, পৃষ্ঠা : ১৩৪

২. ইমাম ইবনে আবী হাতেম ইমাম মালেক থেকে বর্ণনা করেন যে, খলীফা আবু জাফর মানসুর আগ্রহ প্রকাশ করলেন যে, আমি চাই গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যে এক ইলমের (অর্থাৎ মুয়াত্তা মালিকের) অনুসরণ হোক। আমি সকল এলাকার কাযী ও সেনাপ্রধানদের নিকট এ ব্যাপারে ফরমান জারি করতে চাই। ইমাম মালেক রাহ. বললেন, 'জনাব! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উম্মতের মাঝে ছিলেন। তিনি বিভিন্ন জনপদে সেনাদল প্রেরণ করেছেন, কিন্তু ইসলামের দিগ্বিজয়ের আগেই তাঁর ওফাত হয়ে গেছে। এরপর আবু বকর খলীফা হয়েছেন। তাঁর আমলেও বেশি কিছু রাজ্য বিস্তার হয়নি। এরপর উমর খলীফা হয়েছেন। তাঁর সময়ে প্রচুর শহর ও জনপদ বিজিত হয়েছে। তিনি সেসব বিজিত এলাকায় শিক্ষা-দীক্ষার জন্য সাহাবীগণকে প্রেরণ করেছেন। সেই সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত (প্রত্যেক জনপদে সাহাবীগণের শিক্ষাই) এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছেছে।

'অতএব আপনি যদি তাদেরকে তাদের পরিচিত অবস্থান থেকে অপরিচিত কোনো অবস্থানে ফেরাতে চান তবে তারা একে কুফরী মনে করবে। সুতরাং প্রত্যেক জনপদকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন এবং নিজের জন্য এই ইলমকে (মুয়াত্তা মালেক) গ্রহণ করুন।'

আবু জাফর তাঁর কথা মেনে নিলেন।'–তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদীল, ইমাম ইবনে হাতিম রাযী (৩২৭ হি.) পৃষ্ঠা : ২৯

ইবনে সা'দের বর্ণনায় ইমাম মালেকের বক্তব্যে উল্লেখ আছে যে–

يا أمير المؤمنين! لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا.

ইয়া আমীরাল মুমিনীন! এমনটি করবেন না। কেননা, লোকেরা (সাহাবীগণের) বক্তব্য শুনেছে, হাদীস শুনেছে, রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছে এবং প্রত্যেক জনগোষ্ঠী তাই গ্রহণ করেছে, যা তাদের নিকট পৌঁছেছে এবং তদানুযায়ী আমল করেছে।'–আততবাকাত ৪৪০ (القسم المتمم)

খতীব বাগদাদীর বর্ণনায় আছে, ইমাম মালেক বলেন–

يا أمير المؤمنين! إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله تعالى.

ইয়া আমীরাল মুমিনীন! নিঃসন্দেহে আলেমগণের মতপার্থক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য রহমত। প্রত্যেকে তাই অনুসরণ করে, যা তার নিকট সহীহ সাব্যস্ত হয়েছে, প্রত্যেকেই হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেকেই আল্লাহর (সন্তুষ্টি) কামী।'–কাশফুল খাফা, আলআজলূনী ১/৫৭-৫৮; উকূদুল জুমান, আসসালেহী ১১

বিচক্ষণ ব্যক্তিদের জন্য এই দুটি ঘটনায় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অনেক উপাদান আছে।

৩. ইমাম ইবনে কুদামা মাকদিসী রাহ. (৫৪১ হি.–৬২০ হি.) 'লুমআতুল ইতিকাদিল হাদী ইলা সাবীলির রাশাদ' কিতাবে–যা আকীদার একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব–লেখেন–

وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع، فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة.

অর্থ : 'দ্বীনের ফুরূ তথা শাখাগত বিষয়ে ইমামের সাথে সম্বন্ধ নিন্দার বিষয় নয়, যেমন চার মাযহাবে আছে। কারণ ফুরূর ক্ষেত্রে মতভেদ হচ্ছে রহমত। এই মতপার্থক্যকারীগণ তাদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে প্রশংসিত এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আজর ও ছওয়াবের অধিকারী। তাদের মতপার্থক্য হল প্রশস্ত রহমত আর তাদের মতৈক্য হচ্ছে অকাট্য দলিল।'

শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. সম্ভবত তার শেষোক্ত বাক্যটির দিকেই ইশারা করেছেন এবং সমর্থন করে বলেছেন–

ولهذا كان بعض العلماء يقول : إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة

'এ কারণেই জনৈক আলিম বলতেন, তাদের মতৈক্য হচ্ছে অকাট্য দলিল। আর তাদের মতভেদ হচ্ছে প্রশস্ত রহমত।–মাজমূউল ফাতাওয়া ৩০/৮০

ফুরূয়ী মাসাইলের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে কেরামের মতপার্থক্য রহমত কীভাবে হয় তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আলকাউসারের উদ্বোধনী সংখ্যায় (মুহাররামুল হারাম ১৪২৬ হিজরীতে) প্রকাশিত মাওলানা আবুল বাশার ছাহেবের প্রবন্ধে রয়েছে। আমি তার সাথে এটুকু যোগ করছি যে, এক্ষেত্রে কারো মনে প্রশ্ন জাগে, হাদীসে আছে– الجماعة رحمة জামাআ হচ্ছে রহমত। অথচ এখানে الاختلاف رحمة অর্থাৎ মতপার্থক্যকে রহমত বলা

হচ্ছে?! আসলে তাদের পুরা হাদীসের উপর চিন্তা করা দরকার ছিল। যে হাদীসে জামাআকে রহমত বলা হয়েছে তার শেষ বাক্যটি হচ্ছে والفرقة عذاب অর্থাৎ বিভেদ হল আযাব। অর্থাৎ এখানে 'জামাআ' অর্থ বিভেদ না হওয়া। আর এটা যেমন ইজমার ক্ষেত্রে আছে তেমনি আছে শরীয়তসম্মত মতপার্থক্যের ক্ষেত্রেও। এ কারণে এ মতপার্থক্য আযাব নয়। একে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত করা আযাব।

বর্তমান যুগের আকাবির ও মাশাইখ

১. মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. (১৩১৪ হি.-১৩৯৬ হি.)

জাওয়াহিরুল ফিকহের প্রথম খণ্ডে হযরতের দুটি রিসালা আছে। দুটোই মূলত আলিমদের সমাবেশে দেওয়া বক্তব্য : ১. ওয়াহদাতে উম্মত, ২. ইখতিলাফে উম্মত পর এক নজর আওর মুসলমানোঁ কে লিয়ে রাহে আমল। দুটো রিসালাই আমাদের পাঠ করা উচিত।

প্রথম পুস্তিকার শেষে হযরত বলেন, দায়িত্বশীল আলিমদের প্রতি ব্যথিত নিবেদন-'রাজনীতি ও অর্থনীতির অঙ্গনে এবং পদ ও পদবীর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন তার প্রতিকার তো আমাদের সাধ্যে নেই। কিন্তু দ্বীনী ও ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত দলগুলোর নীতি ও কর্মপন্থার যে বিরোধ তা বোধ হয় দূর করা সম্ভব। কারণ সবার লক্ষ্য অভিন্ন। আর লক্ষ্য অর্জনে সফলতার জন্য তা অপরিহার্য। যদি আমরা ইসলামের বুনিয়াদী উসূল ও মৌলনীতি সংরক্ষণের এবং নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার স্রোত মোকাবেলাকে সত্যিকার অর্থে মূল লক্ষ্য মনে করি তাহলে এটিই সেই ঐক্যের বিন্দু, যেখানে এসে মুসলমানদের সকল ফের্কা ও সব দল একত্রিত হয়ে কাজ করতে পারে আর তখনই এই স্রোতের বিপরীতে কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কার্যকর হতে পারে।

কিন্তু বাস্তব অবস্থার দিকে তাকালে বলতে হয়, এই মূল লক্ষ্যটিই আমাদের দৃষ্টি থেকে গায়েব হয়ে গেছে। এ কারণে আমাদের সমস্ত সামর্থ্য এবং জ্ঞান ও গবেষণার সমুদয় শক্তি নিজেদের ইখতিলাফি মাসআলায় ব্যয় হচ্ছে। ওগুলোই আমাদের ওয়াজ, জলসা, পত্রিকা ও বই-পুস্তকের আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এমন কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষ এ কথা মনে করতে বাধ্য হচ্ছে যে, ইসলাম ধর্ম কেবল এই দুই-চার জিনিসের নাম। আরো আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইখতিলাফী মাসআলাসমূহে যে দিকটি কেউ অবলম্বন করেছে তার বিপরীতটিকে গোমরাহী এবং ইসলামের

শত্রুতা আখ্যা দিচ্ছে। ফলে আমাদের যে শক্তি কুফুরি, নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা এবং সমাজে বাড়তে থাকা বেহায়াপনার মোকাবেলায় ব্যয় হতে পারত তা এখন পরস্পর কলহ-বিবাদে ব্যয় হচ্ছে। ইসলাম ও ঈমান আমাদেরকে যে ময়দানে লড়াই ও আত্মত্যাগের আহ্বান জানায় সেই ময়দান শত্রুর আক্রমণের জন্য খালি পড়ে আছে। আমাদের সমাজ অপরাধ ও অন্যায়ে ভরপুর, আমল-আখলাক বরবাদ, চুক্তি ও লেনদেনে ধোঁকাবাজি, সুদ, জুয়া, মদ, শূকর, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা ও অপরাধপ্রবণতা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মিশে গেছে।

প্রশ্ন হল, আম্বিয়া কেরামের বৈধ উত্তরসূরী এবং দেশ ও ধর্মের প্রহরীদের নিজেদের মধ্যেকার মতপার্থক্যের বেলায় যতটা সংক্ষুব্ধ হতে দেখা যায় তার অর্ধেকও কেন সেসব খোদাদ্রোহীদের বেলায় দেখা যায় না? এবং পরস্পর চিন্তাগত মতপার্থক্যের বেলায় যেমন ঈমানী জোশ প্রকাশ পায় তা ঈমানের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কেন প্রকাশ পায় না? আমাদের বাকশক্তি এবং লেখনীশক্তি যেমন শৌর্যবীর্যের সাথে নিজেদের ইখতিলাফি মাসআলায় লড়াই করে তার সামান্যতম অংশও কেন ঈমানের মৌলিক বিষয়ের উপর আসা হুমকির মোকাবেলায় ব্যয় হয় না? মুসলমানদেরকে মুরতাদ বানানোর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা সকলে কেন সিসাঢালা প্রাচীরের মতো রুখে দাঁড়াই না? সর্বোপরি আমরা এ বিষয়ে কেন চিন্তা করি না যে, নবী প্রেরণ ও কুরআন নাযিলের ঐ মহান উদ্দেশ্য, যা পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে এবং যা পরকে আপন বানিয়ে নিয়েছে, যা আদম সন্তানদেরকে পশুত্ব থেকে মুক্ত করে মানবতার মর্যাদা দিয়েছে এবং যা সমগ্র দুনিয়াকে ইসলামের আশ্রয়কেন্দ্র বানিয়েছে তা কি শুধু এই সব বিষয়ই ছিল, যার ভিতর আমরা লিপ্ত হয়ে আছি। এবং অন্যদেরকে হেদায়েতের পথে আনার তরীকা ও পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত দেওয়ার কি এটাই ছিল ভাষা, যা আজ আমরা অবলম্বন করেছি?

এখনো কি সময় হয়নি যে, ঈমানদারদের অন্তরগুলো আল্লাহর স্মরণ ও তার নাযিলকৃত সত্যের সামনে অবনত হবে ...

শেষ পর্যন্ত তাহলে ঐ সময় কবে আসবে যখন আমরা দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পদ্ধতিগত বিষয়আশয় থেকে কিছুটা অগ্রসর হয়ে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সংরক্ষণ এবং অবক্ষয়প্রাপ্ত সমাজের সংশোধনকে নিজেদের আসল কর্তব্য মনে করব। দেশের মধ্যে খৃস্টবাদ ও কমিউনিজমের সর্বগ্রাসী সয়লাবের খবর নিব। কাদিয়ানীদের হাদীস অস্বীকার ও ধর্ম বিকৃতির জন্য কায়েম করা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত ও এসলাহের মাধ্যমে মোকাবেলা করব।

আর যদি আমরা এগুলো না করি এবং হাশরের ময়দানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ প্রশ্ন করেন যে, আমার দ্বীন ও শরীয়তের উপর এই হামলা হচ্ছিল, ইসলামের নামে কুফরি বিস্তার লাভ করছিল, আমার উম্মতকে আমার দুশমনের উম্মত বানানোর ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলছিল, কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য বিকৃতি ঘটছিল, আল্লাহ ও রাসূলের প্রকাশ্য নাফরমানি করা হচ্ছিল তখন তোমরা ইলমের দাবীদারেরা কোথায় ছিলে? তোমরা এর মোকাবেলায় কতটা মেহনত এবং ত্যাগ স্বীকার করেছ? কতজন বিপথগামী ব্যক্তিকে পথে এনেছ? তো আমাদের ভেবে দেখা উচিত সেদিন আমাদের উত্তর কী হবে?

কর্মপন্থা

এজন্য জাতির প্রতি সংবেদনশীল এবং ঈমান ও ইসলামের উসূল ও মাকসাদসমূহের প্রতি সচেতন উলামায়ে কেরামের কাছে আমার ব্যথাভরা নিবেদন–মাকসাদের গুরুত্ব ও নাযুকতাকে সামনে রেখে সবার আগে মন থেকে এই অঙ্গীকার করুন যে, নিজেদের ইলমী ও আমলী যোগ্যতা এবং কথা ও কলমের শক্তিকে বেশির থেকে বেশি ঐ ময়দানে নিয়োজিত করবেন, যার সংরক্ষণের জন্য কুরআন ও হাদীস আপনাদের ডাকছে।

১. সম্মানিত ওলামা! এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন এবং প্রতিজ্ঞা করুন যে, এ কাজের জন্য নিজের বর্তমান ব্যস্ততার মধ্য থেকে বেশির থেকে বেশি সময় বের করবেন।

২. পরস্পর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও ইজতিহাদী বিরোধকে কেবল নিজেদের দরস এবং লেখালেখি ও ফতওয়া পর্যন্ত সীমিত রাখবেন। আম জলসা, পত্রপত্রিকা, বিজ্ঞপ্তি, পরস্পর বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে তাকে বড় করবেন না। নবীদের মতো দাওয়াত ও ইসলাহের নীতির অধীনে কষ্টদায়ক ভাষা, নিন্দা, উপহাস, আক্রমণ ও সাংবাদিকদের মতো বাক্যচালনা থেকে বিরত থাকবেন।

৩. সমাজে ছড়িয়ে পড়া ব্যধিসমূহের প্রতিকারের জন্য হৃদয়গ্রাহী শিরোনামে স্নেহ ও আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষা ও আঙ্গিকে কাজ শুরু করুন।

৪. নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতা এবং কুরআন-সুন্নাহর বিকৃতির মোকাবেলার জন্য পয়গম্বরদের দাওয়াতের নীতি অনুসারে প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশল, আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনা এবং হৃদয়গ্রাহী দলিল প্রমাণের মাধ্যমে وجادلهم بالتي هي أحسن এর সাথে নিজের মুখের ভাষা ও কলমের শক্তিকে ওয়াকফ করে দিন।

দ্বিতীয় বক্তৃতায় তিনি 'এক মাযহাবে'র চিন্তাকে ভুল চেষ্টা সাব্যস্ত করে মতপার্থক্য ও ঝগড়া-বিবাদের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এবং মাযহাবের নামে কলহ-বিবাদের সমাধান নির্দেশ করেছেন।

তিনি বলেন, 'আজকে যখন মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতা চরমে পৌঁছেছে, নিজের দাবির পরিপন্থী কোনো কথা মানতে, এমনকি শুনতে পর্যন্ত কেউ প্রস্তুত নয়, আর এমন কোনো শক্তিও নেই, যা কোনো দলকে বাধ্য করতে পারে, তো এই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ এবং তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষার কেবল একটিই পথ আছে। তা হল দল ও সংগঠনসমূহের দায়িত্বশীলগণ এ বিষয়ে একটু চিন্তা করবেন—যেসব বিষয় নিয়ে আমরা ঝগড়া-বিবাদ করছি সেগুলোই কি ইসলামের বুনিয়াদী মাসাইল ও মৌলিক বিষয়, যার জন্য কুরআন নাযিল হয়েছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন, যার জন্য নবীজী তার পুরো জীবন নিবেদিত করেছেন এবং সব রকম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, নাকি বুনিয়াদী মাসাইল এবং কুরআন ও ইসলামের আসল দাবি অন্য কিছু।

'যে দেশকে একদিকে খৃস্টান মিশনারীরা নিজেদের পূর্ণ শক্তি এবং পার্থিব জাকজমকের সাথে খৃস্টান-রাজ্য বানানোর স্বপ্ন দেখছে আরেকদিকে প্রকাশ্যে আল্লাহর বান্দা এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, অন্যদিকে কুরআন ও ইসলামের নামে ঐসব কিছু করা হচ্ছে, যাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই কুরআন ও ইসলাম এসেছিল, সে দেশে কেবল শাখাগত মাসাইল এবং তার বিচার-পর্যালোচনা ও প্রচারণার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে ঐ মৌলিক বিষয়াদি থেকে যারা উদাসীন রয়েছি তাদের প্রতি যদি আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর তরফ থেকে প্রশ্ন করা হয়—তোমাদের দ্বীনের বিষয়ে যখন এই সকল বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তোমরা তার জন্য কী করেছিলে? তখন আমাদের কী জবাব হবে? আমার বিশ্বাস, কোনো ফের্কা, কোনো জামাত যখন বিভেদ-বিতর্ক থেকে উপরে উঠে এ বিষয়ে চিন্তা করবে তখন তার বর্তমান কাজকর্মের জন্য অনুশোচনা হবে এবং তার তৎপরতার রোখ বদলে যাবে। যার ফলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ নিশ্চয়ই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে।

'আমি এই মুহূর্তে কাউকে বলছি না যে, নিজেদের চিন্তাধারা ও দাবি-দাওয়া থেকে সরে আসুন। অনুরোধ শুধু এতটুকু যে, নিজেদের শ্রম ও সামর্থ্য ব্যয়ের সঠিক ক্ষেত্র অনুসন্ধান করে সেখানে নিয়োজিত করুন এবং পরস্পর মতপার্থক্যগুলোকে কেবল দরসের হালকায়, কিংবা ফতোয়া ও গবেষণাধর্মী পুস্তিকা পর্যন্ত সীমিত রাখুন এবং সেক্ষেত্রেও ভাষা ও আঙ্গিক

কুরআনের দাওয়াতের নীতি অনুযায়ী নরম রাখুন। কাঁদা ছোড়াছুড়ি ও অন্যের অসম্মানকে বিষতুল্য জানুন। আমাদের সাধারণের বৈঠক, পত্রপত্রিকা ও বিজ্ঞপ্তিগুলো যদি পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে ফাকা সমর্থনের পরিবর্তে ইসলামের মৌলিক ও সর্ববাদীসম্মত বিষয়গুলোতে যুক্ত হয় তাহলে আমাদের বিবাদ, যা বিশালাকার রূপ নিয়েছে পুনরায় জিহাদে রূপান্তরিত হতে পারবে। আর তার ফলে সর্বসাধারণের দৃষ্টিও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ থেকে ফিরে দ্বীনের সঠিক খেদমতের প্রতি নিবদ্ধ হবে।'

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. যে নসীহত করেছেন তা তাঁর একার কথা নয়। এ তো প্রতি যুগের বিচক্ষণ ও সংবেদনশীল ব্যক্তিদের হৃদয়ের স্পন্দন। শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ.ও 'সিফাতে কালাম' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন–

والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف، فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله.

'নস ও ইজমা দ্বারা যে বাক্যগুলো প্রমাণিত সাধারণ মানুষকে তারই আদেশ করতে হবে এবং এ বিষয়ে বিশদে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। নতুবা তাদের মাঝে বিভেদ ও বিবাদ সৃষ্টি হবে। বিভেদ ও বিবাদ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সবচেয়ে বড় নিষেধগুলোর অন্যতম।

২. শায়খ হাসান আলবান্না রাহ. (১৩২৪-১৩৬৮ হি.)

শহীদে মিল্লাত শায়খ হাসান আলবান্না রাহ. তাঁর রিসালা دعوتنا তে এ বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় ভারসাম্যপূর্ণ নির্দেশনা দান করেছেন। তিনি লেখেন–

'দ্বীনী বিষয়ে মতভিন্নতার ক্ষেত্রে

এখন আমি দ্বীনী বিষয়ে মতভিন্নতা ও মাযহাবী রায় ও সিদ্ধান্তসমূহের বিষয়ে আপনাকে কিছু কথা বলব।

'জামাতবদ্ধ থাকুন, বিচ্ছিন্ন হবেন না

মনোযোগ দিয়ে শুনুন–আল্লাহ তাআলা আপনাকে যথাযথ বোঝার তাওফীক দিন–প্রথম কথা এই যে, আলইখওয়ানুল মুসলিমূনের আহ্বান একটি সর্বজনীন আহ্বান, এই আহ্বান কোনো দল বা গোষ্ঠির সাথে সম্বন্ধযুক্ত নয়, কিংবা এমন কোনো মতাদর্শের সাথেও যুক্ত নয়, যা নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও অনুষঙ্গের দ্বারা সমাজে পরিচিত। এই আহ্বান দ্বীনের মৌলিক ও সারবস্তুর সাথেই সম্পৃক্ত।

আমরা চাই আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির একতা, যাতে আমাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে এবং ফলাফল হবে অনেক বড় ও বেশি। তো ইখওয়ানের দাওয়াত একটি খালিস সফেদ দাওয়াত, এতে অন্য কোনো বর্ণের মিশ্রণ নেই এবং তা সর্বক্ষেত্রে হক ও সত্যেরই সহচর। তা ইজমা পছন্দ করে এবং শুযুয ও বিচ্ছিন্নতা অপছন্দ করে।

এখন যে বস্তুর দ্বারা মুসলিম উম্মাহ সবচেয়ে বড় পরীক্ষার সম্মুখীন তা হচ্ছে, বিভেদ ও বিরোধ। অথচ যে বিষয় তার মদদ ও নুসরতের মূল তা হচ্ছে, ঐক্য ও সম্প্রীতি। এই উম্মাহর শেষ অংশের সংশোধনও ঐ পথেই হবে, যে পথে তার প্রথম অংশ সংশোধিত হয়েছে। এটি একটি মূলনীতি এবং প্রতিটি মুসলিম ভাইয়ের নির্ধারিত লক্ষ্য। আর এটাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসেই আমরা পরিতৃপ্ত এবং এরই দিকে অন্যদেরও আহ্বান করি।

'মতভিন্নতা তো অনিবার্য

আমরা ঐক্যের পক্ষে। আবার এ কথাও বিশ্বাস করি যে, দ্বীনের ফুরূয়ী বিষয়ে মতভিন্নতা অনিবার্য। এক্ষেত্রে সকলের মত বা মাযহাব অভিন্ন হওয়া অসম্ভব। এর বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যেমন–

১. দলিল থেকে মাসআলা আহরণের ক্ষেত্রে বোধশক্তির তারতম্য। দলিল জানা, না জানা; দলিলের গভীরে পৌঁছা এবং একটি বিষয়ের সাথে আরেকটি বিষয়ের যোগসূত্র এ সকল ক্ষেত্রেই চিন্তা ও সিদ্ধান্তের তারতম্য।

দ্বীন তো আয়াত, হাদীস, নুসূস যেগুলোকে ব্যাখ্যা করে ভাষার নিয়মনীতি অনুসারে মানুষের চিন্তাশক্তি আর এক্ষেত্রে স্বভাবতই মানুষের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং মতপার্থক্যও অনিবার্য।

২. ইলমের পরিধি কম বা বেশি হওয়া। একজনের কাছে একটি নস পৌঁছেছে, কিন্তু আরেকজনের কাছে তা পৌঁছেনি। উভয়জনের ক্ষেত্রেই এটা সত্য। এ বিষয়েই ইমাম মালিক রাহ. (খলীফা) আবু জাফরকে বলেছিলেন, রাসূলের সাহাবীগণ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েছেন। প্রত্যেকেই ছিলেন ইলমের বাহক। (তাদের কাছ থেকেই মানুষ দ্বীন শিখেছে আর সাহাবীদের মাঝে বিভিন্ন মাসআলায় মতভিন্নতা ছিল) এ অবস্থায় আপনি যদি তাদেরকে একটি মতের উপর আনতে চান তাহলে ফিতনা দেখা দিবে।

৩. স্থান ও কালের ভিন্নতা। এ কারণেও মানুষের মতের মাঝে ভিন্নতা আসে। লক্ষ্য করুন, ইমাম শাফেয়ী রাহ. ইরাকে অবস্থানকালে একই বিষয়ে একটি ফতোয়া দিতেন, কিন্তু মিশর যাওয়ার পর সে বিষয়ে ভিন্ন ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু উভয় ফতোয়ার ক্ষেত্রে দলিলের বিশ্লেষণে তার

কাছে যা স্পষ্ট ও সঠিক মনে হয়েছে সে ফতোয়া দিয়েছেন। কোনো অবস্থাতেই তিনি হকের অনুসন্ধানে ত্রুটি করেননি।

৪. রেওয়ায়েত সহীহ হওয়া, না হওয়ার বিষয়ে অশ্বস্তির পার্থক্য। আমরা দেখি, একই রাবী বা বর্ণনাকারী এক ইমামের কাছে নির্ভরযোগ্য, কিন্তু আরেক ইমামের কাছে নির্ভরযোগ্য নন।

৫. দলিলের মূল্যায়ন। কেউ খবরে ওয়াহিদের তুলনায় আমলকে প্রাধান্য দেন, কিন্তু অন্যজন তা দেন না।

'শাখাগত মাসআলায় একমত হওয়া অসম্ভব

এ সকল কারণে আমরা শাখাগত মাসআলায় সকলের একমত হওয়াকে অসম্ভব বিষয় মনে করি; বরং এটা দ্বীনের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আল্লাহ তো চান এই দ্বীন চিরজীবী হবে এবং সকল যুগ ও সময়ের চাহিদা পূরণ করবে। এজন্যই এ দ্বীন সহজ ও স্বাভাবিক। এতে নেই কোনো স্থবিরতা ও কঠোরতা।

'ভিন্নমত পোষণকারী ভাইদের প্রতি

উপরে যা বলা হল এটিই আমাদের বিশ্বাস। তাই কিছু শাখাগত বিষয়ে যাদের সাথে আমাদের মতভিন্নতা রয়েছে, তাদের কাছে ওজর পেশ করছি। আমরা মনে করি, এ মতভিন্নতা কখনোই আমাদের পরস্পর প্রীতি ও সম্প্রীতি এবং পরস্পর সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। ইসলামের সর্বোত্তম সীমারেখা ও প্রশস্ততম আদর্শ আমাদেরকে একসূত্রে গ্রথিত রাখবে। আমরা উভয়েই কি মুসলিম নই? উভয়েই কি পছন্দ করি না ঐ রায় ও সিদ্ধান্তের অনুসরণ, যার প্রতি আমাদের মন আশ্বস্ত হয়? আমরা উভয়েই কি অপরের জন্য তা-ই পছন্দ করতে দায়বদ্ধ নই, যা নিজের জন্য পছন্দ করি? তাহলে আর মতবিরোধ থাকল কোথায়?

কেন প্রত্যেকের রায় ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রত্যেকের চিন্তা-ভাবনার সুযোগ থাকবে না? আর পরস্পর মত বিনিময়ের প্রয়োজন হলে কেন তা হবে না প্রীতি ও বন্ধুত্বের আবহে?

আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণও তো দ্বীনী বিষয়ে পরস্পর ভিন্ন মত পোষণ করতেন, কিন্তু তা কি তাদেরকে একে অপরের প্রতি বিরূপ করেছে? তাদের সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন করেছে? তাদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে? করেনি। বনী কুরাইজায় আসরের নামাযের ঘটনা তো সবারই জানা আছে। তো সাহাবীগণ নবী-যুগের সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং হুকুম-আহকামের আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়ার পরও যখন তাদের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে তাহলে আমরা কেন একে অপরের প্রাণনাশে

উদ্যত হচ্ছি সামান্য মতভিন্নতার কারণে? তেমনি বড় বড় ইমামগণ যখন কুরআন-সুন্নাহর বিষয়ে অধিক জ্ঞানী হওয়ার পরও তাদের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে এবং তারা পরস্পর তর্কবিতর্ক করেছেন তাহলে তাদের জন্য যা অনুমোদিত ছিল আমাদের জন্য কেন থাকবে না? আর দ্বীনের বড় বড় জানা বিষয়ে যখন মতপার্থক্য হয়েছে, যেমন আযান, যা দৈনিক পাঁচবার দেওয়া হয় এবং যে ব্যাপারে অনেক হাদীস ও আছার রয়েছে তখন দ্বীনের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম মাসআলায় কেন মতভিন্নতা দেখা দিবে না, যার সূত্র হচ্ছে রায় ও ইজতিহাদ?

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় আছে। তা হল, পূর্বে মুসলমানরা কোনো বিষয়ে মতভেদ করলে তা খলীফা বা তার প্রতিনিধির নিকট পেশ করতেন। খলীফার ফয়সালার মাধ্যমে ইখতিলাফ দূর হয়ে যেত। কিন্তু এখন খলীফা কোথায়?

এ অবস্থায় মুসলমানদের কর্তব্য, একজন কাজী খোঁজ করা এবং তাঁর কাছে তাদের সমস্যা পেশ করা। নতুবা কোনো কেন্দ্র ছাড়া মতভেদ তো শুধু নতুন মতভেদই জন্ম দিবে।

আলইখওয়ানুল মুসলিমূনের কর্মীগণ এ সকল বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত। এ কারণে তারা ভিন্নমত পোষণকারীদের প্রতি প্রশস্ততম হৃদয়ের অধিকারী। তারা মনে করেন, প্রত্যেকের সাথে ইলম আছে এবং সকল দাওয়াতের মধ্যেই হক বাতিল দুটোই আছে। সুতরাং তারা হকের তালাশ করেন এবং তা গ্রহণ করেন। আর কোমলতা ও কল্যাণকামিতার সাথে ভিন্নতমত পোষণকারীকে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝানোর চেষ্টা করেন। তারা সন্তুষ্ট হলে ভালো অন্যথায় তারা আমাদের মুসলিম ভাই। আমরা তাদের ও আমাদের জন্য হেদায়েত ও মঙ্গলের প্রার্থনা করি।

'অন্যায়কে প্রতিরোধ করুন

আলইলইখওয়ানুল মুসলিমুন জানে, এখন এমন কিছু সামাজিক বিষয় আছে, যা এই দ্বীনের অস্তিত্বের পক্ষে সবচেয়ে বড় হুমকি। হায়! মুসলিম দায়ীগণের মনোযোগ যদি ঐক্যবদ্ধ হত জনসাধারণকে এই হুমকির মোকাবেলায় সচেতন করার বিষয়ে, যা দ্বীনের মূলে আঘাত হানছে এবং যা প্রতিরোধযোগ্য হওয়ার বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই।

এই হচ্ছে দ্বীনের ফুরূয়ী বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারীদের সম্পর্কে আলইখওয়ানুল মুসলিমূনের নীতি। সংক্ষেপে বললে বলা যায়, আলইখওয়ান মতপার্থক্যের অবকাশে বিশ্বাসী। তবে কোনো মতের বিষয়ে আসাবিয়ত পোষণের বিরোধী। সে হক ও সত্যে উপনীত হতে চায় এবং এ

বিষয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে প্রীতি ও নম্রতার কোমলতম উপায়ে।'-মাজমূআতু রাসাইলিল ইমামিশ শহীদ হাসান আলবান্না, পৃষ্ঠা : ১১২-১১৬

৩. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছালিহ আলউছাইমীন (১৪২১ হি.)

তিনি এ বিষয়ে অনেক বলেছেন এবং অনেক লিখেছেন। আমরা এখানে তার কয়েকটি কথা নকল করছি :

ক) "এ যুগের কিছু কিছু সালাফী, বিরোধীদেরকে গোমরাহ বলে থাকে, তারা হকপন্থী হলেও। আর কিছু কিছু লোক তো একে বিভিন্ন 'ইসলামী' দলের মত একটি দলীয় মতবাদে পরিণত করেছে। এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, অবশ্যই এর প্রতিবাদ করতে হবে। তাদেরকে বলতে হবে, সালাফে সালেহীনের কর্মপদ্ধতি লক্ষ করুন, ইজতিহাদগত মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে তাদের নীতি কী ছিল এবং তাঁরা কেমন উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের মাঝে তো বড় বড় বিষয়েও মতভেদ হয়েছে, জ্ঞানগত ও বিশ্বাসগত বিষয়ে মতভেদ হয়েছে : দেখুন, আল্লাহর রাসূল তাঁর রবকে দেখেছেন কিনা-এ বিষয়ে কেউ বললেন, দেখেননি; কেউ বললেন, দেখেছেন। কেয়ামতের দিন আমল কীভাবে ওজন করা হবে-এ বিষয়ে কেউ বলেছেন, আমল ওজন করা হবে। কেউ বলেছেন, আমলনামা ওজন করা হবে। তেমনি ফিকহের মাসাইল- নিকাহ, ফারাইয, ইদ্দত, বুয়ূ (বেচাকেনা) ইত্যাদি বিষয়েও তাঁদের মাঝে মতভেদ হয়েছে, কিন্তু তাঁরা তো একে অপরকে গোমরাহ বলেননি।

'সুতরাং যাদের বিশ্বাস, 'সালাফী' একটি সম্প্রদায়, যার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে, অন্যরা সবাই গোমরাহ, প্রকৃত সালাফী আদর্শের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। সালাফী মতাদর্শের অর্থ হচ্ছে, আকিদা-বিশ্বাস, আচরণ- উচ্চারণ, মতৈক্য-মতানৈক্য এবং পরস্পর সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের পথে চলা। যেমনটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; প্রীতি, করুণা ও পরস্পরের প্রতি অনুরাগে মুমিনগণ যেন একটি দেহ, যার এক অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় আর্তনাদ করতে থাকে। এটিই হচ্ছে প্রকৃত সালাফী মতাদর্শ।' [লিকাআতুল বাবিল মাফতূহ, প্রশ্ন : ১৩২২]

খ) জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় ২১/১২/১৪১১ হিজরী তারিখে একটি মুহাযারা (বক্তৃতা) পেশ করেছিলেন। তাতে তিনি বিশেষভাবে বলেছেন-

سب العالم سبب لانتهاك السنة النبوية وسبب لانتهاك العلم الشرعي.

'আলিমকে কটূক্তি করা সুন্নাহর অমর্যাদা ও শরয়ী ইলমের অমর্যাদার কারণ হয়ে থাকে।'

গ. 'যখন আলিমদের দিক দুর্বল হয় তখন সাধারণ মানুষের কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণও দুর্বল হয়ে যায়।'

ঘ. 'যারা আলিমদের অমর্যাদায় লিপ্ত বাস্তবে তারা সুন্নাহর আবরণ ছিন্ন করার কাজে লিপ্ত।'

ঙ. 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মন ও মুখকে সুস্থ ও সংযত রাখা।'

চ. 'আলিম ও দায়ীগণের নিন্দা-সমালোচনাকারী' উম্মতকে আলিম ও দায়ীদের প্রতি বিরূপ করে থাকে। উম্মত আলিম ও দায়ীদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। তখন দ্বীন-শরীয়তের প্রতিও তাদের আস্থা থাকে না।

'সমালোচিতদের প্রতি আস্থা নষ্ট হওয়ার পর সমালোচনাকারীদের প্রতিও লোকের আস্থা থাকে না। আর এতে আনন্দিত হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী (ইসলামের দুশমনেরা)'।–আদদাওয়াতু ইলাল জামাআতি ওয়াল ইতিলাফ পৃ. ১০১

৪. ড. নাসির ইবনে আবদুল কারীম আলআকল

তিনি **'আলইফতিরাক : মাফহূমুহু, আসবাবুহূ, সুবুলুল বিকায়াতি মিনহু'** নামে একটি সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পুস্তিকা লিখেছেন। তাতে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, জেনে বুঝে সচেতনতার সাথে ইমামগণের অনুসরণ করা হলে একেও তাকলীদ নামে আখ্যায়িত করা হয়! বলা হয়, মাশাইখের অনুসরণ হচ্ছে তাকলীদ আর তা নাজায়েয! আমাদের কাছে কিতাব আছে, জ্ঞানের বিভিন্ন মাধ্যম আছে, এখন কেন আলিমদের কাছে যেতে হবে? এই ভুল চিন্তা খণ্ডন করে তিনি বলেন, ইমাম, মাশাইখ ও আলিমগণের অনুসরণ করা ওয়াজিব ...।

'শরীয়তের দৃষ্টিতে (আহলে ইলমের) ইত্তিবা ও অনুসরণ অপরিহার্য। কারণ আম মুসলিম জনসাধারণ; বরং ইলম চর্চায় নিয়োজিত অনেকেই ইজতিহাদ তথা সঠিক পন্থায় দলীল-প্রমাণ গ্রহণে ও বিশ্লেষণে পারদর্শী নয়। তো এরা কাদের নিকট থেকে ইলম হাসিল করবে? এবং কোন উপায়ে ইলম অর্জনের পদ্ধতি, সুন্নাহর নিয়ম এবং সালাফে সালেহীন ও ইমামগণের নীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে? এ তো আহলে ইলমের অনুসরণ ছাড়া

সম্ভব নয়। একে (নিন্দিত ও বর্জনীয়) তাকলীদ বলে না। নতুবা প্রত্যেকেই নিজের ইমাম হবে এবং যত ব্যক্তি তত দলের উদ্ভব ঘটবে। এটা নিঃসন্দেহে ভুল। সুতরাং সঠিক পন্থায় ইমামদের অনুসরণ (নিন্দিত) তাকলীদ নয়। নিন্দিত তাকলীদ হচ্ছে অন্ধ অনুসরণ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, (তরজমা) 'যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।'

'উলামা মাশায়েখ ও দ্বীনদার মুবাল্লিগদের থেকে বিমুখ হয়ে শুধু বইপত্রের মাধ্যমে ইলম অর্জনের চেষ্টা করা এবং মনে করা যে, এখন বইপত্র আছে, ক্যাসেট আছে, প্রচারমাধ্যম আছে, ইলম অর্জনের জন্য এগুলোই যথেষ্ট, এটা ইলম অন্বেষণের একটা মারাত্মক ভুল পদ্ধতি।'

তিনি আরো বলেন, 'বিভেদের আরেকটি কারণ 'ফিকহুল খিলাফ' তথা মতপার্থক্যের প্রকার, বিধান ও নীতিমালা সম্পর্কে এবং ফিকহুল জামাআতি ওয়াল ইজতিমা তথা ঐক্য ও মতৈক্যের নীতি ও বিধান সম্পর্কে নির্ভুল ও সঠিক উপলব্ধির অভাব। কোন মতপার্থক্য বৈধ, কোন মতপার্থক্য বৈধ নয় অপর পক্ষকে কোন ক্ষেত্রে মাযূর মনে করা হবে, কোন ক্ষেত্রে মনে করা হবে না, তেমনি জামাআ ও ইজতিমার অর্থ কী, বিভেদ-অনৈক্যের ক্ষতি ও অনিষ্ট কী–এসব বিষয় সঠিকভাবে বোঝা উচিত ...।

আমার সামনে এ কিতাবের ইন্টারনেট সংস্করণ রয়েছে।

৫. আরবের কয়েকজন শায়খ

শায়খ ইবনে বায, শায়খ ইবনে উছাইমীন ও শায়খ আলবানী রাহ.-এর মাঝে মতভেদপূর্ণ বিষয়ে 'আলইজায' নামে দুই খণ্ডে যে কিতাব আরব থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার উপর সেখানের বড় বড় শায়খ ভূমিকা লিখেছেন। সবাই বলেছেন, ফুরূয়ী ইখতিলাফ বা শাখাগত বিষয়ে যে মতপার্থক্য তা সহনীয়। এর ভিত্তিতে কলহ-বিবাদে লিপ্ত হওয়া জায়েয নয়। এ ধরনের মতপার্থক্যের পরও ঐক্য ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। ভূমিকা যারা লিখেছেন তারা হলেন–

১. ড. আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আলজিবরীন

২. ড. সালমান বিন ফাহদ আলআউদাহ

৩. শায়খ আবদুল আযীয বিন ইবরাহীম বিন কাসিম

৪. শায়খ আবুল হাসান মুসতফা আসসুলায়মানী

৫. শায়খ আবদুল্লাহ বিন মানি আররুকী।

৬. শায়খ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ছালিহ আলমু'তায

তিনি 'আদদাওয়াতু ইলাল জামাআতি ওয়াল ইতিলাফ ওয়ান নাহয়ু আনিত তাফাররুকি ওয়াল ইখতিলাফ' নামে একটি ছোট পুস্তিকা লিখেছেন। তাতে ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্বেষ-অনৈক্য পরিহারের আহ্বান জানানো হয়েছে।

এ কিতাবে শায়খ ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আলফাওযানের অভিমতও রয়েছে। পুস্তিকাটিতে অনেক উদ্ধৃতি ও দলিলের সাথে বারবার বলা হয়েছে যে, ফুরূয়ী মাসআলায় মতভেদের পরও আমাদেরকে ঐক্য ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। সকল মতভেদ কিন্তু বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকে অপরিহার্য করে না। কোনো মতপার্থক্যের বিষয়ে যদি সংশয় হয় যে, তা সহনীয় কি না তাহলে এর সমাধান বড় বড় আলিমরা করবেন।

যাই হোক, এ তালিকা অনেক দীর্ঘ। সকল মুসলিম দেশের সংবেদনশীল উলামা-মাশাইখ তালিবানে ইলমকে এবং আম মুসলমান ও শিক্ষিত শ্রেণীকে এ উপদেশই করে থাকেন। আমি এ বিষয়ে শুধু দুটি কিতাবের নাম উল্লেখ করে বর্তমান সময়ের বিখ্যাত পর্যটক আলিম উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী তকী উছমানী দামাত বারাকাতুহুমের দুটি কথা নকল করে এ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করব।

কিতাব দুটি এই –১. লা ইনকারা ফী মাসাইলিল ইজতিহাদ, ড. কুতব মুসতফা ছানূ। উস্তায, উসূলুল ফিকহ, জামেয়া ইসলামিয়া মালয়েশিয়া। সদস্য, ফিকহ একাডেমী জিদ্দা।

২. ইখতিলাফুল মুফতীন ওয়াল মাওকিফুল মাতলূবু তুজাহাহু মিন উমূমিল মুসলিমীন, ড. আশশরীফ হাতিম আল আউনী, মক্কা মুকাররমা।

৭. মাওলানা মুহাম্মাদ তকী উছমানী দামাত বারাকাতুহুম

হযরত তার সফরনামা 'সফর দর সফর' এ কিরগিজিস্তানের বিবরণে লেখেন, 'বহু মাসআলায় তাদের মাঝে একরোখা নীতি তৈরী হল। সাধারণ সাধারণ মাসআলায়ও বিরোধ ছিল চরমে। পাশাপাশি এ রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন মতাদর্শের লোক এখানে যেভাবে নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করতে শুরু করে তা এই বিরোধকে আরো উসকে দিল।

'এখন সেখানকার পরিস্থিতি কতকটা এমন যে, একদিকে সাধারণ মুসলমান সোভিয়েত ইউনিয়নের চলমান মতবাদ ও কৃষ্টি-কালচারে প্রভাবিত হয়ে দ্বীনের প্রাথমিক বিষয়গুলো সম্পর্কেও অজ্ঞ এবং পশ্চিমা সংস্কৃতিতে মেতে ইসলামের বিধিনিষেধ থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন; রাস্তাঘাটে চলাচলকারী নারীদের পোশাক থেকে বোঝার উপায় নেই যে, ইসলামী

জীবনধারার সাথে তাদের ন্যূনতম যোগাযোগ আছে। অপর দিকে ধর্মীয় অভিভাবকদের মাঝে দ্বিতীয় জামাত করা, জুমার সাথে সতর্কতামূলক যোহর আদায় করা আর সালাফী বন্ধুদের উপস্থিতির সুবাদে 'আরশে সমাসীন হওয়া'র মত জটিল জটিল মাসআলা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

'এই প্রেক্ষিতে আমার সফর উপলক্ষে উলামায়ে কেরাম, আইম্মায়ে মাসাজিদ ও ধর্মীয় ব্যক্তিগণকে দাওয়াত করে দু'টি বড় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

'প্রথমটি ছিল সকাল নয়টায়। সেখানে অধম প্রায় দেড় ঘন্টা আরবীতে আলোচনা করি। শ্রোতাদের উল্লেখযোগ্য অংশ আরবী বোঝেন। তবে এক বড় অংশের আরবী বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই মাদরাসা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.- এর উস্তায মাওলানা মাকসাদ সাহেব কিরগিযী ভাষায় বয়ানের অনুবাদ করেন।

'আলোচনার মূল বিষয় ছিল কিরগিযিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্বীনী মেহনতকে কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় এবং এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনী ব্যক্তিবর্গের করণীয় কী হওয়া উচিৎ। এ প্রসঙ্গে শ্রোতাদের কাছে সবিনয় নিবেদন করি যে, 'শাখাগত মাসআলায় ইখতিলাফ থেকে আপনাদের মনোযোগ ফিরিয়ে নিন। আপনারা নজর দিন উম্মাহর মৌলিক ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলোর শিক্ষা ও প্রচার প্রসারে, অধিকাংশ জনসাধারণ যে সম্পর্কে বেখবর ও অজ্ঞ।'

'আল্লাহ তাআলার ফযল ও করমে এ আলোচনা তাদের মাঝে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। একজন শ্রোতা বললেন, আজকের সম্মেলনকে সামনে রেখে আামি চল্লিশটি প্রশ্ন লিখে এনেছিলাম। আপনার আলোচনায় তার অনেকগুলোর সমাধান পেয়েছি। অবশিষ্ট প্রশ্নগুলো আপনাকে করতে চাচ্ছি। ফলে আরো আধা ঘন্টা প্রশ্নোত্তরপর্ব চলল। বাকি প্রশ্নগুলো এশার পর উলামায়ে কেরামের দ্বিতীয় মজলিসের জন্য থাকল। সেখানেও বেশ সময় প্রশ্নোত্তরপর্ব চলল।

'আলহামদু লিল্লাহ এ সম্মেলন শ্রোতাদের একথার উপর শেষ হয়েছে যে, আল্লাহর রহমতে কিছু ইখতিলাফ তো মিটে গেছে। বাকিগুলোর ব্যাপারে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এগুলোকে আলোচনার বিষয় বানাব না। বরং এখন আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা হবে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর দাওয়াত ও তালীমে মনোযোগ দেওয়া। (পৃ : ১৩৬-১৩৮)

রাশিয়ার সফরের বিবরণে লেখেন–

'দুঃখজনক এক সংবাদ শুনতে পাই। রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু তরুণ আরব ভার্সিটি থেকে কম বেশি পড়াশোনা করে এসেছে। তারা কট্টর সালাফী হয়ে দেশে ফিরেছে। যেহেতু দাগিস্তানের অধিকাংশ আলিম শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। তাঁদের মাঝে দীর্ঘকাল থেকে তাসাওউফের সিলসিলা অব্যাহতভাবে চলে আসছে আর শাফেয়ী মাযহাবের (পরবর্তী কিছু আলিমের মধ্যে কোন কোন) বিদআতের ব্যাপারে কিছু ছাড় আছে–এ কারণে ঐসব তরুণ এখানে এসে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর তাকলীদ এবং তাসাওউফের বিরুদ্ধে তারা কঠোরভাবে বিরোধিতা শুরু করেছে। কেউ কেউ তো এখানকার প্রবীণ আলেমদের মুশরিক পর্যন্ত বলেছে। এর ভিত্তিতে এখানকার মুসলমানদের মাঝে অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে।

'এ প্রেক্ষাপটে আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল, কমিউনিজমের আধিপত্য ও নির্যাতন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর রাশিয়ার মুসলমানদের কর্মপদ্ধতি কী হওয়া উচিৎ। এপ্রসঙ্গে আমি বললাম যে, আজ রাশিয়ার মুসলমানদের মাঝে যদি ইসলাম ও ইসলামী জীবনপদ্ধতির কোন চিহ্ন বাকি থেকে থাকে তা কেবল প্রবীণ উলামায়ে কেরামের মেহনতের ফসল। যারা কমিউনিস্ট শাসনের অন্ধকার রাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইলমে দ্বীনের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন এবং যারা জীবন ও জীবিকার সকল সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আহার ত্যাগ করে ভবিষ্যত প্রজন্মের দ্বীন ও ঈমানের হেফাযত করেছেন। তাই আজকের তরুণসমাজের কর্তব্য, ঐসকল মহীরূহ উলামায়ে দ্বীনের যথার্থ মূল্যায়ন ও সম্মান করা। পাশাপাশি এটা কখনো ভোলা উচিৎ নয় যে, শাখাগত মাসআলায় ইখতেলাফ সব যুগেই ছিল। এ ইখতিলাফকে কেন্দ্র করে একপক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে কাফের মুশরিক বলে ফতোয়া দেওয়া হলে এতে কেবল ইসলামের শত্রুরাই লাভবান হবে। আজ তো রাশিয়ার অবস্থা এই যে, ইসলাম ও ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে দমনপীড়নের কারণে সাধারণ মুসলমানদের কাছে দ্বীনের মৌলিক শিক্ষাই অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে তাদের কাছে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান পৌঁছানো অবশ্যকর্তব্য। মুসলমানদের এমন অসহায় পরিস্থিতিতে 'আরশে সমাসীন হওয়া', 'তাকলীদ চলবে, না গাইরে তাকলীদ'–এ জাতীয় মাসআলায় ইখতিলাফ করা হলে দ্বীনের ক্ষতিসাধনে এর চেয়ে বড় কোনো ফেতনা আর হতে পারে না। তাই সাধারণ মুসলমানের কর্তব্য এটাই যে, তারা প্রবীণ আলেমদের সাথে জুড়ে থাকবেন। কোনো বিষয়ে সন্দেহ হলে আপোসে সমাধা করে নেবেন। কলহ ও কোন্দলের দিকে যাবেন না।

আলহামদুলিল্লাহ, শ্রোতাগণ যথেষ্ট মনোযোগের সাথে নির্দেশনাগুলো গ্রহণ করেছেন। পরে শুনেছি, তরুণদের মাঝেও এর ভালো প্রভাব পড়েছে। উলামায়ে কেরাম এই বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে, আলহামদুলিল্লাহ, আলোচনা খুবই সময়োপযোগী ও ফলদায়ক হয়েছে।' (পৃ :১৭৯-১৮০)

আমি নিবেদন করছিলাম যে, বর্তমান সময়ে এটি গোটা মুসলিম জাহানের সমস্যা। এজন্য বিষয়টির সংশোধন অতি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। তবে এর জন্য শর্ত হচ্ছে ইখলাস ও হিম্মত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের পদ্ধতিতে সুন্নাহর বিভিন্নতা বা সুন্নাহ অনুধাবন কেন্দ্রিক মতপার্থক্য

নামায ঐক্যের চিহ্ন, একে বিবাদের কারণ বানাবেন না

নামাযের পদ্ধতিতে সুন্নাহর বিভিন্নতা বা সুন্নাহ অনুধাবন কেন্দ্রিক মতপার্থক্য

নামায ঐক্যের চিহ্ন, একে বিবাদের কারণ বানাবেন না

অনুমোদিত মতপার্থক্যের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গন প্রতিদিনের ফরয নামায। নামায ঈমানের মানদণ্ড ও ইসলামের নিদর্শন। কালিমার পর মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় চিহ্ন। ধীরস্থিরভাবে খুশূ-খুযুর সাথে সুন্নত মোতাবেক তা আদায় করা শাহাদাতের পর সবচেয়ে বড় ফরয।

নামায আদায়ের পদ্ধতিতে অনেক মাসআলা এমন আছে, যাতে সাহাবা-যুগ থেকে মতভেদ ও বিভিন্নতা চলে আসছে। কিন্তু এ কারণে খায়রুল কুরূন তথা সাহাবা-তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের যুগে কখনো কলহ-বিবাদ হয়নি। পরবর্তী যুগে যখনই কোনো মাযহাবী আসাবিয়ত মাথাচাড়া দিয়েছে তখন এই মাসআলাগুলোকে কলহ-বিবাদের কারণ বানানো হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের এই যুগ একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ। তবে পার্থক্য শুধু এই যে, এখন তা হচ্ছে মাযহাবী আসাবিয়তের কারণে নয়, হাদীস মোতাবেক আমল ও দলিল অনুসরণের নামে।

সালাত আদায়ের পদ্ধতি যদি শুধু শায়খ আলবানী রাহ.-এর কিতাবের চিন্তা ও রুচির ভিত্তিতে পাঠ না করে কিছুটা প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হাদীস ও ফিকহ এবং সালাফের কর্ম ও সিদ্ধান্তের মূল উৎস থেকে পাঠ করা হত, সালাতের প্রায়োগিক রূপ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে কীভাবে পৌঁছল সে ইতিহাস যদি স্মরণ রাখা হত, সালাত-পদ্ধতিকে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তাআলা ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ এবং এ দু' শাস্ত্রের ইমামদের থেকে কী কী খিদমত নিয়েছেন, উম্মতের উপর তাদের কী কী অনুগ্রহ আছে–এই সকল বিষয় সামনে রাখা হত, দলিল ও দলিল দ্বারা দাবি প্রমাণের বিষয়ে উসূলে ফিকহের স্বীকৃত নিয়মকানুন স্মরণ রাখা হত এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে সঠিক কর্মকৌশল ও সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা হত তাহলে কোনো পক্ষের আলিমদের মাঝে অন্যায় প্রান্তিকতাও দেখা দিত না, তেমনি তাদের কাছ থেকে সাধারণ শিক্ষিত ভাইয়েরা বা আম

জনসাধারণ এমন কোনো কথাও পেত না, যা তারা নামাযকে কেন্দ্র করে জেনে বা না জেনে কলহ-বিবাদ উসকে দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে।

নামায আদায়ের পন্থা সম্পর্কে যে মৌলিক বিষয়গুলোর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা এখানে পেশ করা মুনাসিব মনে হচ্ছে। একসময় এ ধরনের প্রান্তিকতা থেকে আত্মরক্ষার্থে চিন্তা-ভাবনার আহ্বান জানিয়ে এ কথাগুলো লেখা হয়েছিল। এতে যদিও বিষয়ের কিছু পুনরুক্তি থাকবে, কিন্তু ইনশাআল্লাহ তা অতিরিক্ত ফায়েদা থেকে খালি হবে না।

নামাযের বিধান যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে এসেছে, তার নিয়ম-পদ্ধতিও তিনিই উম্মতকে শিখিয়েছেন। দ্বীন ও শরীয়তের ইলম অর্জনের তিনিই একমাত্র সূত্র। .

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নামাযের পদ্ধতি সর্বপ্রথম শিখেছেন সাহাবায়ে কেরাম। নবীজী তাদেরকে মৌখিকভাবেও শিখিয়েছেন এবং তাদেরকে নিয়ে নিয়মিত নামায আদায় করেছেন। তাঁর ইরশাদ—

صلوا كما رأيتموني أصلي অর্থাৎ 'তোমরা সেভাবেই নামায আদায় কর যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ।'

এরপর সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবেয়ীন, তাবেয়ীন থেকে তাবে তাবেয়ীন, এভাবে প্রত্যেক প্রজন্ম তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

দুই.

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক সাহাবী তাঁর সঙ্গে মদীনাতেই অবস্থান করতেন। কিছু সাহাবী নিজ অঞ্চলে ইসলাম গ্রহণের পর এক দুই বার মদীনায় নবীজীর সাহচর্যে এসেছেন এবং কিছুদিন অবস্থান করে আবার নিজ এলাকায় ফিরে গিয়েছেন। বলাবাহুল্য, এই আগন্তুক সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল অধিক সময় প্রত্যক্ষ করার এবং সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাননি। তেমনি দ্বীনের বহু বিষয়ের; বরং অধিকাংশ বিষয়ের জ্ঞান সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে লাভ করেননি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় শরীয়তের বিধি-বিধান মানসূখ বা রহিত হওয়ার ধারাও অব্যাহত ছিল। এজন্য এমন হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, এই সাহাবীরা কোনো বিধান বা পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, পরে তা মানসূখ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাদের পক্ষে তা জানার সুযোগ হয়নি। অথচ মদীনার সাহাবীরা খুব সহজেই তা অবগত হয়ে যেতেন।

মদীনার সাহাবীরাও সবাই নবীজীর সমান সাহচর্য পেয়েছেন—এমন নয়। কিছু সাহাবী সার্বক্ষণিক সাহচর্য লাভ করেছেন। তাঁরা খুব কমই অনুপস্থিত থাকতেন। এঁদের মধ্যে প্রবীণ সাহাবীগণ, যাঁদেরকে 'সাবিকীনে আওয়ালীন' ও বদরী মুজাহিদীনের মধ্যে গণ্য করা হয় তাঁরা ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবিশেষ আস্থার পাত্র। সাধারণত তাঁরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে প্রথম কাতারে নামায আদায় করতেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ ছিল— ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী তারা আমার নিকটে দাঁড়াবে।' এ নির্দেশ অনুযায়ী এঁরা নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে দাঁড়াতেন।

বলাবাহুল্য, এই সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায ও তাঁর দিনরাতের আমল প্রত্যক্ষ করার যতটা সুযোগ পেয়েছেন তা অন্যরা পাননি। আর তাঁরা যেমন সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে বিষয়গুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হতেন অন্যদের জন্য তা এত সহজ ছিল না।

এই বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আরো অনেকে শামিল ছিলেন। এখানে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সফরে-হযরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম ছিলেন। হাদীস ও তারীখে তাঁর উপাধী 'ছাহিবুল না'লাইন ওয়াল বিসাদ ওয়াল মিতহারা' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাদুকা, তাকিয়া ও অযুর পাত্র-বহনকারী। (সহীহ বুখারী হাদীস ৩৯৬১)

হযরত আবু মূসা আশআরী রা. বলেন, আমরা বহু দিন পর্যন্ত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও তার মাতাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'আহলে বাইত' (পরিবারের সদস্য) মনে করতাম। কেননা নবীজীর গৃহে তাদের আসা-যাওয়া ছিল খুব বেশি। (সহীহ বুখারী হাদীস ৩৭৬৯, ৪৩৮৪)

তিন.

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর যখন ইসলামী খেলাফতের পরিধি বিস্তৃত হতে লাগল তখন সাহাবায়ে কেরাম দ্বীন ও ঈমানের তালীমের জন্য দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লেন। খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ফারূক রা. বড় বড় সাহাবীকে সাধারণত মদীনার বাইরে যেতে

দিতেন না। তবে কাদেসিয়্যা (ইরাক) জয়ের পর কুফা নগরীর গোড়াপত্তন হলে সে অঞ্চলে দ্বীন ও শরীয়ত এবং কুরআন ও সুন্নাহর তা'লীমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে পাঠালেন। তিনি কূফাবাসীকে পত্র লিখলেন যে, আমি আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে (রা.) তোমাদের আমীর হিসেবে এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা.) উযীর ও মুয়াল্লিম হিসেবে প্রেরণ করছি। এঁরা দুজনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনীষী সাহাবীদের অন্যতম এবং বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। তোমরা তাদের নিকট থেকে দ্বীন শিখবে এবং তাদের অনুসরণ করবে। মনে রাখবে, আবদুল্লাহকে আমার নিজের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমি তোমাদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য তাকে পছন্দ করেছি। (আততবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৬/৩৬৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১/৪৮৬)

এই দুই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কুফাতেই আরো পনেরো শ' সাহাবী অবস্থান করছিলেন। যাঁদের মধ্যে সত্তর জন ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা., সায়ীদ ইবনে যায়েদ রা., হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা., সালমান ফারেসী রা., আবু মূসা আশআরী রা., প্রমুখ বিখ্যাত সাহাবী সবাই কূফাতেই ছিলেন। হাদীস ও তারীখের ইমাম আবুল হাসান ইজলী রাহ. 'তারীখ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, কুফাতে দেড় হাজার সাহাবী এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।–কিতাবুছ ছিকাত, আবুল হাসান আলইজলী (১৮০-২৬১ হি.) খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৪৮; ফতহুল কাদীর ইবনুল হুমাম, ১/৯১

খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রা. তো একে তাঁর দারুল খিলাফা বানিয়েছিলেন।

কূফায় অবস্থানকারী সাহাবীদের নিকট থেকে কূফার অধিবাসীরা দ্বীন ও ঈমান গ্রহণ করেছেন। কুরআন ও হাদীসের ইলম অর্জন করেছেন। নামায, রোযা, হজ্ব-যাকাত ইত্যাদি সকল ইবাদতের নিয়ম-কানূন শিখেছেন। কূফার অধিবাসীরা হজ্ব-ওমরা ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা-মদীনায় যেতেন এবং সেখানকার সাহাবীদের নিকট থেকেও ইলম হাসিল করতেন। লক্ষ করার বিষয় এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও অন্যান্য সাহাবী যেভাবে কূফাবাসীকে নামায পড়তে শিখিয়েছেন তাঁরা মক্কা-মদীনায় গিয়েও সেভাবেই নামায পড়তেন, কিন্তু খলীফা হযরত উমর ফারুক রা. থেকে নিয়ে হারামাইনের কোনো সাহাবী বা কোনো তাবেয়ী তাদের নামাযকে খেলাফে সুন্নত বলেছেন–এমন কোনো দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে

বলে আমার জানা নেই। অথচ নামাযের যে পদ্ধতি কূফাবাসী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে ও ইরাকের অধিবাসী অন্যান্য সাহাবীর নিকট থেকে শিখেছেন তা যে কোনো কোনো মাসআলায় হারামাইনে অবস্থানকারী সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা থেকে ভিন্ন ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই কূফানগরীতে ৮০ হিজরীতে ইমাম আবু হানীফা রাহ. জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। সে সময় ইসলামী বিশ্বে অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন। কূফাতেও কয়েকজন সাহাবী ছিলেন। আর ইমাম ছাহেব যে একাধিক সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন এবং তাদের থেকে রেওয়ায়েতের মর্যাদা লাভ করেছেন তা প্রমাণিত। এজন্য ইমাম ছাহেব তাবেয়ীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। এমন অনেক মনীষী এর স্বীকৃতি দিয়েছেন যাদের ফিকহী মাসলাক হানাফী নয়। কয়েক বছর আগে ড. মুহাম্মাদ আবদুশ শহীদ নুমানী দামাত বারাকাতুহুম (প্রফেসর শো'বায়ে আরবী, করাচি ইউনিভার্সিটি) রচিত 'ইমাম আবু হানীফা কী তাবেঈয়্যত আওর সাহাবা ছে উনকী রেওয়ায়াত' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ইমাম ছাহেব বিপুল সংখ্যক মনীষী তাবেয়ীর সাহচর্য পেয়েছিলেন যাঁরা অসংখ্য সাহাবী কিংবা তাদের সমসাময়িক প্রবীণ তাবেয়ীদের সাহচর্য পেয়েছিলেন। এজন্য 'আমলে মুতাওয়ারাছ' অর্থাৎ কর্মগত ধারায় চলে আসা নবী-নামাযকে যতটা কাছ থেকে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল তা হাদীস ও ফিকহের অন্য ইমামদের হয়নি। কেননা, তাঁরা সবাই ছিলেন তার পরের যুগের। (দ্রষ্টব্য : ইমাম ইবনু মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান, মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নু'মানী, পৃ. ৫০-৫৭ ও ৬৭-৭১; ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীছুহুম, যাহিদ কাওছারী পৃ. ৫১-৫৫; ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস, মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী পৃ. ৩৬-৪৩ ও ১১৬-১১৯; আততা'আমুল, হায়দার হাসান খান টুংকী)

মোটকথা, উত্তর প্রজন্ম পূর্ব প্রজন্ম থেকে নামায আদায়ের পদ্ধতি মূলত 'তা'আমুল' ও তাওয়ারুছের মাধ্যমেই গ্রহণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীগণকে শেখানোর সময় কখনও আল্লাহর রাসূলুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী কিংবা কর্ম উল্লেখ করতেন, কখনও তা উল্লেখ করতেন না। কিন্তু সর্বাবস্থায় ওই নামাযই শেখাতেন যা তাঁরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে শিখেছিলেন। কেউ তাদের সামনে নামাযে কোনো ভুল করেছে, সুন্নতের খেলাফ কোনো কাজ করেছে তারা তা সংশোধন করে দিতেন এবং প্রয়োজনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো হাদীস উল্লেখ করতেন।

যেহেতু নামাযের পদ্ধতি শুধু মৌখিক আলোচনার দ্বারা শেখার বিষয় নয়; দেখে শেখার বিষয়, এজন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তা'আমুলের' মাধ্যমে শেখানোর ওপরই জোর দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরামও এ পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন, তাদের পরে তাবেয়ীগণও। এজন্য আপনি দেখবেন, পূর্ণ নামাযের বিবরণ কোনো এক হাদীসে উল্লেখিত হয়নি; বরং দশ-বিশটি হাদীসেও নয়। হাদীসের দু' চারটি বা আট-দশটি কিতাব থেকেও যদি কিতাবুস সালাতের সকল হাদীস একত্র করা হয় তবুও দুই রাকাত নামাযের সকল মাসআলা এবং তার পূর্ণ কাঠামো পরিষ্কারভাবে সামনে আসবে না। এর কারণ তা-ই যা এখন বলললাম। অর্থাৎ তারা এই হাদীসগুলো নামায শেখানোর সময় প্রয়োজন অনুসারে উল্লেখ করতেন। রেওয়ায়েতের উদ্দেশ্যই এটা ছিল না যে, শুধু মৌখিক বর্ণনার দ্বারা গোটা নবী-নামাযের রূপরেখা একই মজলিসে বা এক আলোচনায় পেশ করা হবে।

সারকথা, নামাযের নিয়ম মূলত 'তাআমুল' ও 'তাওয়ারুছের' মাধ্যমে এসেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রসঙ্গে মৌখিক বর্ণনার ধারাও অব্যাহত ছিল।

চার.

যখন আল্লাহ তাআলার গাইবী ইশারায় দ্বীনের ইমামগণ উলূমে দ্বীনের উলূম সংকলনে মনোনিবেশ করলেন তখন আইম্মায়ে হাদীস দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের মতো নামায বিষয়ক সকল মৌখিক বর্ণনাও–নবীজীর বাণী হোক বা কর্ম, সনদসহ সংকলন করতে লাগলেন। প্রথমদিকে মরফূ হাদীসের সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের; বরং তাবেয়ীনের কর্ম ও সিদ্ধান্তও সংকলিত হয়েছে। কেননা, এগুলো প্রকৃতপক্ষে ওই আমলে মুতাওয়ারাছেরই মৌখিক বিবরণ বা তার ব্যাখ্যা ছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হল মরফূ রেওয়ায়েত সংকলনের দিকে।

ফকীহগণ নামায বিষয়ে মৌখিক বর্ণনা এবং সাহাবা-তাবেয়ীনের কর্মধারা দু'টোই সামনে রেখেছেন। এ দুয়ের আলোকে একদিকে তারা মাসনূন নামাযের (সুন্নাহসম্মত নামাযের) পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা পেশ করেছেন তেমনি নামায সংক্রান্ত সকল মাসায়েলের সমাধানও পেশ করেছেন। নামাযের এই পূর্ণাঙ্গ কাঠামো ও মাসাইল দু' ভাবে বিন্যস্ত হয়েছে : ১. দলীলের উল্লেখ ছাড়া। যেন পঠন-পাঠনে সুবিধা হয়। ২. দলীলের বিস্তারিত আলোচনাসহ, যেন নামাযের কাঠামো ও মাসায়েলের সূত্রও মানুষের কাছে সংরক্ষিত থাকে।

এভাবে মুসলিম উম্মাহ সংকলিত আকারে দুইটি নেয়ামত লাভ করেছে : ১. মাসায়েলের উৎস হাদীসসমূহ। ২. ওইসব হাদীস ও অন্যান্য শরয়ী দলীলের নির্যাসরূপে নামাযের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো, প্রত্যেক অংশের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সংশ্লিষ্ট মাসায়েল ইত্যাদি।

প্রথম নেয়ামত হাদীসের কিতাবসমূহে সংরক্ষিত হয়েছে আর দ্বিতীয় নেয়ামত সংরক্ষিত হয়েছে ফিকহ, তাফসীর ও হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা-গ্রন্থাদিতে।

পাঁচ.

প্রথম বিষয়ের কিছু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও সংকলকদের নাম উল্লেখ করা হল :

১. কিতাবুল আছার, ইমাম আবু হানীফা (৮০ হি.-১৫০ হি.)
২. আলমুয়াত্তা, ইমাম মালিক ইবনে আনাস (৯৪ হি.-১৭৯ হি.)
৩. 'আলমুসান্নাফ', আবদুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম (১২৬ হি.- ২১০ হি.) এগারো খণ্ডে।
৪. 'আলমুসান্নাফ', আবু বকর ইবনে আবী শায়বা (১৫৯ হি.- ২৩৫ হি.) ২৬ খণ্ডে।
৫. 'আলমুসনাদ', আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪ হি.-২৪১ হি.) ৫২ খণ্ডে।
৬. 'সহীহ বুখারী;, আবু আবদুল্লাহ বুখারী (১৯৪ হি. -২৫২ হি.)।
৭. 'সহীহ মুসলিম', মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২০৪ হি.-২৬১ হি.)।
৮. 'আসসুনান', আবু দাউদ সিজিস্তানী (২০২ হি.-২৭৫ হি.)।
৯. 'আলজামিউস সুনান', আবু ঈসা তিরমিযী (২১০ হি.-২৭৯ হি.)।
১০. 'আসসুনানুল কুবরা', নাসায়ী (২১৫ হি.-৩০৩ হি.)।
১১. 'সহীহ ইবনে খুযাইমা', আবু বকর ইবনে খুযায়মা (২২৩.-৩১০ হি.)।
১২. 'শরহু মাআনিল আছার', আবু জা'ফর তহাবী (২৩৯ হি.-৩২১ হি.)।
১৩. 'শরহু মুশকিলিল আছার', ঐ (২৩৯-৩২১ হি.) ১৬ খণ্ডে।
১৪. 'সহীহ ইবনে হিব্বান', আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (আনুমানিক ২৭১ হি.-৩৫৪ হি.) ১৬ খণ্ডে।
১৫. 'আলমু'জামুল কাবীর', ২৫ খণ্ডে।
১৬. 'আলমু'জামুল আওসাত, ১১ খণ্ডে।
১৭. 'আলমু'জামুস সগীর ১ খণ্ডে।
তিনটিই ইমাম তবারানী, আবুল কাসেম সুলায়মান ইবনে আহমদ (২৬০ হি.-৩৬০ হি.)-এর সংকলিত।
১৮. 'সুনানুদ দারাকুতনী', আলী ইবনে উমর দারাকুতনী (৩০৬-৩৮৫ হি.)

১৯. 'আলমুসতাদরাক আলাস সহীহাইন', হাকিম আবু আব্দিল্লাহ (৩২১ হি.-৪০৫ হি.)।
২০. 'আসসুনানুল কুবরা', আবু বকর বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি.) ১০ খন্ডে
২১. 'আততামহীদ', ইবনু আবদিল বার (৩৬৮ হি.-৪৬৩ হি.) ২৬ খণ্ডে।
২২. 'আলইস্তিযকার', ইবনু আবদিল বার (৩৬৮ হি.-৪৬৩ হি.) ৩০ খণ্ডে।

অন্য নেয়ামত অর্থাৎ ফিকহের প্রসিদ্ধ সংকলক হলেন :

১. ইমাম আবু হানীফা, নু'মান ইবনে ছাবিত আলকূফী (৮০ হি.-১৫০ হি.)। অর্থাৎ ইমাম বুখারীর জন্মগ্রহণেরও চুয়াল্লিশ বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শাগরিদ দু'জন : ইমাম আবু ইউসুফ (১১৩ হি.-১৮২ হি.) এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশায়বানী (১৩২-১৮৯ হি.) ইমাম আবু হানীফা রাহ. ও তাঁর শাগরিদের সংকলিত ফিকহ 'আলফিকহুল হানাফী' নামে পরিচিত।

২. ইমাম মালিক ইবনে আনাস আলমাদানী (৯৪ হি.-১৭৯ হি.)। তাঁর সংকলিত ফিকহ 'আলফিকহুল মালিকী' নামে পরিচিত।

৩. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশশাফেয়ী (১৫০ হি.-২০২ হি.)। তাঁর সংকলিত ফিকহ 'আলফিকহুশ শাফেয়ী' নামে পরিচিত।

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪ হি.-২৪১ হি.)। তাঁর সংকলিত ফিকহ 'আলফিকহুল হাম্বলী' নামে পরিচিত।

এই চারজন যেমন ফিকহশাস্ত্রের ইমাম তেমনি হাফেযুল হাদীস হিসেবেও গণ্য। শামসুদ্দীন যাহাবী রাহ.-এর 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে, যা হাফিযুল হাদীসগণের জীবনী বিষয়ে রচিত, উক্ত চার ইমামেরই জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। একইভাবে তাঁদের বিশিষ্ট শাগরিদ এবং শাগরিদের শাগরিদগণ হাফেযুল হাদীসের মধ্যে গণ্য, যাঁরা এই ইমামদের সংকলিত ফিকহ বিশদভাবে আলোচনা ও সংরক্ষণ করেছেন। হাদীসশাস্ত্রে ফিকহের প্রসিদ্ধ ইমামগণের দক্ষতা ও পারদর্শিতা কেমন ছিল সে সম্পর্কে বিশদ জানা যাবে তাঁদের জীবনীতে এবং তাদের হাদীস বিষয়ক কর্ম ও রচনাবলি অধ্যয়নের মাধ্যমে।

সহজ ও সংক্ষেপে এ বিষয়ে ধারণা পেতে চাইলে আলিম-তালিবে ইলমগণ নীচের কোনো একটি কিতাব অধ্যয়ন করতে পারেন।
১. 'আলইনতিকা ফী ফাযাইলিছ ছালাছাতিল ফুকাহা, ইবনে আবদিল বার (মৃত্যু : ৪৬৩ হি.)

২. মাকানাতুল ইমাম আবু হানীফা ফিল হাদীস, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী।
৩. ইমাম আ'যম আওর ইলমে হাদীস, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী সিদ্দীকী কান্দলভী।
৪. আলইমাম আবু হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসূন, যফর আহমদ উছমানী।
৫. মাকামে আবু হানীফা, মাওলানা সরফরায খান সফদর।
৬. মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশশাফেয়ী, খতীব বাগদাদী।
৭. মানাকিবু আহমদ, ইবনুল জাওযী।
৮. তারতীবুল মাদারিক, কাযী ইয়ায (ভূমিকা)।

উম্মতের উপর ফকীহগণের বড় অনুগ্রহ এই যে, তারা শরীয়তের বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যেমন করেছেন তেমনি তা সংকলনও করেছেন। বিশেষত ইবাদতের পদ্ধতি ও তার পূর্ণাঙ্গ কাঠামো স্পষ্টভাবে পেশ করেছেন, যা হাদীস, সুন্নাহ ও 'আমলে মুতাওয়ারাছ' (যা সুন্নাহর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকার) থেকে গৃহীত। এর বড় সুবিধা এই যে, কেউ মুসলমান হওয়ার পর সংক্ষেপে তাকে পদ্ধতি বুঝিয়ে দেওয়া হয় আর সে সঙ্গে সঙ্গে নামায পড়া আরম্ভ করে। শিশুদেরকে শেখানো হয়, সাত বছর বয়স থেকেই তারা নামায পড়তে থাকে। সাধারণ মানুষ, যাদের দলীলসহ বিধান জানার সুযোগ নেই এবং শরীয়তও তাদের উপর এটা ফরয করেনি, তাদেরকে শেখানো হয় আর তারা নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে থাকে।

যদি অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণের পর এবং শিশুকে বালেগ হওয়ার পর বাধ্য করা হত যে, তোমরা নামায আদায়ের পদ্ধতি হাদীসের কিতাব থেকে শেখ, কারো তাকলীদ করবে না, দলীল-প্রমাণের আলোকে সকল বিষয় নিজে পরীক্ষা করে নামায পড়বে তাহলে বছরের পর বছর অতিবাহিত হবে, কিন্তু তার নামায পড়ার সুযোগ হবে না। একই অবস্থা হবে যদি সাধারণ মানুষকে এই আদেশ করা হয়।

খুব ভালো করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, কুতুবে ছিত্তা (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস-গ্রন্থের সংকলক ইমামগণও প্রথমে নামায শিখেছেন ফিকহে ইসলামী থেকেই, এরপর পরিণত হয়ে হাদীসের কিতাব সংকলন করেছেন। অথচ হাদীসের কিতাব সংকলন করার পর তারা না ফিকহে ইসলামীর উপর

কোনো আপত্তি করেছেন, আর না মানুষকে ফিকহ সম্পর্কে আস্থাহীন করেছেন। বরং তারা নিজেরাও ফকীহগণের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। তবে যেখানে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ হয়েছে সেখানে তারা নিজেদের বিচার-বিবেচনা মোতাবেক কোনো এক মতকে অবলম্বন করেছেন এবং অন্য মত সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন।

মোটকথা, হাদীসের কিতাবসমূহের সংকলক এবং হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণের যেমন বড় অবদান উম্মতের প্রতি রয়েছে তেমনি ফিকহে ইসলামীর সংকলক ও ফিকহের ইমামগণেরও বড় অবদান রয়েছে। উম্মাহর অপরিহার্য কর্তব্য, কিয়ামত পর্যন্ত উভয় শ্রেণীর মনীষীদের অবদান স্বীকার করা এবং উভয় নেয়ামত : হাদীস ও ফিকহকে সঙ্গে রেখে চলা।

ছয়.

বাস্তবতা এই যে, উম্মতের যে শ্রেণী খাইরুল কুরূনের মতাদর্শের উপর রয়েছেন তারা সর্বদা হাদীস ও ফিকহ একত্রে ধারণ করে অগ্রসর হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারাই অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। তাদের কারো মনে শয়তান এই কুমন্ত্রণা দিতে পারেনি যে, হাদীসের হুকুম-আহকাম ফিকহের আকারে সংকলিত হয়ে যাওয়ার পর হাদীস শরীফের পঠন-পাঠন, চর্চা ও গবেষণার কোনো প্রয়োজন নেই (নাউযুবিল্লাহ)। তদ্রূপ শয়তান এই বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি যে, হাদীস শরীফ থাকতে ফিকহ ও ফুকাহার প্রয়োজন কী? কেননা, তাদের কাছে পরিষ্কার ছিল যে, কুরআন মজীদের পরে দ্বীনের সবচেয়ে বড় ও বিস্তৃত দলীল যে সুন্নাহ তার সবচেয়ে বড় সূত্র হাদীস শরীফ। এটা দ্বীনের দ্বিতীয় দলীল এবং দ্বীনী বিধি-বিধানের দ্বিতীয় সূত্র। অতএব এর প্রয়োজন কখনও শেষ হবে না। তাদের সামনে আরো পরিষ্কার ছিল যে, ফিকহে ইসলামী হাদীস শরীফ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়; বরং তা হাদীস শরীফ ও শরীয়তের অন্যান্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিধিবিধানেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও সংকলন। খোদ হাদীস শরীফেও ফিকহের গুরুত্ব ও ফকীহর মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে এবং স্বয়ং হাদীস বিশারদ ইমামগণও ফকীহদের শরণাপন্ন হতেন এবং অন্যদেরকেও এর পরামর্শ দিতেন। এজন্য এই প্রশ্নই অবান্তর যে, হাদীস শরীফ থাকতে ফিকহের প্রয়োজন কী?

প্রত্যেক যুগে যারা সঠিক উদ্দেশ্যে ও সঠিক পন্থায় হাদীস শরীফ অধ্যয়ন করেছেন তারা ফিকহ ও ফুকাহার প্রয়োজন প্রচণ্ডভাবে অনুভব করেছেন। হাদীস থাকতে ফিকহের কী প্রয়োজন এই প্রশ্নটা তখনই এসেছে যখন হাদীস চর্চার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিতে ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

সাত.

উদাহরণস্বরূপ 'নামাযের পদ্ধতি' সম্পর্কেই চিন্তা করুন। ছিফাতুস সালাত বা সালাত-পদ্ধতি বিষয়ক যত বেশি হাদীস আপনি সংগ্রহ করবেন এবং তাতে যত বেশি চিন্তা-ভাবনা করবেন, পাশাপাশি আপনার প্রতিদিনের নামায আদায়ের পদ্ধতি এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে যতবেশি ভাববেন ততই ফিকহ ও ফুকাহার প্রয়োজন আপনার সামনে পরিষ্কার হতে থাকবে।

কিছু সহজ বিষয় লক্ষ করুন :

গোটা নামাযের পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে কোনো এক হাদীসে নেই।

পূর্ণ নামাযের ধারাবাহিক নিয়ম হাদীসের এক দুই কিতাব নয়, ছয় বা দশ কিতাবেও নেই।

নামাযের মধ্যে বা নামায সম্পর্কে অনেক নামাযীর এমন সব সমস্যা সৃষ্টি হয়, যার কোনো শিরোনাম তারা হাদীসের কিতাবে খুঁজে পান না।

বহু বিষয় এমন রয়েছে যা হাদীস শরীফে বিদ্যমান থাকলেও হাদীসের কিতাবসমূহে তা শিরোনাম করা হয়নি। কেননা, সকল হাদীস ঐসব কিতাবেই সংকলিত হয়নি যা হাদীসের কিতাব নামে পরিচিত। সীরাতের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে, এবং সীরাতের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলোতেও বহু হাদীস রয়েছে। তেমনি সুন্নাহর একটি বড় অংশ আমলে মুতাওয়ারাছের মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে এসেছে।

ফিকহের ইমামগণ যখন নামাযের নিয়ম কানূন ধারাবাহিকভাবে সংকলন করেছেন তখন তারা শুধু হাদীসের দু'চার কিতাবে সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং হাদীস ও সুন্নাহর গোটা ভা-ার ছিল তাদের সামনে। এ জন্য তাঁরা ছিফাতুস সালাত বা নামাযের পদ্ধতি বিষয়ক ঐসব দিকও উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন যেগুলো শুধু 'হাদীসের কিতাব' থেকে বের করা যাবে না। যেমন কওমাতে দুই হাত বাধা থাকবে না ছেড়ে দেওয়া হবে, রুকু-সিজদার তাসবীহাত, আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দুআ আস্তে পড়া হবে না জোরে, মুকতাদী এক রোকন থেকে অন্য রোকনে যাওয়ার তাকবীর আস্তে বলবে না জোরে ইত্যাদি।

নামাযের বিভিন্ন কাজকর্মের ফিকহী বিধান যেমন ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ, সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা, আদব, মুস্তাহাব ইত্যাদির বিবরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়নি। তেমনি নামাযে বর্জনীয় বিষয়াদি যেমন, মাকরূহে তাহরীমী, মাকরূহে তানযীহী, বা নামায বিনষ্টকারী কাজকর্মও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে নেই। একটি উদাহরণ

দিচ্ছি। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ ও দুআ পড়তে বলেছেন, কিন্তু এদের কোনটা ফরয বা ওয়াজিব আর কোনটা সুন্নত বা মুস্তাহাব তার বিবরণ হাদীস শরীফে নেই।

কিংবা বলুন, নামাযের মধ্যে কোন কাজ ত্যাগ করলে নামায নষ্ট হয় এবং পুনরায় নামায পড়া ফরয বা ওয়াজিব হয় আর কোন কাজ ছেড়ে দিলে নামায নষ্ট হয় না তবে ছওয়াব কমে যায়–এই বিষয়গুলো বিবরণ আকারে হাদীস শরীফে বলা হয়নি। অথচ সচেতন মুসল্লীদের অজানা নয় যে, নামাযীকে নামাযের কাজগুলোর শ্রেণী ও পর্যায় সম্পর্কে অবগত হওয়াও অপরিহার্য। এ বিষয়গুলো হাদীস শরীফ থেকেই পাওয়া যাবে বটে তবে এত সহজ বিবরণ আকারে নেই যে, হাদীস শরীফের তরজমা পাঠ করলেই সব জানা যাবে। হাদীস শরীফ থেকে এই বিষয়গুলো আহরণ করার জন্য ইজতিহাদের যোগ্যতা এবং ফকীহ ও মুজতাহিদের অর্ন্তদৃষ্টি প্রয়োজন।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের সারকথা এই যে, হাদীস শরীফ অধ্যয়নের পরও আমাদের ফিকহ ও ফুকাহার শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই সমাধানগুলো আমরা তাঁদের কাছেই পাই। যদি হাদীসের কোনো কোনো ভাষ্যগ্রন্থে কিংবা ফিকহুল হাদীসের আলোচনা সম্বলিত হাদীস শরীফের কোনো বিশদ গ্রন্থে এ বিষয়ক কিছু সমাধান পাওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে, এই গ্রন্থের সংকলকগণ তা ফিকহে ইসলামী ও ফকীহদের নিকট থেকেই গ্রহণ করেছেন। এজন্য ফিকহের প্রয়োজন আজও ঠিক তেমনি আছে যেমন গতকাল ছিল। এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে। সামনের আলোচনা থেকে বিষয়টা আরো স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

আট.

নামায প্রসঙ্গে হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ যাদের খোলার অভিজ্ঞতা হয়েছে, অন্তত সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী এবং মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় যারা নামাযপ্রসঙ্গ অধ্যয়ন করেছেন, অথবা শুধু যদি শরহু মাআনিল আছারেও (তহাবী শরীফ) নামাযের হাদীসসমূহ পড়ে থাকেন তাহলে তাদের জানতে বাকি থাকেনি যে, অনেক বিষয়েই হাদীস শরীফে বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। অথচ হাদীসের উৎস হল ওহী আর ওহীর ইলমের মধ্যে বিরোধ থাকতে পারে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিক্ষায় স্ববিরোধিতা থাকা একেবারেই অসম্ভব। অতএব প্রকৃত বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

দেখা যায়, এক রেওয়ায়েতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও রাফয়ে ইয়াদাইন না-করার কথা আছে, তো অপর রেওয়ায়েতে আরো দুই জায়গায় তা করার কথা এসেছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরো অধিক স্থানে করার কথাও আছে।

কোথাও 'বিসমিল্লাহ' আস্তে পড়ার কথা আছে, কোথাও আছে জোরে পড়ার কথা।

কোথাও আমীন আস্তে বলার কথা আছে, আবার কোথাও জোরে পড়ার কথা।

কোনো রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায়, ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়া চাই, অথচ অন্যান্য রেওয়ায়েতে এসেছে (ফাতিহা ও সূরা) না পড়ার কথা?

কোনো হাদীসে তাশাহহুদের পাঠ একরকম, অন্য হাদীসে অন্য রকম। তদ্রূপ ছানা, তাসবীহাত, দরূদ ও দুআয়ে কুনূতেরও বিভিন্ন পাঠ রয়েছে। এ ধরনের আরো বহু বিরোধ ও বৈচিত্র্য।

তো প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে যারা ওয়াকিফহাল নন তারা কখনও কখনও দিশেহারা বোধ করে থাকেন। আর এটাই স্বাভাবিক। তবে বিশেষজ্ঞরা জানেন, এখানে বাহ্যত যে বিরোধগুলো দেখা যাচ্ছে তা এজন্য সৃষ্টি হয়নি যে,—নাউযুবিল্লাহ—ওহীর শিক্ষাতেই কোনো বৈপরিত্য ও স্ববিরোধিতা রয়েছে। কিংবা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে স্ববিরোধী নির্দেশনা দিয়েছেন! না, কখনও না। ঐ বাহ্যিক বিরোধগুলোর প্রকৃত পরিচয় এই :

১. সুন্নাহর বিভিন্নতা। অর্থাৎ অনেক বিষয়ে একাধিক মাসনূন তরীকা রয়েছে। এই হাদীসে যে পন্থা এসেছে সেটিও মাসনূন, অন্য হাদীসে যেটি এসেছে সেটিও মাসনূন। যেমন ছানাতে 'সুবহানাকা ...' পড়াও সুন্নাহ, 'আল্লহুম্মা ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ...' পড়াও সুন্নাহ।

কুনূতে 'আল্লাহুম্মাহ্‌দিনী ...' পড়াও সুন্নাহ, 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা ...' পড়াও সুন্নাহ।

কওমাতে 'রাব্বানা লাকাল হামদ'ও বলা যায়, 'রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ'ও বলা যায়, 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ'ও বলা যায়। তদ্রূপ নিম্নোক্ত দুআও পড়া যায়। সবগুলোই সুন্নাহ।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد : اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

২. বহু বিরোধ এমন রয়েছে, যেখানে দুটো বিষয়ই হাদীস শরীফ কিংবা কোনো শরয়ী দলীলের দ্বারা প্রমাণিত। অর্থাৎ দুটোরই উৎস সুন্নাহ, কিন্তু বিভিন্ন আলামতের ভিত্তিতে কোনো ফকীহ একটিকে উত্তম ও অগ্রগণ্য আর অন্যটিকে বৈধ ও অনুমোদিত মনে করেন। আবার অন্য ফকীহ এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

এটাও মূলত 'সুন্নাহর বিভিন্নতা'রই অন্তর্ভুক্ত। রাফয়ে ইয়াদাইন, আমীন ইত্যাদি বিষয়গুলো এই শ্রেণীর।

৩. কিছু দৃষ্টান্ত এমনও রয়েছে যে, প্রথমে একটা বিষয় 'মাসনূন' বা 'মুবাহ' ছিল, পরে তা মানসূখ ও রহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ এর স্থলে অন্য একটি পদ্ধতি প্রদান করা হয় আর প্রথম পদ্ধতি পরিত্যাগ করা হয় কিংবা সেটি 'মাসনূনে'র পর্যায় থেকে 'মুবাহ' ও 'বৈধতা'র পর্যায়ে নেমে আসে। পরিভাষায় একে নাসিখ-মানসূখ বলে।

ইসলামের প্রথম যুগে নামাযে সালামের জওয়াব দেওয়া যেত। তখন প্রয়োজনীয় কথা বলারও অবকাশ ছিল। কিন্তু পরে তা মানসূখ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة.

–সহীহ বুখারী : তাওহীদ, পরিচ্ছেদ : ৪২; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৯২০

তদ্রূপ একটা সময় পর্যন্ত রুকুতে দুই হাত একত্র করে দুই হাটুর মধ্যে রাখা মাসনূন ছিল। পরে দুই হাতের আঙুল দ্বারা দুই হাটু ধরা মাসনূন সাব্যস্ত হয়। তবে প্রথম পদ্ধতি নাজায়েয করা হয়নি।

৪. কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে একটি পদ্ধতি হল সুন্নাহ আর অন্যটি ছিল ওজরবশত। কিন্তু কেউ কেউ একেও সুন্নাহ মনে করেছেন। যেমন শেষ বৈঠকে বসার মাসনূন পদ্ধতি কারো অজানা নয়। আরেকটি পদ্ধতি আছে, যা মহিলাদের জন্য মাসনূন। কোনো কোনো বর্ণনায় চারজানু হয়ে বসার কথাও এসেছে। কিন্তু প্রাসঙ্গিক সকল হাদীস সামনে রাখলে এবং নামাযের পদ্ধতি প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি ও ধারা সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায়, পুরুষের জন্য ঐ প্রসিদ্ধ পদ্ধতিই হচ্ছে মাসনূন তরীকা। অন্য পদ্ধতিগুলোও কখনো কখনো অনুসরণ করা হয়েছিল ওজরবশত, কিংবা শুধু বৈধতা বোঝানোর জন্য।

৫. এমন কিছু উদাহরণও রয়েছে, যেখানে মাসনূন তরীকা একটিই, যা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর ভিন্ন পদ্ধতি, যা কোনো কোনো বর্ণনায়

পাওয়া যায় সেটা সহীহ হাদীস নয়, বর্ণনাকারীর ভ্রান্তি। কিন্তু কোনটা সহীহ হাদীস আর কোনটা বর্ণনাকারীর ভুল এই সিদ্ধান্ত শুধু হাদীসবিশারদ ইমামগণই দিতে পারেন। তাঁরা যদি একমত হয়ে কোনো রায় দেন তবে সেটাই নির্ধারিত। আর যেখানে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়, এবং অবশ্যই তা যুক্তিসংগত মতভেদ, সেখানে প্রাজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কোনো একটি মত অবলম্বন করবেন। আর সাধারণ মানুষ অনুসরণ করবেন কোনো একজনের সিদ্ধান্ত।

এবার চিন্তা করুন : এই বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রকৃত অবস্থা উদঘাটন করা–কোনটা সুন্নাহর বিভিন্নতা আর কোনটা উত্তম-অনুত্তমের পার্থক্য আর কোথায় সুন্নাহ বনাম ওজরের প্রসঙ্গ–এটা অবশ্যই দলীলের ভিত্তিতেই হতে হবে। কিন্তু এই দলীল, আলামত ও লক্ষণগুলো এত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয় যে, যে কেউ তা অনুধাবন করতে এবং তার আলোকে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। এটা এমন এক ক্ষেত্র যেখানে ইজতিহাদ ও ফিকহের প্রজ্ঞা অপরিহার্য। প্রথম থেকেই এই গুরু দায়িত্ব উম্মাহর ফকীহ ও মুজতাহিদগণের উপরই ন্যস্ত ছিল এবং এটা ফিকহে ইসলামীর গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রসঙ্গ। আর যেহেতু এই ক্ষেত্রগুলো ইজতিহাদ-নির্ভর তাই এখানে মতপার্থক্য হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়।

৬. অনেক বিষয়ে মতভেদ হওয়ার কারণ শুধু এই যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। এখানে বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা একটি ব্যাখ্যাকে শুধু অগ্রগণ্যই বলা যায়। এই ব্যাখ্যাই সুনিশ্চিত আর অন্যটা ভুল–এমন বলা যায় না। এ ধরনের ক্ষেত্রেও কিতাব ও সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ ফকীহ ও মুজতাহিদগণের মাঝে মতভেদ হওয়া অবশ্যম্ভবী।

কোনো কোনো 'নুসূসে শরইয়্যাহ' তে (দলীলের পাঠ, আয়াত হোক বা হাদীস) একাধিক ব্যাখ্যার যে অবকাশ থাকে তা কখনও লুগাত বা ভাষাগত কারণে হয়। অর্থাৎ আরবী ভাষাতেই সে শব্দ বা বাক্যের একাধিক অর্থ রয়েছে। কখনও এজন্যও হয় যে, আলোচ্য বিষয়ে এই 'নস' ছাড়া আরো দলীল ও 'নস' রয়েছে। সেগুলো সামনে রাখলে প্রথমে ওই নসের যে অর্থ বোঝা যাচ্ছিল তা আর নিশ্চিত থাকে না, অন্য ব্যাখ্যারও অবকাশ সৃষ্টি হয়।

এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন লক্ষণ ও আলামতের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, কোন ব্যাখ্যা অধিক উপযোগী বা অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। বলাবাহুল্য, যখন লক্ষণ বিভিন্ন হবে তো নসের ব্যাখ্যায় মতভেদ হওয়াই স্বাভাবিক।

এ ধরনের মতভেদের দৃষ্টান্ত নবীযুগেও ছিল। এখানে এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ ঘটনাটি উল্লেখ করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গযওয়ায়ে আহযাব (খন্দকের যুদ্ধ)-এর মতো কঠিন গযওয়া থেকে ফিরে এলেন এবং হাতিয়ার রেখে গোসল করলেন। তখন হযরত জিব্রীল আ. এসে বললেন, আপনি অস্ত্র ছেড়েছেন? আল্লাহর কসম! আমরা তো এখনও অস্ত্র ছাড়িনি। জলদি চলুন। এটিই আল্লাহর আদেশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন দিকে? জিব্রীল আ. বনু কুরাইযার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ঐ দিকে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে বের হলেন এবং হযরত বিলাল রা.-কে ঘোষণা দিতে বললেন—

من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة

'যে রাসূলুল্লাহর বাধ্য ও অনুগত সে যেন বনু কুরাইযায় যেয়েই আছরের নামায পড়ে।'

ঘোষণা শোনামাত্র সবাই অস্ত্র হাতে রওনা হলেন। অনেকেই সময়মতো পৌঁছে গেলেন। কিছু সাহাবী রাস্তায় ছিলেন। এদিকে আছরের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এঁদের মধ্যে মতভেদ হল যে, নামায কোথায় পড়া হবে। কিছু সাহাবী বললেন, আমরা সেখানেই নামায পড়ব, যেখানে পড়তে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন। অন্যরা বললেন, তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, আমরা নামায কাযা করি। শেষে কিছু সাহাবী পথিমধ্যেই নামায পড়ে রওনা হলেন, অন্যরা বনু কুরাইযায় পৌঁছে নামায পড়লেন। তখন সূর্য ডুবে গেছে। তাঁদের বক্তব্য ছিল, আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ পালন করেছি। অতএব আমাদের কোনো অপরাধ নেই। বর্ণনাকারী বলেন—

فصلت طائفة إيمانا واحتسابا وتركت طائفة إيمانا واحتسابا

অর্থাৎ যারা পথিমধ্যে নামায পড়েছেন তারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমানের কারণে ছওয়াবের আশায় নামায পড়েছেন আর যারা কাযা করেছেন তারাও তাঁর আদেশের উপর ঈমান ও ছওয়াবের আশায় কাযা করেছেন।

পরিশেষে এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে উপস্থাপিত হল। তিনি কাউকেই ভর্ৎসনা করলেন না।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস ৪১১৯; সহীহ মুসলিম কিতাবুল জিহাদ হাদীস ১৭৭০; সীরাতে ইবনে হিশাম খ. ৬, পৃ. ২৮২, ২৮৪; দালাইলুন নুবুওয়াহ বায়হাকী খ. ৪, পৃ. ৬-৭; আলমুজামুল কাবীর তবারানী খ. ১৯, পৃ. ৮০)

এই মতভেদ যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের অর্থ নির্ধারণ নিয়ে হয়েছিল এবং প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল নবীজীর আনুগত্য ও আদেশ পালন তাই কোনো দলকেই তিরস্কার করা হয়নি।

ইবনুল কাইয়েম রাহ. "যাদুল মাআদ" গ্রন্থে আলোচনা করেছেন, বাস্তবে কাদের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন, যারা নামায কাযা করেননি তাদের সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। তারা দুই ছওয়াবের অধিকারী। আর অন্যরা যেহেতু 'নস'-এর বাহ্যিক অর্থ অনুসরণ করেছেন এবং তাদেরও লক্ষ্য ছিল রাসূলুল্লাহর আনুগত্য তাই তারা 'মাযূর' এবং এক ছওয়াবের অধিকারী। (যাদুল মাআদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯; হাদয়ুহূ ফিল আমান)

তো আমি যে বিষয়টি আরজ করছি তা এই যে, 'শরয়ী নস'-এর অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাহাবা-যুগেও কখনো কখনো মতভেদ হয়েছে এবং যেহেতু তা যুক্তিসংগত ছিল তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো উপর আপত্তি করেননি।

আমাদের আলোচনা নামাযের নিয়ম সম্পর্কে। এজন্য এ বিষয়ে আরেকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

যার শাব্দিক তরজমা 'ফাতিহা ছাড়া কোনো নামায নেই।'

নামাযের কিরাত প্রসঙ্গে যদি এটিই একমাত্র হাদীস হত এবং এ বিষয়ে অন্য কোনো হাদীস বা শরীয়তের অন্য কোনো দলীল না থাকত তাহলে একথা বলা ছাড়া উপায় থাকত না যে, নামাযে ইমাম ও মুনফারিদের মতো মুক্তাদীরও ফাতিহা পড়া অপরিহার্য। কিন্তু যখন এই হাদীসের সাথে কুরআন মজীদের এই আয়াতও সামনে থাকবে–

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

(তরজমা) যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শুনবে এবং নিশ্চুপ থাকবে। যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।–সূরা আরাফ (৭) : ২০৪

এবং ঐ হাদীসগুলোও সামনে থাকবে যেগুলোতে বলা হয়েছে–

وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم قولوا : آمين.

এবং (ইমাম) যখন পড়ে তখন তোমরা নিশ্চুপ থাকবে। আর যখন

غير المغضوب عليهم বলবে তখন তোমরা 'আমীন' বলবে।

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة

'যার ইমাম রয়েছে তো ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত।'

এবং ঐসব হাদীসও সামনে থাকবে যেগুলোতে আস্তে কিরাতের নামাযেও ইমামের পিছনে কুরআন পড়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তখন কি নির্দ্বিধায় বলা যাবে যে, মুকতাদীর জন্যও ফাতিহা পড়া অপরিহার্য? আর এটাই এই হাদীসের বিধান? বরং উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের কারণে বলা হবে যে, প্রথম হাদীস দ্বারা নামাযে ফাতিহা পাঠ জরুরি প্রমাণিত হয়। তবে অন্যান্য হাদীস থেকেই জানা যাচ্ছে যে, ইমামের ফাতিহা পাঠই মুকতাদীর ফাতিহা পাঠ। অতএব তাকে আলাদা করে ফাতিহা পড়তে হবে না; সে নিশ্চুপ থাকার ও শ্রবণ করার আদেশ পালন করবে।

সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে প্রতি যুগের বিপুল সংখ্যক ফকীহ উপরোক্ত হাদীসের এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। মুকতাদীর জন্যও ফাতিহা পাঠ অপরিহার্য হওয়াকে তারা উপরোক্ত হাদীসের বিধান মনে করেননি। অন্যদিকে অনেক ফকীহর মত এই ছিল যে, আস্তে কিরাতের নামাযে মুকতাদী ফাতিহা পড়বে, জোরে কিরাতের নামাযে পড়বে না। কেউ কেউ মনে করতেন, মুকতাদী জোরে কিরাতের নামাযেও ফাতিহা পড়বে। বলাবাহুল্য, এ বিষয়ের সকল দলীল এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় সামনে রাখা হলে এই ব্যাখ্যাগুলোকেও নিশ্চিতভাবে ভুল বলা কঠিন।

কথা দীর্ঘ হয়ে গেল। আমি বলতে চাচ্ছিলাম, নামায বা শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ে যেসব ক্ষেত্রে হাদীস শরীফে বাহ্যত বিরোধ দেখা যায় সেখানে ঐ বিরোধের ধরন ও তাৎপর্য নির্ণয় করা ছাড়া হাদীসের নির্দেশনার উপর আমল করা মোটেই সম্ভব নয়। তো এই বিষয়ে সমাধান কারা দিতে পারেন? কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা ফিকহে ইসলামী ও উম্মতের ফকীহগণের কাজ। এজন্য সর্বযুগেই হাদীসের সাথে ফিকহও দ্বীনের খাদেম হিসাবে বিদ্যমান ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আর ওয়ারিছে নবীর কাতারে যখন থেকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম ছিলেন তখন থেকেই ফুকাহায়ে কেরামও আছেন।

নয়.

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নামাযের পদ্ধতিগত কিছু বিষয়ে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই বিভিন্নতা

ছিল। এটা খাইরুল কুরূনেও ছিল এবং পরের যুগগুলোতেও ছিল। এর কারণ সম্পর্কেও ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা হয়েছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে উম্মতের করণীয় কী তা শরীয়তের দলীলের আলোকে ফিকহে ইসলামীতে বলা হয়েছে। হাদীস মোতাবেক নামায পড়ার জন্য ওই নির্দেশনা অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই।

এ ধরনের বিষয়ে উম্মাহর যে নীতি 'খাইরুল কুরূন' তথা সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন-এর যুগ থেকে অনুসৃত তা সংক্ষেপে এই :

১. যে অঞ্চলে যে সুন্নাহ প্রচলিত সেখানে তা-ই চলতে দেওয়া উচিত। এর উপর আপত্তি করা ভুল। কেননা আপত্তি ঐ বিষয়ে করা হয়, যা বিদআত বা সুন্নাহর পরিপন্থী। এক সুন্নাহর উপর এজন্য আপত্তি করা যায় না যে, এটি আরেক সুন্নাহর মোতাবেক নয়।

এ প্রসঙ্গে ইসমাঈল শহীদ রাহ.-এর ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি একবার রুকু ইত্যাদিতে 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করতে আরম্ভ করেছিলেন। অথচ সে সময় গোটা ভারতবর্ষে (ক্ষুদ্র কিছু অঞ্চল ব্যতিক্রম ছিল, যেখানে ফিকহে শাফেয়ী অনুযায়ী আমল হত) নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কোনো স্থানে রাফয়ে ইয়াদাইন না-করার সুন্নতটি প্রচলিত ছিল। শাহ শহীদ রাহ.-এর বক্তব্য ছিল, মৃত সুন্নত জীবিত করার ছওয়াব অনেক বেশি। হাদীস শরীফে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে—

من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد

'উম্মতের ফাসাদের মুহূর্তে যে আমার সুন্নাহকে ধারণ করে সে একশত শহীদের মর্যাদা পাবে।'

তখন তাঁর চাচা হযরত মাওলানা আবদুল কাদের দেহলবী রাহ. (শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহ.-এর পুত্র, তাফসীরে মূযিহুল কুরআন-এর রচয়িতা) তার এই ধারণা সংশোধন করেন। তিনি বলেন, "মৃত সুন্নাহকে জীবিত করার ফযীলত যে হাদীসে এসেছে সেখানে বলা হয়েছে যে, উম্মাহর ফাসাদের যুগে যে ব্যক্তি সুন্নাহকে ধারণ করে তার জন্য এই ফযীলত। তো কোনো বিষয়ে যদি দু'টো পদ্ধতি থাকে এবং দু'টোই মাসনূন (সুন্নাহভিত্তিক) হয় তাহলে এদের কোনো একটিকেও 'ফাসাদ' বলা যায় না। সুন্নাহর বিপরীতে শিরক ও বিদআত হল ফাসাদ, দ্বিতীয় সুন্নাহ কখনও ফাসাদ নয়। কেননা, দু'টোই সুন্নাহ। অতএব রাফয়ে ইয়াদাইন না-করাও যখন সুন্নাহ, তো কোথাও এ সুন্নাহ অনুযায়ী আমল হতে থাকলে সেখানে রাফয়ে ইয়াদাইনের সুন্নাহ 'জীবিত' করে উপরোক্ত ছওয়াবের আশা করা ভুল। এটা ওই

হাদীসের ভুল প্রয়োগ। কেননা এতে পরোক্ষভাবে দ্বিতীয় সুন্নাহকে ফাসাদ বলা হয়, যা কোনো মতেই সঠিক নয়।'

এই ঘটনাটি আমি বিশদ করে বললাম। মূল ঘটনা মালফূযাতে হাকীমুল উম্মত খ. ১, পৃ. ৫৪০-৫৪১, মালফুয : ১১১২৬ খ. ৪, পৃ. ৫৩৫, মালফুয : ১০৫৬ এবং মাজালিসে হাকীমুল উম্মত পৃ. ৬৭-৬৯ তে উল্লেখিত হয়েছে।

সারকথা, সালাফে সালেহীন বিদআত থেকে দূরে থাকতেন এবং বিদআতের বিরোধিতা করতেন। আর সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতেন এবং সুন্নাহকে জীবিত করতেন। কিন্তু কখনও তাদের নীতি 'ইবতালুস সুন্নাহ বিসসুন্নাহ' বা 'ইবতালুস সুন্নাহ বিলহাদীস' ছিল না। অর্থাৎ তারা এক সুন্নাহকে অন্য সুন্নাহর মোকাবেলায় দাঁড় করাতেন না। তদ্রূপ 'সুন্নতে মুতাওয়ারাছা' দ্বারা প্রমাণিত আমলের বিপরীতে রেওয়ায়েত পেশ করে তাকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করতেন না। এক সুন্নাহর সমর্থনে অন্য সুন্নাহকে খণ্ডন করা আর একে 'মুর্দা সুন্নত জিন্দা করা' বলে অভিহিত করা তাদের নীতি ছিল না। এটা ভুল নীতি, যা খাইরুল কুরূনের শত শত বছর পরে জন্মলাভ করেছে।

২. যেসব মাসআলার ভিত্তি ইজতিহাদ, কিংবা দলীলে নকলী বিদ্যমান থাকলেও তা থেকে বিধান আহরণের জন্য ইজতিহাদের প্রয়োজন, সেগুলোকে 'মুজতাহাদ ফীহ' বিষয় বলে। এ ধরনের বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এজন্য যেসব 'মুজতাহাদ ফীহ' বিষয়ে জায়েয-না জায়েযের মতভেদ হয়েছে সেখানেও এই নীতিই অনুসৃত হয়েছে যে, এগুলো 'নাহি আনিল মুনকার'-এর বিষয় নয়। অর্থাৎ যেভাবে কোনো মুনকার বা অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করা হয় এবং তাতে লিপ্ত হওয়া থেকে মানুষকে বিরত রাখা হয় তা এই ধরনের মাসআলায় করা যাবে না। এক মুজতাহিদ অন্য মুজতাহিদের উপর কিংবা অন্য মুজতাহিদের অনুসারীর উপর আপত্তি করবেন না। 'মুজতাহাদ ফীহ' মাসাইল নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনা হতে পারে, মতবিনিময় হতে পারে, কিন্তু একে বিভেদ-বিভক্তির উপলক্ষ বানানো যাবে না। তদ্রূপ এর ভিত্তিতে কাউকে গোমরাহ বলা যাবে না, ফাসিক বা বিদআতী আখ্যা দেওয়া যাবে না। সাহাবা-তাবেয়ীন যুগ অর্থাৎ খাইরুল কুরূন থেকেই এই নীতি অনুসৃত হয়েছে এবং এতে কারো কোনো দ্বিমত ছিল না। তো জায়েয-নাজায়েযের বিতর্ক যেসব মাসআলায় তাতেই যদি নীতি এই হয় তাহলে যেখানে শুধু উত্তম-অনুত্তমের প্রশ্ন, তার বিধান কী হবে?

বালাবাহুল্য, এ ধরনের বিষয়কে কেন্দ্র করে বিদ্বেষ ছড়ানো, বিভক্তি সৃষ্টি করা এবং একে অন্যকে ফাসেক, গোমরাহ, বিদআতী আখ্যা দেওয়ার কোনো অবকাশ শরীয়তে নেই। তদ্রূপ এ কারণে একজন অন্যজনকে হাদীস-বিরোধী বা সুন্নাহ-বিরোধী বলারও কোনো সুযোগ নেই।

স্বয়ং আইম্মায়ে হাদীস এই ইখতিলাফকে 'ইখতিলাফুল মুবাহ' বা 'ইখতিলাফু তা'আদ্দুদিস সুন্নাহ' নামে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ এমন কিছু পদ্ধতি যেখানে প্রত্যেক পদ্ধতিই 'মুবাহ' অথবা 'মাসনূন'। তাহলে এখানে গোমরাহ বলা, ফাসিক বলা কিংবা হাদীস বিরোধিতার অভিযোগ দায়ের করার কী অর্থ?

আজকাল রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে ওঠার সময় এবং তৃতীয় রাকাতের শুরুতে রাফয়ে ইয়াদাইন করা নিয়ে, আমীন জোরে বা আস্তে বলা নিয়ে এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয় নিয়ে কোনো কোনো মহলে কত যে ঝগড়া-বিবাদ, চ্যালেঞ্জবাজি, লিফলেটবাজি হতে থাকে তার হিসাব কে রাখে? অথচ এইসব মাসআলায় যে মতভেদ তা হল সুন্নাহর বিভিন্নতা, যেখানে ঝগড়া-বিবাদের প্রশ্নই অবান্তর।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহ. হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু রাফয়ে ইয়াদাইনকে 'আহাব্বু ইলাইয়া' (আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়) বলেছেন এবং তার কিছু হিকমতও বয়ান করেছেন। এরপরও লিখেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও রাফয়ে ইয়াদাইন করেছেন, কখনও করেননি। উভয় পদ্ধতিই সুন্নাহ এবং সাহাবা, তাবেয়ীন ও পরবর্তীদের মধ্যে উভয় পদ্ধতিরই অনুসারী ছিলেন। এটা ঐসব মাসআলার অন্যতম যাতে আহলে মাদীনা (মদীনার ফকীহবৃন্দ) ও আহলে কূফা (কূফার ফকীহবৃন্দ)-র মধ্যে মতভেদ হয়েছে এবং প্রত্যেকের কাছেই শক্তিশালী দলীল রয়েছে।—হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০

অন্যদিকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহ.-এর আগের ও পরের অসংখ্য মুহাক্কিক-গবেষক রাফয়ে ইয়াদাইন না-করাকে উত্তম বলেছেন। (আমরাও দলীলের বিচারে এ কথাই বলে থাকি) কিন্তু এ পর্যন্তই। একে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ কেউ করেননি। সকলেই শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতো একে সুন্নাহর বিভিন্নতা বলেই মনে করেছেন।

ইবনুল কাইয়েম রাহ. (৭৫১ হি.) 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে ফজরের নামাযে কুনূত পড়া-প্রসঙ্গে পরিষ্কার লেখেন—

وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه فاعله ولا من تركه، وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالاختلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة، وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع.

অর্থাৎ এটা ঐসব ইখতিলাফের অন্তর্ভুক্ত যাতে কোনো পক্ষই নিন্দা ও ভর্ৎসনার পাত্র নন। এটা নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন করা বা না-করা, 'আত্তাহিয়্যাতু'র বিভিন্ন পাঠ, আযান-ইকামতের বিভিন্ন ধরন, হজ্বের বিভিন্ন প্রকার-ইফরাদ, কিরান, তামাত্তু বিষয়ে ইখতিলাফের মতোই।'

শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. (৭২৮ হি.) লেখেন, 'এ বিষয়ে আমাদের নীতি-আর এটিই বিশুদ্ধতম নীতি-এই যে, ইবাদতের পদ্ধতিগত বিষয়ে (যেসব ক্ষেত্রে ইখতিলাফ রয়েছে তাতে) যে পদ্ধতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য 'আছর' রয়েছে তা মাকরূহ হবে না; বরং তা হবে শরীয়তসম্মত। সালাতুল খওফের বিভিন্ন পদ্ধতি, আযানের দুই-নিয়ম : তারজী'যুক্ত বা তারজী'বিহীন, ইকামতের দুই-নিয়ম : বাক্যগুলো দুইবার করে বলা কিংবা একবার করে, তাশাহহুদ, ছানা, আউযু-এর বিভিন্ন পাঠ, কুরআনের বিভিন্ন কিরাআত, এই সবগুলো এই নীতিরই অন্তর্ভুক্ত। এভাবে ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর (ছয় তাকবীর বা বারো তাকবীর) জানাযার নামাযের বিভিন্ন নিয়ম, সাহু সিজদার বিভিন্ন নিয়ম, কুনূত রুকুর পরে না আগে, রাব্বানা লাকাল হামদ 'ওয়া'সহ অথবা 'ওয়া' ছাড়া, এই সবগুলোই শরীয়তসম্মত। কোনো পদ্ধতি উত্তম হতে পারে, কিন্তু অন্যটি মাকরূহ কখনও নয়। (মাজমূউল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২৪/২৪২, ২৪৩ আরো দেখুন : আল ফাতাওয়াল কুবরা ১/১৪০)

ইবনে তাইমিয়া রাহ. 'মাজমূউল ফাতাওয়া'-র বিভিন্ন স্থানে এবং 'ইকতিযাউস সিরাতিল মুসতাকীম' গ্রন্থে আরো বিস্তারিত ও প্রামাণিক আলোচনা করেছেন। তিনি পরিষ্কার লিখেছেন, 'ইখতিলাফে তানাওউ' (অর্থাৎ পদ্ধতিগত বিভিন্নতা)-র ক্ষেত্রসমূহে যে যেই পদ্ধতি অনুসরণ করতে চায় (এই জন্য যে, তার শহরে এই পদ্ধতিই প্রচলিত, কিংবা তার মাশাইখ এই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন অথবা তার দৃষ্টিতে ঐ পদ্ধতিই উত্তম) সে তা করতে পারে। এখানে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। নিজে যে পন্থা ইচ্ছা অবলম্বন করুক, কিন্তু অন্যের অনুসৃত পদ্ধতিকে (যা শরয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত) প্রত্যাখ্যান করার অধিকার নেই; বরং তা জুলুমের অন্তর্ভুক্ত।

এ বিষয়ে শায়খ ইবনে তাইমিয়ার বিভিন্ন পুস্তিকা ও ফতোয়ার সংকলন 'রিসালাতুল উলফা বাইনাল মুসলিমীন' নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ-এর সম্পাদনায় বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। রিসালাটি অবশ্যই পড়ার মতো।

রাফয়ে ইয়াদাইন, আমীন ইত্যাদি বিষয়ের ইখতিলাফ যে, 'মুবাহ' বা 'সুন্নাহ'র বিভিন্নতা, তা শুধু উপরোক্ত ব্যক্তিদেরই কথা নয়, চার মাযহাবের বড় বড় ফকীহ অনেক আগেই তা বলেছেন। ইমাম আবু বকর আলজাসসাস আলহানাফী (৩৭০ হি.) আহকামুল কুরআনে (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০৩-২০৪) এ কথাই লিখেছেন। ইমাম ইবনে আবদুল বার মালেকী 'আততামহীদ' ও 'আলইসতিযকার' দুই কিতাবেই এ কথা বলেছেন। তিনি রাফয়ে ইয়াদাইন-এর আলোচনায় আহমদ ইবনে খালিদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, 'আমাদের আলিমদের মধ্যে কেউ রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন আর কেউ তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। তবে তারা একে অন্যের নিন্দা করতেন না।

فما عاب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء

তিনি তার উস্তাদ আবু উমার আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, আমাদের উস্তাদ আবু ইবরাহীম ইসহাক সকল ওঠা-নামায় হাত তুলতেন। ইবনে আবদুল বার উস্তাদজীকে বললেন, 'তাহলে আপনি কেন রাফয়ে ইয়াদাইন করেন না। তাহলে আমরাও আপনার অনুসরণে রাফয়ে ইয়াদাইন করতাম?' তিনি বললেন, ইবনুল কাসিম ইমাম মালিক রাহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাফয়ে ইয়াদাইন শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় হবে। আমাদের অঞ্চলে এই রেওয়ায়েত মোতাবেকই আমল হয়ে থাকে। আর মুবাহ বিষয়ে (অর্থাৎ যেখানে দুটো পদ্ধতিই বৈধ ও মুবাহ, যদিও কারো দৃষ্টিতে একটির তুলনায় অন্যটি উত্তম হতে পারে) সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পথ পরিহার করা সালাফের ইমামগণের নীতি ছিল না।

ومخالفة الجماعة فيما قد أبيح لنا ليست من شيم الأئمة

(আততামহীদ খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২২৩; আলইসতিযকার খ- ৪, পৃষ্ঠা ১০২)

ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. আততামহীদের শুরুতে এক ভিন্ন প্রসঙ্গে এই মূলনীতি উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কর্তব্য হল তাদের পূর্বসূরীদের তরীকা অনুসরণ করা। ভালো কাজের যে পদ্ধতি তারা অবলম্বন

করেছিলেন তাই অনুসরণ করা উচিত, যদিও অন্য কোনো মুবাহ পন্থা অধিক পছন্দনীয় মনে হয়।

فكل قوم ينبغي لهم امتثال طريق سلفهم فيما سبق إليهم من الخير، وسلوك منهاجهم فيما احتملوه عليه من البر، وإن كان غيره مباحا مرغوبا فيه.

(আততামহীদ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০)

এই মনীষীগণ দলীলভিত্তিক ফুরূয়ী ইখতিলাফ বিশেষত 'ইখতিলাফুল মুবাহ'-এর ক্ষেত্রে যে মূলনীতি উল্লেখ করেছেন তা তাদের ব্যক্তিগত মত নয়; বরং শরীয়তের দলীল ও ইজমায়ে সালাফের দ্বারা প্রমাণিত। শায়খ ওলিউল্লাহ রাহ. ও শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. এ বিষয়ে প্রামাণিক আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক তাদের উপরোক্ত গ্রন্থসমূহে তা পড়ে নিতে পারেন। এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা-কৃত 'আদাবুল ইখতিলাফ ফী মাসাইলিল ইলমি ওয়াদ দীন' এবং ত্বহা জাবির-কৃত 'আদাবুল ইখতিলাফ ফিল ইসলাম' অত্যন্ত চমৎকার ও প্রামাণিক গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থের শুরুতে শায়খ উমর উবাইদ হাসানা-র ভূমিকাটি বিশেষভাবে অধ্যয়নযোগ্য।

আমি শুধু একটি বিষয়ে চিন্তা করতে বলব। আজকাল উপমহাদেশের অনেক অঞ্চলে এবং অনেক মসজিদে, আল্লাহ মাফ করুন, যে হই-হাঙ্গামা হচ্ছে, বিশেষ কিছু ফুরূয়ী মাসআলাকে কেন্দ্র করে চ্যালেঞ্জবাজি, লিফলেটবাজি এবং বিভিন্ন কটূবাক্য ব্যবহারের রীতি যারা আরম্ভ করেছেন তাদের ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা উচিত যে, এই সব মতভেদ তো সাহাবা-তাবেয়ীন আমলেও ছিল কিন্তু—নাউযুবিল্লাহ—এইসব চ্যালেঞ্জবাজি ও ফের্কাবাজি তো দূরের কথা, নিন্দা-সমালোচনাও কখনও হয়নি। আমাদের এই বন্ধুরা যদি একটু চিন্তা করতেন যে, নামাযের একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে তারা যে একেই নবী-নামায ও হাদীসের নামায বলে আখ্যায়িত করছেন আর অন্য সব পন্থাকে হাদীস-সুন্নাহর বিরোধী সাব্যস্ত করছেন, এমনকি তাদের কট্টরপন্থী লোকেরা তো অন্য নামাযকে একেবারে বাতিলই বলে থাকে-তাহলে কি খোলাফায়ে রাশেদীন, আশারায়ে মুবাশশারা ও অন্যান্য সাহাবীদের নামাযও সুন্নাহবিরোধী ছিল? প্রশ্নটি এজন্য আসে যে, আমাদের এ সকল বন্ধুরা নামাযের যে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে এদের কারো নামাযের সাথেই মেলে না। তাহলে কি পরোক্ষভাবে উক্ত সাহাবীদের নামাযকেও খেলাফে সুন্নত বলা হচ্ছে না?

কয়েক বছর আগের ঘটনা। তখনও শায়খ আলবানী মরহুমের কিতাব ***'ছিফাতুস সালাহ'*** *যার পুরো নাম-*

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها

-এর বাংলা তরজমা প্রকাশিত হয়নি, আমার কাছে একজন জেনারেল শিক্ষিত ভাই এসেছিলেন, যাকে বোঝানো হয়েছিল কিংবা তাদের বোঝানোর দ্বারা তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে, এই দেশের অধিকাংশ মুসলমান যে পদ্ধতিতে নামায পড়ে তা হাদীস মোতাবেক হয় না। তিনি আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে 'সুসংবাদ' দিলেন যে, আলবানী মরহুমের কিতাব বাংলায় অনুদিত হয়েছে! শীঘ্রই তা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে! জিজ্ঞাসা করলেন, এ কিতাব সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা আছে কি না! জানা নেই, তিনি মাসআলা জানার জন্য এসেছিলেন না 'হেদায়েত' করার জন্য। আমি শুধু এটুকু আরজ করেছিলাম যে, আপনি আপনার শিক্ষকদের কাছ থেকে তিন-চার জন সাহাবীর নাম নিয়ে আসুন যাদের নামায শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলবানী মরহুমের কিতাবে উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী ছিল! তিনি ওয়াদা করে গিয়েছিলেন, কিন্তু সাত-আট বছর অতিবাহিত হল আজও তাঁর দেখা পাইনি!

একটু চিন্তা করুন। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামাযের অন্য কিছু তাকবীরের মধ্যে রাফয়ে ইয়াদাইন করা যদি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ও অন্য কিছু সাহাবীর আমল হয়ে থাকে তাহলে রাফয়ে ইয়াদাইন না-করা তাঁর পিতা খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা-এর আমল। তদ্রূপ চতুর্থ খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা. ও প্রবীণ সাহাবীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা.সহ সাহাবীদের এক জামাত এই নিয়মেই নামায পড়েছেন। তো এদের মধ্যে কার নামাযকে আপনি খেলাফে সুন্নত বলবেন?

আমাদের যে বন্ধুরা শুধু রাফয়ে ইয়াদাইনকেই সুন্নত মনে করেন এবং রাফয়ে ইয়াদাইন না করাকে ভিত্তিহীন বা খেলাফে সুন্নত মনে করেন, তারা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে বলে থাকেন যে, ইমামের পিছনে জোরে ও আস্তে সব কিরাতের নামাযে মুকতাদীর জন্য ফাতিহা পড়া ফরয, না পড়লে নামায হবে না। কোনো কোনো কট্টর লোক তো এমনও বলে যে, ফাতিহা ছাড়া যেহেতু নামায হয় না তো যারা ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়ে না তারা সব যেন বে-নামাযী। আর বে নামাযী হল কাফির!! (নাউযুবিল্লাহ)

আমাদের এই বন্ধুরা কি চিন্তা করেছেন, যে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের রা. বর্ণনাকৃত হাদীস মোতাবেক তারা রফয়ে ইয়াদাইন করে থাকেন তিনিও তো ইমামের পিছনে কুরআন (ফাতিহা বা ফাতিহার সঙ্গে আরো কিছু অংশ) পড়তেন না! মুয়াত্তায় সহীহ সনদে এসেছে, তিনি বলেন–

إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ

'যখন তোমাদের কেউ ইমামের পিছনে নামায পড়ে তখন ইমামের কিরাতই তার জন্য যথেষ্ট। আর যখন একা পড়ে তখন সে যেন (কুরআন) পড়ে।'

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বিশিষ্ট শাগরিদ নাফে রাহ. তাঁর এই ইরশাদ বর্ণনা করে বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইমামের পিছনে পড়তেন না।' (মুয়াত্তা পৃ. ৮৬)

ওই বন্ধুদের 'নীতি' অনুযায়ী তো আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এরও নামায হত না! আর যখন তাঁর নামায হত না তখন রাফয়ে ইয়াদাইন বিষয়ে কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যাবে কি? কেননা (তাদের কথা অনুযায়ী আল্লাহ মাফ করুন) বেনামাযীর হাদীস কীভাবে গ্রহণ করা যাবে!

অথচ শরীয়তের দলীল দ্বারা ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত যে, তাঁর হাদীস অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তাহলে এটা কি প্রমাণ করে না যে, এ ধরনের বিষয়ে কারো নিন্দা-সমালোচনা করা কিংবা গোমরাহ ও ফাসেক আখ্যা দেওয়া নাজায়েয ও অবৈধ?

আমীন জোরে বলা হবে না আস্তে–এ নিয়ে আমাদের এই বন্ধুরা ঝগড়া-বিবাদ করে থাকেন। হাদীস ও আছারের গ্রন্থসমূহ তারা যদি সঠিক পন্থায় অধ্যয়ন করতেন তবে জানতে পারতেন যে, সুফিয়ান ছাওরী রাহ., যাঁর রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের ভিত্তিতে এরা জোরে আমীন বলে থাকেন স্বয়ং তিনিই আমীন আস্তে বলতেন। (আলমুহাল্লা, ইবনে হায্‌ম ২/৯৫)

যদি বিষয়টা 'সুন্নাহর বিভিন্নতা' না হত কিংবা অন্তত 'মুজতাহাদ ফীহ' না হত তাহলে এই প্রশ্ন কি আসত না যে, যে ব্যক্তি নিজের রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের উপর নিজেই আমল করে না তার রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণগ্রহণ জায়েয কি না?

এভাবে অন্যান্য বিষয়েও যদি চিন্তা করতে থাকেন তাহলে এইসব ক্ষেত্রে সাহাবা-যুগ থেকে চলে আসা মতভেদ আপনাকে বিচলিত করবে না। আর একে বিবাদ-বিসংবাদের মাধ্যম বানানোর প্রবণতাও দূর হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

আমরা সবাই জানি যে, সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন ইসলামী শহরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। যে শহরে যে সাহাবী অবস্থান করছিলেন তাঁর নিকট থেকেই ওই শহরের অধিবাসীরা দ্বীন ও ঈমান এবং কিতাব ও সুন্নাহর ইলম অর্জন করেছেন। ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি ও জীবনযাপনের আহকাম ও বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন। যেসব অঞ্চলে ইসলাম সাহাবায়ে কেরামের পরে প্রবেশ করেছে কিংবা ইসলামের ব্যাপক প্রচার সাহাবায়ে কেরামের পরে হয়েছে সেখানকার লোকেরা তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীনের কাছ থেকে এই বিষয়গুলো শিখেছেন কিংবা ওই সব দায়ী ইলাল্লাহ, মুজাহিদীন ও মুয়াল্লিমীনের কাছ থেকে, যাদের মাধ্যমে ওই অঞ্চলে ইসলামের প্রচার প্রসার হয়েছে।

শরীয়তের অনেক বিধিবিধানের মধ্যে যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের যুগেই মতভেদ হয়েছে, যা ধারাপরম্পরায় পরবর্তীতেও বিদ্যমান ছিল তাই এটাই স্বাভাবিক যে, প্রত্যেক ইসলামী শহরে নামায ইত্যাদির পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিন্ন হবে না। ওই বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে পূর্বের ভিন্নতা বিদ্যমান থাকবে।

এই উপমহাদেশে যেই দায়ী ইলাল্লাহ, মুজাহিদীন, মুয়াল্লিমীন ও আওলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে ইসলামের ব্যাপক প্রচার হয়েছে তারা ফিকহে হানাফী অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করতেন, ফিকহে হানাফীর সহযোগিতায় কুরআন ও সুন্নাহর বিধিবিধান পালন করতেন। এজন্য এই অঞ্চলে নামাযের ঐ পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে, যা ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর ফকীহ ও মুহাদ্দিস শাগরিদগণ ফিকহের গ্রন্থাদিতে সংকলন করেছেন, যার ভিত্তি হল কুরআন ও সুন্নাহ, এরপর হাদীস ও আছার এবং যার ভিত্তি হল ওই 'আমলে মুতাওয়ারাছ' বা ব্যাপক কর্মধারা, যা ইরাকে অবস্থানকারী হাজারেরও অধিক সাহাবায়ে কেরামের সূত্রে তাঁদের কাছে পৌঁছেছিল।

যেহেতু সালাফের নীতি এই ছিল যে, যেসব মাসআলায় একাধিক পন্থা দলীল দ্বারা প্রমাণিত তাতে যে এলাকায় যে পন্থা প্রচলিত, সে এলাকার জনগণকে ঐ পন্থা অনুযায়ীই আমল করতে দেওয়া উচিত, এজন্য উলামায়ে কেরাম এসব অঞ্চলে অন্য কোনো পন্থা প্রচার করার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু কিছু অপরিণামদর্শী মানুষ, দ্বীনের সাধারণ রুচি ও মেযাজের সাথে যাদের পরিচয় ছিল না, রেওয়ায়েতের ইলম ছিল কিন্তু তাফাক্কুহ ফিদ্দীন পর্যাপ্ত ছিল না, তারা এই সূক্ষ্ম বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেননি। তাই তারা এক মাসনূন তরীকাকে অন্য মাসনূন তরীকার দ্বারা, এক মুবাহ তরীকাকে অন্য মুবাহ তরীকার দ্বারা এবং এক মুজতাহাদ ফীহ মতকে অন্য মুজতাহাদ ফীহ মতের দ্বারা খণ্ডন করার মধ্যে ছওয়াব

অন্বেষণ করেছেন। তদ্রূপ অন্য মতটিকে (যার ভিত্তিও দলীলের উপর) বাতিল বলে দেওয়াকে ছওয়াবের কাজ বলে মনে করেছেন। ফলে বিবাদ-বিসংবাদের সূত্রপাত হয়েছে, যা নিশ্চিতভাবে হারাম। আর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে, যার বিষফল আজও মুসলমানদেরকে ভুগতে হচ্ছে। অথচ আমরা এ থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করিনি। আমরা এই বিভিন্নতার বিষয়গুলোতে 'ই' এর পরিবর্তে 'ও' অবলম্বন করতে পারিনি!

যেখানে রাস্তা শুধু একটি সেখানে তো আমরা 'ই' বলব যেমন 'ইসলামই আমার দ্বীন। ইসলামই হক্ক ও আল্লাহর কাছে মকবুল দ্বীন।' 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ-এর পথই সঠিক। কিন্তু যেখানে সুন্নাহর বিভিন্নতা, মুবাহের বিভিন্নতা এবং একাধিক সম্ভাবনার অবকাশযুক্ত মুজতাহাদ ফীহ বিষয়ের প্রশ্ন সেখানে 'ই' অবলম্বনের কী অর্থ? এখানে তো বলতে হবে–'ও'। অর্থাৎ এটাও সঠিক ওটাও সঠিক। কোনোটাই খেলাফে সুন্নত নয়।

আজকাল বেমক্কা 'ই' ব্যবহারের ব্যাধি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। দ্বীনের প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য নানা অঙ্গনে খিদমতের প্রয়োজন রয়েছে। অথচ কারো একার পক্ষে সব খিদমত আঞ্জাম দেওয়া কখনও সম্ভব নয়। এজন্য কর্মবন্টনের বিকল্প নেই। এতদসত্ত্বেও দেখা যায়, খাদিমে দ্বীনের বিভিন্ন শ্রেণী, যারা পরস্পর একে অন্যের সতীর্থ, এদেরই কমসমঝ লোকেরা নিজেদেরকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ মনে করে থাকে। আমাদের আকাবির বলতেন, 'সতীর্থ হও, প্রতিপক্ষ হয়ো না।' যেখানে সতীর্থতা কাম্য সেখানে যদি প্রতিপক্ষতার নীতি গ্রহণ করা হয় তবে তো বিবাদ-বিসংবাদের সূত্রপাত ঘটবেই।

দশ.

এখান থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, হাদীস অনুযায়ী আমল করারও নির্ধারিত পন্থা রয়েছে। এই পন্থার বাইরে গেলে তা আর হাদীস অনুসরণ থাকে না, যা শরীয়তে কাম্য। ইত্তেবায়ে সুন্নতেরও মাসনূন পদ্ধতি রয়েছে। ঐ পদ্ধতি পরিহার করে সুন্নতের অনুসরণ করতে গেলে তা একটা অসম্পূর্ণ ও সংশোধনযোগ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

কেউ যদি রাফয়ে ইয়াদাইনের সুন্নত অনুযায়ী আমল করে তবে এতে অসুবিধার কী আছে? শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের লোকেরাও তো এই সুন্নত মোতাবেক আমল করে থাকেন। হারামাইনের অধিকাংশ ইমাম হাম্বলী

মাযহাবের সাথে যুক্ত। তারাও এই সুন্নতের উপর আমল করে থাকেন। কিন্তু তারা তো রাফয়ে ইয়াদাইন না-করার সুন্নতকে প্রত্যাখ্যান করেন না। যারা এই সুন্নত অনুযায়ী আমল করেন তাদের সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হন না, তাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জবাজি, লিফলেটবাজি করেন না। তারা অন্যের নামাযকে বাতিল বলা তো দূরের কথা খেলাফে সুন্নতও বলেন না। তারা হাদীস অনুসরণের ক্ষেত্রে নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির উপর নির্ভর না করে 'আহলুয যিকর' ফিকহের ইমামগণের উপর নির্ভর করেন।

এখানে ঐ ঘটনাটি উল্লেখ করা যায়, যা হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ.-এর মালফূযাতে রয়েছে। ঘটনার সারসংক্ষেপ এই যে, এক জায়গায় আমীন জোরে বলা নিয়ে হাঙ্গামা হয়ে গেল এবং বিষয়টা মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়াল। ঘটনার তদন্তের জন্য যাকে দায়িত্ব দেওয়া হল তিনি তদন্ত শেষে রিপোর্ট লিখলেন যে, 'আমীন বিলজাহর' অর্থাৎ আমীন জোরে বলা হাদীস শরীফে আছে এবং মুসলমানদের এক মাযহাবে তা অনুসরণ করা হয়। তদ্রূপ 'আমীন বিছছির' অর্থাৎ আস্তে আমীন বলাও হাদীস শরীফে আছে আর মুসলমানদের এক মাযহাবে তা অনুসৃত। আরেকটি হল 'আমীন বিশশার' অর্থাৎ হাঙ্গামা সৃষ্টির জন্য উচ্চ আওয়াজে আমীন পাঠ। এটা উপরোক্ত দুই বিষয় থেকে ভিন্ন। প্রথম দুই প্রকার অনুমোদিত আর তৃতীয়টা নিষিদ্ধ হওয়া চাই।–মালফূযাতে হাকীমুল উম্মত, খণ্ড : ১, কিসত : ২, পৃষ্ঠা : ২৪০-২৪১; খণ্ড : ২, কিসত : ৫, পৃষ্ঠা : ৫০৬, প্রকাশনা দেওবন্দ

বলাবাহুল্য, আস্তে আমীন বলাকে ভুল বা হাদীস পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে একমাত্র নিজেদেরকে সুন্নতের অনুসারী দাবি করে উচ্চ স্বরে আমীন পাঠ বস্তুত ঐ আমীন বিলজাহর নয়, যা হাদীস শরীফে এসেছে এবং সালাফে সালেহীনের এক জামাত যার অনুসরণ করতেন।

এগার.

ব্যক্তি ও সমাজের সংস্কার-সংশোধনের জন্য করণীয় বিষয় ছিল বেনামাযীদেরকে উৎসাহ দিয়ে নামাযী বানানো এবং অজ্ঞতা বা উদাসীনতার কারণে যারা এমন সব ভুল করেন যার কারণে নামায মাকরূহ বা খেলাফে সুন্নত হয়ে যায় বরং কখনও কখনও ওয়াজিব পর্যন্ত ছুটে যায় এমন লোকদের সংশোধনের চেষ্টা করা। আমাদের পূর্বসূরীরা এদিকেই মনোযোগ দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের কোনো কোনো বন্ধুর চিন্তা ও মনোযোগের সিংহভাগ ব্যয় হয় এমন কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে, যেসব

বিষয়ে এ অঞ্চলের লোকেরাও সুন্নাহরই অনুসারী। যে পন্থায় তারা নামায আদায় করেন তাও শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং নবীযুগ ও সাহাবা-যুগ থেকে অনুসৃত। তারা এক সুন্নাহকে ভুল সাব্যস্ত করে লোকদেরকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলেন আর একে এত বড় ছওয়াবের কাজ মনে করলেন যে, এর স্বার্থে সব ধরনের কলহ-বিবাদ এবং ফিতনা-ফাসাদকে খুশির সাথে মঞ্জুর করে নিলেন!

এদের ডাকে আমাদের যেসব ভাই সাড়া দিয়ে থাকেন তাদের কর্তব্য ছিল আলিমদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যে, আপনাদের অনুসরণে আমরা যে নামায পড়ছি, কিছু লোক বলে, এই নামায হাদীস পরিপন্থী, সুন্নাহ পরিপন্থী। তাদের এইসব কথা কি ঠিক? কিন্তু অনেক সরলমনা বা অতিউৎসাহী মানুষ কোনোরূপ অনুসন্ধান ছাড়াই তাদের দাওয়াত গ্রহণ করে নেন; তারা নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করতে আরম্ভ করেন, আস্তে আমীন বলা ছেড়ে জোরে আমীন বলতে থাকেন। আর শুধু এই পর্যন্ত সীমিত থাকলেও বলার কিছু ছিল না। কেননা এগুলোও মাসনূন বা মোবাহ তরীকা। কিন্তু তারা আমল পরিবর্তনের সাথে সাথে অদ্ভুত কিছু ধ্যান-ধারণা ও কাজ কর্মও আরম্ভ করেন।

তারা রফয়ে ইয়াদাইন এজন্য আরম্ভ করেননি যে, এটাও মাসনূন বা মোবাহ; বরং তারা মনে করেন যে, এটাই একমাত্র সুন্নাহ আর রফয়ে ইয়াদাইন না করা সুন্নাহর পরিপন্থী, এতদিন তারা সুন্নাহ বিরোধী কাজ করেছেন এবং এখনও যারা রাফয়ে ইয়াদাইন ছাড়া নামায পড়ছে তারা সুন্নাহবিরোধী কাজই করে চলেছেন। সুতরাং তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে 'জিহাদ' করা জরুরি!

এমনকি তারা এই ধারণাও পোষণ করেন যে, নাউযুবিল্লাহ, এ অঞ্চলের আলিমরা হয়তো কুরআন-হাদীসের কোনো প্রকার জ্ঞান রাখে না, কিংবা মাযহাবকে হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে!

বলাবাহুল্য, এই কুধারণা তাদেরকে নিন্দা-সমালোচনা, কটুবাক্য ব্যবহার, এমনকি গালিগালাজ পর্যন্ত করিয়ে ছাড়ে। ফিকহ-ফুকাহা ও আইম্মায়ে দ্বীনের অনুসারীদের সম্পর্কে কটুবাক্য, গালিগালাজ, তাদেরকে গোমরাহ-ফাসিক এমনকি কাফের পর্যন্ত আখ্যা দেওয়াও গোপন কোনো বিষয় নয়।

দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত বন্ধুদের মাঝে এইসব ভ্রান্ত ধারণার বিস্তার ঘটতে বেশি দেখা যায়। হাদীসের দু'চারটি কিতাবের অনুবাদ পড়ে তারা ভাবতে থাকেন, হাদীস ও সুন্নাহর

বিষয়ে তাদের গবেষণার যোগ্যতাও অর্জিত হয়েছে। তারা যদি শুধু এটুকু চিন্তা করতেন, আমি সম্পূর্ণরূপে অনুবাদের উপর নির্ভর করছি। আমার তো এটুকুও বোঝার যোগ্যতা নেই যে, এই অনুবাদ যিনি করেছেন তিনি কি সঠিক অনুবাদ করেছেন না ভুল। আর যেসব কিতাবের অনুবাদ হয়নি সেসব কিতাবের হাদীস সম্পর্কে তো আমার জানা নেই। অনূদিত গ্রন্থগুলোও কি আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলেছি? এক বিষয়ের সকল তথ্য কি সংগ্রহ করেছি? সংগ্রহ করলেও শুধু সেগুলোর তরজমা জানাই কি সঠিক বিষয় অনুধাবন ও আমলের জন্য যথেষ্ট?

যেখানে বিভিন্ন ধরনের দলীল রয়েছে সেখানে আমলের আগে এমন অনেক পর্যায় অতিক্রম করে আসতে হয়, যা শুধু ইজতিহাদ ও তাফাক্কুহ-র মাধ্যমেই অতিক্রম করা সম্ভব। ঐসব ক্ষেত্রে ফকীহ ও মুজতাহিদের সহযোগিতা গ্রহণ না করার অর্থই হল, তিনি এ পর্যায়গুলোকে স্বেচ্ছাচারিতা ও নীতিহীনভাবে অতিক্রম করতেই আগ্রহী কিংবা নিজের পছন্দের কোনো আলিমের তাকলীদ করে ফিকহের ইমাম ও খাইরুল কুরূনের ইমামদের যারা অনুসারী তাদের উপর আপত্তি করতে আগ্রহী।

এই বন্ধুদের প্রতি আমার অনুযোগ, এই অসম্পূর্ণ জানার উপর ভিত্তি করে আপনারা কীভাবে 'সিদ্ধান্ত' দেন? তদ্রূপ 'তাকলীদী ইলম' অর্থাৎ যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনি সম্পূর্ণরূপে অন্যের উপর নির্ভরশীল তার ভিত্তিতে গবেষকসুলভ বা মুজতাহিদসুলভ সিদ্ধান্ত কীভাবে দেন? এত অসংখ্য উলামা-মাশায়েখের বিপরীতে আপনি এক নতুন দাওয়াতে এত সহজে সাড়া দিয়ে দিলেন! তাদের প্রতি আপনার যদি এত আস্থা জন্মে থাকে তাহলে আজ পর্যন্ত যাদের কাছ থেকে দ্বীন শিখেছেন, কিংবা যাদেরকে দেখে নামায শিখেছেন তাদের প্রতিই বা এত অনাস্থা ও কুধারণা কেন?

তাদের মধ্যে কি এটুকু ঈমানী জযবা নেই যতটুকু আপনার মধ্যে আছে? এতটুকু নবীপ্রেম নেই যতটুকু আপনার মনে আছে?!

আপনি কি কখনও তাদের কাছে নামাযের ঐ পদ্ধতি সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের দলীল জিজ্ঞাসা করেছেন, যাকে আপনি ভুল ঘোষণা করেছেন?

একবার আমার একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ফোন করলেন। তিনি মূলত জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ, কিন্তু একই সঙ্গে উলামা-মাশায়েখের সোহবত-সাহচর্যও লাভ করেছেন। তিনি বললেন, অমুক (একজন জেনারেল শিক্ষিত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা) আসতে চান, কিছু বিষয়ের দলীল দেখার জন্য। এরপর বললেন, তিনি যদি দলীল শোনার জন্য বা দলীল জানার জন্য বলতেন তাহলেও একটা কথা ছিল, কিন্তু তিনি বলেছেন, দলীল দেখতে চান!

দেখুন, তিনি তো এই দুই বাক্যের সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন কিন্তু ওইসব লোকদের তো এ সম্পর্কে কোনো খবরই নেই। এরপরও সৌভাগ্য যে, দলীল দেখতে চেয়েছেন, এর আগেই যদি কোনো 'সিদ্ধান্ত' দিয়ে দিতেন তাহলেই বা কী করার ছিল?

এই ভাইদের কাছে আমার শেষ কথা এই যে, আপনি যে প্রথম পদ্ধতিটি ত্যাগ করেছেন কেন ত্যাগ করেছেন? সেটি কি ভুল ছিল? ভুল হওয়ার দলীল কী? কিংবা দুটোই সঠিক? তাহলে একটা ছেড়ে অন্যটা ধরার কী অর্থ? কিংবা একটির তুলনায় অন্যটি অগ্রগণ্য? প্রশ্ন হল, কীসের ভিত্তিতে আপনি এটা চিহ্নিত করলেন?

আমার সবিনয় অনুরোধ, আমরা হাদীসের কিতাব পড়ব, কিন্তু লক্ষ্য রাখব, যে হাদীসগ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য উলূমুল হাদীস ও ইলমু উসূলিল ফিকহের অসমান্য জ্ঞানের প্রয়োজন হয় সেসব কিতাবের শুধু অনুবাদ না পড়ে কোনো বিজ্ঞ আলেমের কাছে সবকে সবকে পড়ে নেব কিংবা এ শাস্ত্রগুলো যথানিয়মে আগে শিখে নেব।

বার.

যদি সাধারণ মানুষের কাছে উলামা-মাশায়েখের আমলের বিপরীত কোনো দাওয়াত পৌঁছে তাহলে তাদের জন্য যা করণীয় তা এই যে, তারা পরিষ্কার বলে দিবেন, ভাই, আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের নিজেদের পক্ষে গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা সম্ভব নয়, আপনাদের কথা যদি মানতে হয় তাহলে আপনাদের উপরই নির্ভর করে মানতে হবে, সেক্ষেত্রে ওলামা-মাশায়েখের কথার উপর নির্ভর করতে অসুবিধা কী?

আর যদি এ বিষয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতেই হয় তাহলে তার পদ্ধতি এই :

কেউ যদি আপনাকে বলে, (উদাহরণস্বরূপ) ভাই, তুমি যে রাফয়ে ইয়াদাইন করছ না-এ তো হাদীস বিরোধী! আপনি আদবের সঙ্গে বলুন, সব হাদীসের বিরোধী, না রফয়ে ইয়াদাইন না-করারও কোনো হাদীস আছে? তারা বলবে, হ্যাঁ, হাদীস তো কিছু আছে, কিন্তু সব জয়ীফ বা ভিত্তিহীন। আপনি প্রশ্ন করুন, এটা কি আপনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, না হাদীস বিশারদদের ফয়সালা? এরপর সব হাদীস-বিশারদের ফয়সালা, না তাঁদের কারো কারো? একজন ইমামও কি রফয়ে ইয়াদাইন না-করার হাদীসকে 'সহীহ' বলেননি? যদি তার মধ্যে সততা থাকে তাহলে বলতে বাধ্য হবে যে, জ্বী, একাধিক ইমাম ঐ হাদীসকেও সহীহ বলেছেন।

আপনি বলুন, আমার জন্য এই যথেষ্ট। যখন সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের একটি জামাত রাফয়ে ইয়াদাইন না-করার হাদীস মোতাবেক আমল করেছেন তো আপনি তার বিশেষ কোনো সনদকে জয়ীফ বললে কী আসে যায়? সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসা এবং উম্মাহর উলামা-মাশায়েখের মাঝে স্বীকৃত বিষয়কে শুধু সংশ্লিষ্ট একটি হাদীসের সনদের দুর্বলতা দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ করা কি মারাত্মক ভুল নয়!

আর সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল, আপনি তাকে হিকমতের সাথে কোনো বিশেষজ্ঞ আলিমের কাছে নিয়ে যাবেন, যার হাদীস ও সীরাতের কিতাবসমূহের উপর এবং ফিকহে মুদাল্লাল ও ফিকহে মুকারানের কিতাবসমূহের উপর দৃষ্টি রয়েছে। ইনশাআল্লাহ সকল ভুল ধারণার অবসান ঘটবে এবং কটুকথা, নিন্দা-সমালোচনার ধারাও বন্ধ হবে।

তের.

যারা খতীব বা মুদাররিস-এর দায়িত্বে রয়েছেন কিংবা দ্বীনী বিষয়ে সাধারণ মানুষ যাদের শরণাপন্ন হয় তাদের খিদমতে নিবেদন, যদিও আম মানুষ ও জেনারেল শিক্ষিত মানুষের পক্ষে দলীল ও দলীল দ্বারা দাবি প্রমাণের পদ্ধতি বোঝা কঠিন তবুও তাদেরকে এই প্রশ্ন না করাই ভালো যে, দলীল জানতে চাওয়ার অধিকার তাদের আছে কি না। বরং রাহমাতান বিইবাদিল্লাহ তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করুন এবং অনুগ্রহপূর্বক তাদের কথাবার্তা–যদিও তা উল্টাসিধা হোক না কেন–শুনুন। তারা যদি দলীল জানতে চায় তাহলে অন্তত দু'একটি স্পষ্ট দলীল তাদেরকে জানিয়ে দিন। তবে এর জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। আপনাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি অধ্যয়ন করতে হবে এবং সকল বিষয়ের সর্বাধিক সহজ ও সবচেয়ে বিশুদ্ধ দলীল সহজভাবে উপস্থাপনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

সাথে সাথে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখুন যে, এ সকল ইখতিলাফী বিষয়ে অন্যরা যেমন প্রান্তিকতার শিকার আপনি যেন তা না হন। যেমন আপনি বলবেন না, রাফয়ে ইয়াদাইন মানসূখ হয়ে গেছে; বরং বলুন, রাফয়ে ইয়াদাইন আছে, কিন্তু রাফয়ে ইয়াদাইন না করার সুন্নাহ আমাদের ইমামের দৃষ্টিতে অগ্রগণ্য। আপনি অন্যের রফয়ে ইয়াদাইন করা ও জোরে আমীন বলার উপর আপত্তি করবেন না, তেমনি আপনার মুসল্লিদেরকেও তাদের সাথে ঝগড়া করার অনুমতি দিবেন না। নতুবা

আপনার ও তাদের অবস্থা এক হয়ে যাবে। আপনি তাদেরকে হিকমতের সাথে বোঝান যে, 'আপনাদের তো এক সুন্নাহ থেকে অন্য সুন্নাহর দিকে বা অন্য মোবাহ তরীকার দিকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আর যদি যেতেই হয় তাহলে অন্যকে হাদীসবিরোধী মনে করার কোনো সুযোগ নেই। তেমনি এই চিন্তারও সুযোগ নেই যে, আহা! এতদিন পর হেদায়েত পেলাম! আর অন্যের সাথে কলহ-বিবাদের তো প্রশ্নই আসে না। সেটা যদি করেন তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি সুন্নাহ পরিপন্থী রাস্তায় চলে গেলেন! অথচ যে বিষয়ে তাদের সাথে বিবাদে অবতীর্ণ হবেন তাতে তারা সুন্নাহর উপর আছেন। তাহলে কী লাভ হল? আপনি এমন একটি সুন্নতের সমর্থন করতে গিয়ে, যার বিপরীতটিও সুন্নাহ, এমন পথ অবলম্বন করলেন, যা সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে সুন্নাহ পরিপন্থী!!' এভাবে খুলে খুলে এবং দলিলের সাথে বোঝান। ভর্ৎসনা উচিতও নয়, ফায়েদাও নেই।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফুরূয়ী ইখতিলাফের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ির কারণ

ফুরূয়ী ইখতিলাফের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ির কারণ

সব যামানার আলিমগণ ফুরূয়ী বা শাখাগত মাসাইলের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে যে ভারসাম্যপূর্ণ কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন বর্তমান মুসলিমসমাজে, বিশেষত এ উপমহাদেশে তা মর্মান্তিকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। সম্প্রীতি, উদারতা ও নম্রতার পরিবর্তে এ ধরনের মতভেদের ক্ষেত্রগুলোতে বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করা হচ্ছে। এর কারণ কী? এ বিষয়েও আলিমগণ লিখেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়েও কিছু আলোকপাত করা মুনাসিব মনে হচ্ছে।

বাড়াবাড়ির কারণ অনেক। আমি এখানে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করব ইনশাআল্লাহ।

১. একমুখী অধ্যয়ন ও অসম্পূর্ণ অধ্যয়ন

ইখতিলাফী বিষয়ে যিনি মত প্রকাশ করতে চান, নিজের পথ ও পন্থার দিকে আহ্বান করতেই চান এবং অন্যের পথ ও পন্থার উপর আপত্তি করতেই চান তার প্রথম কর্তব্য, বিষয়টি গভীরভাবে অধ্যয়ন করা । এ বিষয়ে পক্ষে বিপক্ষে যা কিছু লেখা হয়েছে তা গভীর মনযোগ ও পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠার সাথে অধ্যয়ন করা। কিন্তু দেখা যায়, এ ক্ষেত্রে আমরা চরম উদাসীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের অধ্যয়ন একমুখী। সেও অসম্পূর্ণ পরনির্ভর অধ্যয়ন। অথচ এ অধ্যয়নের ভিত্তিতে আমরা মত প্রকাশ করে থাকি সম্পূর্ণ মুহাক্কিক; বরং মুজতাহিদসুলভ ভঙ্গিতে!

কিছু উদাহরণ

১. অতি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে দেওয়া হয় যে, 'বিতরের নামায তিন রাকাত পড়া ভিত্তিহীন। কিংবা তা কেবল জয়ীফ হাদীসে আছে!'

অথচ একাধিক সহীহ হাদীস, অনেকগুলো আছারে সাহাবা এবং মুহাজির ও আনসার সাহাবাগণের কর্মগত ইজমার দ্বারা তিন রাকাত বিতরের পদ্ধতি প্রমাণিত।

আরো বলা হয় যে, 'তিন রাকাত যদি পড়তে হয় তাহলে দ্বিতীয় রাকাতে বসবে না। তিন রাকাত এক জলসায় পড়বে!'

যারা এ ধরনের কথা বলেন তারা যদি বিতরের প্রসঙ্গটি 'শরহু মাআনিল আছার' ও 'শরহু মুসকিলিল আছার' থেকেও অধ্যয়ন করতেন এবং নসবুর রায়ার হাশিয়া 'বুগয়াতুল আলমায়ী' ও 'কাশফুস সিত্‌র আন মাসআলাতিল বিত্‌র' (মাওলানা মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি) পাঠ করতেন, অন্তত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী রাহ.-এর কিতাব "ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুসতাকীম" থেকেই পাঠ করতেন তাহলেও তাদের এ ধরনের কথা বলতে দ্বিধা হত।

যেখানে সহীহ মুসলিমসহ অনেক হাদীসের কিতাবে সহীহ হাদীসে এই সাধারণ মূলনীতি বলা হয়েছে যে, 'নামাযের প্রতি দুই রাকাতে আত্তাহিয়্যাতুর বৈঠক আছে' সেখানে দলীল ছাড়া এই ফতোয়া দেওয়ার দুঃসাহস কীভাবে হয়, উপরন্তু হাদীস অনুসরণের নামে?!

'বিতরের নামাযকে মাগরিবের মত বানিও না'–এই হাদীসের পূর্বাপর না দেখেই কেউ ব্যাখ্যা করেছে, 'বিতরের নামাযে প্রথম বৈঠক করবে না, করলে সালাম ফেরাও।' এরপর এ ব্যাখ্যারই তাকলীদ করা হচ্ছে। অথচ এ হাদীসের ব্যাখ্যাও হাদীসের মধ্যেই আছে। তা হচ্ছে বিতরের আগে দু' চার রাকাত নফল নামায অবশ্যই পড়বে। মাগরিবের মত শুধু তিন রাকাত পড়বে না। দেখুন : শরহু মাআনিল আছার ও হাশিয়া নাসবুর রায়া।

দুই জলসা ও এক সালামে তিন রাকাত বিতর সম্পর্কে হাদীস ও আছারের দলিল জানার জন্য মাসিক আলকাউসারের জুমাদাল উলা '৩১ হি. (মে '১০ ঈ.) সংখ্যা থেকে যিলকদ-যিলহজ্ব '৩১ হি. (নভেম্বর '১০ ঈ.) পর্যন্ত সংখ্যাগুলো দেখা যায়।

২. বলা হয়ে থাকে, 'কুনূতের বিভিন্ন দুআ আছে তবে اللهم إنا نستعينك দুআটি নেই।' অথচ তা মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১০৫-১২০); মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা (খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫১৮, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ৩৪০-৩৪৪); কিয়ামুল লায়ল, মুহাম্মাদ ইবনে নাসর আলমারওয়াযী (পৃষ্ঠা : ২৯৬-৩০২) এবং আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকীসহ (খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২১০) একাধিক হাদীসের কিতাবে আছে। আদ্দুররুল মানসুরের পরিশিষ্টেও কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া আছে।

৩. বলা হয়ে থাকে, 'দুআ কুনূতের আগে তাকবীরের দলীল হাদীসের কিতাবে নেই।' অথচ 'শরহু মুশকিলিল আছার' তাহাবীতে (খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৬৫-৩৭৮) দুইজন বড় সাহাবীর আমল বর্ণিত হয়েছে।

৪. বলা হয়ে থাকে, 'মেয়েদের নামাযের পদ্ধতিও পুরুষের মতোই। উভয়ের নামাযের পদ্ধতি আলাদা হওয়ার কথা ভিত্তিহীন। এটা শুধু হানাফিদের মাযহাব।'

অথচ বাস্তবতা এই যে, নারী-পুরুষের নামায আদায়ের পদ্ধতি অভিন্ন হওয়ার বিষয়ে আমাদের জানা মতে কোনো দ্ব্যর্থহীন সহীহ হাদীস বা আছার নেই। অথচ কিছু সাহাবী ও অনেক তাবেঈ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের নামাযের পদ্ধতি আলাদা হওয়া প্রমাণিত। একটি মারফূ মুরসাল হাদীসও আছে, যাকে একাধিক আহলে হাদীস আলিম শাওয়াহিদ ও সমর্থক বর্ণনার কারণে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। এ প্রসঙ্গে নবাব সিদ্দিক হাসান খানের "আউনুল বারী"ও দেখা যেতে পারে (খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫২০, দারুর রশীদ হলব, সুরিয়া; খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৮৪-১৮৫, দারুন নাওয়াদির, বৈরুত, হাদীস : ২৫২)

এরপর তা শুধু হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত নয়, চার মাযহাবের ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত। আহলে হাদীস আলেমদেরও অনেকে এই ফতোয়া দিয়েছেন। কেউ কেউ এ বিষয়ে আলাদা পুস্তিকাও লিখেছেন।
যেমন দেখুন, মাওলানা আবদুল হক হাশেমী মুহাজিরে মক্কী-এর পুস্তিকা–

نصب العمود في تحقيق مسألة تجافي المرأة في الركوع والسجود والقعود

এ বিষয়ে মাসিক আলকাউসারের রবিউস সানী '২৬ হিজরী (জুন '০৫ ঈ.) সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি নবীজীর নামায (মাকতাবাতুল আশরাফ বাংলাবাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত)-এর পরিশিষ্টেও যুক্ত হয়েছে।

আমি শুধু ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন–

وقد أدب الله تعالى النساء بالاستتار وأدبهن بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحب للمرأة أن تضم بعضا إلى بعض، وتلصق بطنها بفخذيها وتسجد كأسترما يكون لها، وهكذا أحب لها في الركوع والجلوس وجميع الصلاة أن تكون فيها كأستر ما يكون لها.

আল্লাহ তাআলা মহিলাদেরকে পুরোপুরি আবৃত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর রাসূলও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুরূপ শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আমার নিকট পছন্দনীয় হল, সিজদা অবস্থায় মহিলারা এক অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গকে মিলিয়ে রাখবে, পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং সিজদা এমনভাবে করবে যাতে সতরের পূর্ণ হেফাযত হয়। অনুরূপ রুকু, বৈঠক ও গোটা নামাযে এমনভাবে থাকবে যাতে সতরের পুরাপুরি হেফাযত হয়।–কিতাবুল উম্ম, শাফেয়ী ১/১৩৮

ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর বক্তব্যটি যেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বাণীরই ব্যাখ্যা। নারীর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন–تجتمع وتحتفز খুব জড়সড় হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামায আদায় করবে।–মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ২৭৯৪

৫. বলা হয়ে থাকে, 'বুকের উপর হাত বাঁধার কথাই সহীহ হাদীসে আছে আর তা বুখারীর হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত।' অথচ সহীহ বুখারীর কোনো হাদীস দ্বারা তা প্রমাণ হয় না। ইবনে খুযায়মার যে হাদীসে বুকের উপর হাত বাঁধার কথা আছে তাতে মুআম্মাল ইবনে ইসমাইল নামক একজন রাবী আছেন, যাকে স্বয়ং ইমাম বুখারী রহ. 'মুনকারুল হাদীস' বলেছেন।

পাঠকবৃন্দকে মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহর দুটি প্রবন্ধ পাঠ করার আবেদন করব, যা তিনি এ বিষয়েই লিখেছেন। দুটো প্রবন্ধই মাসিক আলকাউসার যিলহজ্ব '৩২ হি. (নভেম্বর '১১ হি.) ও মুহাররম '৩৩ হি. (ডিসেম্বর '১১ ঈ.) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

৬. বলা হয়ে থাকে, 'জোরে আমীন বলার হাদীস সহীহ বুখারীতে আছে।' অথচ সহীহ বুখারীতে ইমাম বুখারী শিরোনাম দিয়েছেন জাহর বা জোরে আমীনের, কিন্তু তাতে এমন একটি হাদীসও নেই, যাতে জাহরের কথা আছে।

ওখানে যে হাদীসগুলো আছে তাতে আমীন বলার ফযীলত উল্লেখিত হয়েছে এবং এ কথা আছে যে, ইমাম-মুকতাদী উভয়েরই আমীন বলা উচিত। কিন্তু জোরে বলার কথা নেই।

৭. বলা হয়ে থাকে, 'ইমামের পেছনে মুক্তাদির ফাতিহা পড়া ফরয–এই হাদীস সহীহ বুখারীতে আছে।' অথচ সহীহ বুখারীতে ইমাম বুখারী এ ধরনের শিরোনাম যদিওবা লিখেছেন, কিন্তু তাতে এমন কোনো হাদীস নেই, যাতে মুক্তাদিকে ফাতিহা পড়ার আদেশ করা হয়েছে।

হাঁ, لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (ফাতিহা ছাড়া কোনো নামায নেই) হাদীসটি আছে, কিন্তু এতে তো মুক্তাদির কথা নেই। এই হাদীসের ব্যাপকতায় মুক্তাদি শামিল কি না–তা একটি ইজতিহাদী বিষয়। ইমাম বুখারী ও কোনো কোনো ইমামের ইজতিহাদ অনুসারে মুক্তাদিও শামিল। আবার অন্য অনেক ইমামের মতে অনেক দলিলের ভিত্তিতে মুক্তাদির বিধান আলাদা।

৮. বলা হয়ে থাকে যে, 'তারাবী আট রাকাত হওয়ার দলীল সহীহ বুখারীতে আছে।' অথচ সহীহ বুখারীতে আছে 'সালাতুল লায়ল' সংক্রান্ত হাদীস। এর ব্যাখ্যা তারাবীর দ্বারা করা ঐসকল বন্ধুর নিজস্ব ইজতিহাদ। তাদের যুক্তি, তারাবী ও তাহাজ্জুদ একই নামাযের দুই নাম। এগারো মাসের তাহাজ্জুদ রমযান মাসে তারাবী হয়ে যায়। এই দাবীর পক্ষে তাদের কাছে কোনো আয়াত, হাদীস বা আছারে সাহাবা নেই। এটা তাদের একান্ত নিজস্ব ইজতিহাদ, যা ইমাম বুখারীর ইজতিহাদ থেকেও আলাদা।

ইমাম বুখারী রাহ. প্রথম রাতে তারাবী পড়তেন এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদ। তারাবীর প্রতি রাকাতে বিশ আয়াত পড়তেন এবং পুরা কুরআন খতম করতেন। এবার হিসাব করে দেখুন তারাবী যদি আট রাকাত করে পড়া হয় তাহলে প্রতি রাকাতে বিশ আয়াত করে পড়ে পুরা রমযানে, তা ত্রিশ দিনের হলেও, খতম করা সম্ভব কি না।

৯. যে বিনা ওজরে সময়মত ফরয নামায পড়েনি তার উপর কাযা জরুরি হওয়া স্বীকৃত ও সর্বজনবিদিত। এ বিষয়ে জুমহুর উম্মতের ইজমাও রয়েছে। কিন্তু অনেক বন্ধুকে অতি জোড়ালোভাবে বলতে দেখা যায়, 'ঐ ব্যক্তির কাযা আদায়ের বিধান নেই।' আমি মনে করি, এটা হাদীস অনুসরণের নামে শায ও বিচ্ছিন্ন মত এবং দলিলবিহীন; বরং দলিলবিরোধী মতামত প্রচার করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাদের খেদমতে আরজ, তারা যেন এই মাসআলা অন্তত ইমাম ইবনে আব্দিল বার (৪৬৩ হি.)-এর আলইসতিযকার কিতাবে (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ৩০০-৩০১, باب النوم عن الصلاة) পাঠ করেন। আর আদবের সাথে আরজ করব যে, এ বিষয়ে কি শুধু এ হাদীসটি যথেষ্ট নয়–

اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء

আল্লাহকে (তাঁর পাওনা) পরিশোধ কর। কারণ আল্লাহই সর্বাধিক হকদার (তাঁর) পাওনা পরিশোধের।

এবং فدين الله أحق أن يقضى

তাহলে আল্লাহর ঋণ তো পরিশোধের অধিক হকদার।

মাসিক আলকাউসারের উদ্বোধনী সংখ্যায় (মুহাররম ১৪২৬ হি., ফেব্রুয়ারি '০৫ ঈ.) এ বিষয়ে মাশাআল্লাহ একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

১০. কেউ তো চরম দুঃসাহস প্রদর্শন করে বলেছেন, 'বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা সম্পূর্ণ জায়েয।' তাদের দাবি, এটা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে কোনো সহীহ্ হাদীস নেই। অথচ

لا يمس القرآن إلا على طهر

(পবিত্র হওয়া ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না)—এই হাদীস শুধু সহীহই নয়, অর্থের দিক থেকে মুতাওয়াতির। আর এ বিষয়ে জুমহূর উম্মতের ইজমা আছে। ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. এ বিষয়েও সংক্ষেপে অতি সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। আলইসতিযকারে (খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা : ৯-১৩, باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن) তাঁর আলোচনাটি দেখে নেওয়া যায়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে হাযম রা.কে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে অন্য অনেক বিধানের সাথে এই বিধানও ছিল যে, অযুহীন কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না। পত্রের এ অংশ মুয়াত্তা মালিকেও রয়েছে। ইবনে আবদিল বার রাহ. এই পত্রখানা সম্পর্কে লেখেন—

وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل، وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر.

অর্থাৎ আলিমগণ আমর ইবনে হাযমের এই পত্র সাদরে বরণ করেছেন এবং এ অনুযায়ী আমল করেছেন। এটি তাঁদের কাছে এটি মুত্তাসিল সনদের চেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও প্রকাশিত। ইসলামী জনপদসমূহের ফতোয়ার স্তম্ভ যেসব ফকীহ (মুজতাহিদ) ও তাঁদের শীষ্যগণ তাঁরা একমত যে, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআনকে স্পর্শ করবে না।—আলইসতিযকার ৮/১০

মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ এ বিষয়েও মাশাআল্লাহ্ অতি উত্তম ও প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখেছে, যা আলকাউসারের সফর '২৭ হি. (মার্চ ২০০৬ ঈ.) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন এই প্রবন্ধগুলো অবশ্যই পাঠ করেন।

১১. কেউ কেউ রুকুর সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় রাফয়ে ইয়াদাইনের সুন্নতের উপর এত জোর দিয়েছেন যে, এই সুন্নতের সমর্থনে রাফয়ে ইয়াদাইন না করার (এইসব জায়গায় হাত না তোলার) সুন্নত

বাতিল করাকে জরুরি মনে করেছেন। তারা নির্দ্বিধায় বলে দিয়েছেন যে, রাফয়ে ইয়াদাইন না করার বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই; কোনো সাহাবী থেকেও এর কোনো প্রমাণ নেই। অথচ খলীফায়ে রাশেদ ওমর ইবনুল খাত্তাব রা., খলীফায়ে রাশেদ আলী ইবনে আবী তালিব রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.সহ কয়েকজন সাহাবী থেকে হাত না তোলার সুন্নত প্রমাণিত। অনেক তাবেয়ীর আমলও এটি ছিল।

জনৈক ব্যক্তি ইবরাহীম নাখায়ী রাহ.-এর সামনে ওয়াইল ইবনে হুজর রা.-এর হাদীস পেশ করেছিল যে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাফয়ে ইয়াদাইন করতে দেখেছেন। তখন ইবরাহীম নাখায়ী রাহ. বলেছিলেন, যদি ওয়াইল রা. (যিনি ছিলেন একজন আগন্তুক সাহাবী) একবার রাফয়ে ইয়াদাইন করতে দেখেন তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. (যিনি ছিলেন সফরে-হযরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদিম এবং ফকীহ সাহাবী) পঞ্চাশ বার রফয়ে ইয়াদাইন না করতে দেখেছেন।

(দেখুন : আলমুয়াত্তা, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, পৃষ্ঠা : ৯২; কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনা ইমাম মুহাম্মাদ ১/৭৫; শরহু মাআনিল আছার তহাবী ১/১৬১; নসবুর রায়াহ লি আহাদীসিল হিদায়া, জামালুদ্দীন যায়লায়ী ১/৩৯৭)

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত এবং আছারে সাহাবা শরীয়তের উল্লেখযোগ্য দলিল, বিশেষত নামাযের পদ্ধতির ক্ষেত্রে। উপরন্তু এ বিষয়ে সহীহ বা হাসান সনদে একাধিক মারফূ হাদীস রয়েছে।

মুসনাদে আহমদ ও জামে তিরমিযীতে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে যে মারফূ হাদীসটি আছে তাকে খোদ ইমাম তিরমিযী রাহ. 'হাসান' বলেছেন। ইবনে হাযম জাহেরী রাহ. 'সহীহ' বলেছেন। নিকট অতীতের মশহূর মুহাদ্দিস আহমদ শাকির রাহ. জামে তিরমিযীর হাশিয়ায় লিখেছেন−

هذا الحديث صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ وهو حديث صحيح، وما قالوا في تعليله ليس بعلة.

ইবনে হাযম এবং আরো কোনো কোনো হাফিযুল হাদীস এই হাদীসকে 'সহীহ' বলেছেন। আর একে 'মা'লূল' সাব্যস্ত করার জন্য আপত্তিকারীরা যা কিছু বলেছেন বাস্তবে সেগুলো ইল্লত নয়।−জামে তিরমিযী ২/৪১

১২. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে তাকবীর বিষয়ে এক মাসনূন তরীকা এই যে, অতিরিক্ত তাকবীর বারোটি । দ্বিতীয় মাসনূন তরীকা (যা আমাদের মতে অধিক শক্তিশালী), অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পর তিন তাকবীর, অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমাসহ চার তাকবীর। আর দ্বিতীয় রাকাতে কিরাআতের পর তিন তাকবীর, এরপর রুকুর তাকবীর, অর্থাৎ রুকুর তাকবীরসহ চার তাকবীর।

কোনো কোনো বন্ধুকে বলতে শোনা যায়, হাদীসে শুধু বারো তাকবীরের আমল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় তরীকা কোনো সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না। কেউ কেউ তো এমনও লিখেছেন যে, ঐ বিষয়ে কোনো হাদীসই নেই।

বুঝতে পারছি না, এ জাতীয় অবাস্তব দাবি সম্পর্কে কী বলা যায়। পাঠকবৃন্দকে শুধু এই অনুরোধ করব, তাঁরা যেন দ্বিতীয় মাসনূন তরীকার দলিল, হাদীস ও আছার জানার জন্য মাসিক আলকাউসার রমযান-শাওয়াল '২৬ হি. সংখ্যায় (২০০৫-এর ভলিউমে) প্রকাশিত ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর বিষয়ক প্রবন্ধটি মনোযোগের সাথে পাঠ করেন। প্রবন্ধটি মাকতাবাতুল আশরাফ, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'নবীজীর নামাযে'র পরিশিষ্টেও যুক্ত আছে।

এ ধরনের অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। নমুনা হিসাবে এগুলোই যথেষ্ট। এখানে দেখানো উদ্দেশ্য যে, অনেক বন্ধু এ সকল বিষয় এমনভাবে পেশ করে থাকেন যে, ফিকহে হানাফীর অনুসারীদের কাছে এসব বিষয়ে কোনো দলীল নেই। পক্ষান্তরে তাদের কাছে আছে প্রচুর সহীহ হাদীস!

তাছাড়া উপরে উল্লেখিত ৯, ১০ ও ৪ নম্বর মাসআলাটি তো শুধু ফিকহে হানাফীর নয়, জুমহূরে উম্মতের ইজমায়ী মাসআলা। অন্যান্য মাসআলাতেও হানাফী ফকীহগণের সাথে অন্য অনেক ফকীহ একমত। আর প্রত্যেক মাসআলায় ফকীহ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের হাওয়ালা তো এখনই উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই আমি নিবেদন করে থাকি যে, আমার এই বন্ধুরা যদি তাদের অধ্যয়নের পরিধি বিস্তৃত ও গভীর করতেন তাহলে এই বাড়াবাড়ি তাদের মধ্যে থাকত না। অন্তত এটুকু চিন্তা তো অবশ্যই হতো যে, ওদের কাছেও দলীল আছে; আর আমাদের দলীলগুলোর প্রধান্য ও অগ্রগণ্যতাও এত সুস্পষ্ট নয় যে, একদম মুতাওয়াতির ও অকাট্য বিষয়ের মত এতে ভিন্নমতের কোন অবকাশই নেই।

২. আংশিক ও অস্বচ্ছ ধারণার উপর পূর্ণ প্রত্যয়

অনেক সময় এমন হয় যে, কোনো কোনো বন্ধুর উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকহের কিছু নীতি ও ধারা সম্পর্কে খুব অগভীর ধরনের জানাশোনা

থাকে। নীতিটির স্বরূপ ও তাৎপর্য এবং ভাষ্য ও বিস্তারিত অনুষঙ্গের জ্ঞান থাকে না। উসূলের উপর মুতাকাদ্দিমীনের কিতাবসমূহ গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করার বিষয়ে সচেতনতা থাকে না। শুধু অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ ধারণার উপর ভিত্তি করে বিপরীত পথ ও পন্থা সম্পর্কে কটূক্তি ও সমালোচনার বিরাট সৌধ নির্মাণ করে ফেলা হয়। এরপর ইলমী আলোচনাতেও তাদের মুখে আম লোকের ভাষা ও যুক্তি প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন তাদের এই বক্তব্য যে—

ক. সহীহ বুখারী বা সহীহ মুসলিমে নেই

অনেকের মনে দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, 'যেসকল হাদীস সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে নেই তা হয়তো সহীহ নয় কিংবা সহীহ হলেও এই দুই কিতাবের সহীহ হাদীসের সমপর্যায়ের নয়।' এ কারণে কোনো বিষয়ে হাদীস পেশ করা হলে বলে, বুখারীতে দেখান, মুসলিমে দেখান। কিংবা বলে, বুখারী-মুসলিমে এর বিপরীত যে হাদীস আছে তা অধিক সহীহ। সুতরাং ঐ হাদীসের উপর আমল করা উচিত এবং এটা বাদ দেওয়া উচিত!

যাদের উসুলুল ফিকহ ও উসুলুল হাদীসের পোখতা ইলম আছে তারা বোঝেন এটা কেমন স্থূল কথা। কারণ :

ক. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম দু'জনই পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, তাঁরা তাঁদের 'কিতাবুস সহীহ'তে যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন তা সব সহীহ। তবে সকল সহীহ হাদীস তাঁরা তাঁদের কিতাবে বর্ণনা করেননি এবং বর্ণনার ইচ্ছাও করেননি। এ কথাটি উভয় ইমাম থেকে সহীহ সনদে প্রমাণিত।

ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন—

ما أدخلت في كتابي "الجامع" إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول.

অর্থাৎ আমি আমার কিতাবুল জামি'তে শুধু সহীহ হাদীস এনেছি। তবে গ্রন্থের কলেবর বড় হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় (অনেক) সহীহ হাদীস ত্যাগ করেছি।—আলকামিল, ইবনে আদী ১/ ২২৬; তারীখে বাগদাদ ২/৮-৯

"শুরূতুল আইম্মাতিল খামছা"য় (পৃ. ১৬০- ১৬৩) ইমাম ইসমাঈলীর সূত্রে ইমাম বুখারীর বক্তব্যের আরবী পাঠ এই—

لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر.

আমি এই কিতাবে শুধু সহীহ হাদীস এনেছি। আর যে সহীহ হাদীস আনিনি তার সংখ্যা বেশি।

খতীব বাগদাদী রাহ. "তারীখে বাগদাদে" (১২/২৭৩ তরজমা : আহমদ ইবনে ঈসা আততুসতরী) এবং হাযেমী "শুরূতুল আইম্মাতিল খামসা"য় (পৃ. ১৮৫) বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু যুরআ রাযী রহ. (যিনি ইমাম মুসলিম রহ. এর উস্তাদ) একবার সহীহ মুসলিম সম্পর্কে বললেন, এর দ্বারা তো আহলে বিদআর জন্য পথ খুলে দেওয়া হল। তাদের সামনে যখন কোনো হাদীস দ্বারা দলীল দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, এ তো কিতাবুস সহীহতে নেই!

তেমনি ইমাম ইবনে ওয়ারা রাহ.ও সরাসরি ইমাম মুসলিম রাহ.কে সম্বোধন করে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তখন ইমাম মুসলিম রাহ. বলেছেন, আমি এই কিতাব সংকলন করেছি এবং বলেছি, এই হাদীসগুলো সহীহ। আমি তো বলিনি যে, এ কিতাবে যে হাদীস নেই তা জয়ীফ! ....

তখন ইবনে ওয়ারা তার ওজর গ্রহণ করেন এবং তাঁকে হাদীস শুনান।

এই ঘটনা থেকে যেমন বোঝা যায়, ইমাম মুসলিম রাহ. সকল সহীহ হাদীস সংকলনের ইচ্ছাও করেননি তেমনি এ কথাও বোঝা যায় যে, কোনো সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস পেশ করা হলে 'এ তো সহীহ মুসলিমে নেই' বলে তা ত্যাগ করা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর তরিকা হতে পারে না। একই কথা সহীহ বুখারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

২. ইমাম আবু বকর ইসমায়িলী রহ. (৩৭১ হি.) 'আল মাদখাল ইলাল মুসতাখরাজ আলা সহীহিল বুখারী'তে হাম্মাদ ইবনে সালামা থেকে ইমাম বুখারীর রেওয়ায়েত না করার প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বুখারী তো তার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ অনেক সহীহ হাদীসও বর্ণনা করেননি। তবে তা এ জন্য নয় যে, তাঁর দৃষ্টিতে হাদীসগুলো জয়ীফ কিংবা সেগুলোকে তিনি বাতিল করতে চান। তো হাম্মাদ থেকে রেওয়ায়েত না করার বিষয়টিও এরকমই।'–আননুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ, বদরুদ্দীন যারকাশী ৩/৩৫৩

৩. ইমাম আবু নুয়াইম আসপাহানী রাহ. (৪৩০ হি.) 'আলমুসতাখরাজ আলা সহীহি মুসলিম''-এ একটি হাদীসের মান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

"فإنهما رحمهما الله قد تركا كثيرا مما هو بشرطهما أولى و إلى طريقتهما أقرب"

অর্থাৎ বুখারী মুসলিম এমন অনেক হাদীস ত্যাগ করেছেন, যেগুলো তাদের সংকলিত হাদীস থেকেও তাঁদের নীতি ও মানদণ্ডের অধিক নিকটবর্তী।–আলমুসতাখরাজ ১/৩৬

৪. তো এটি একটি সহজ ও বাস্তব কথা যে, বুখারী–মুসলিমে বর্ণিত হাদীসসমূহের সমপর্যায়ের হাদীস এবং ঐ দুই কিতাবের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ সহীহ হাদীসের সংখ্যা অনেক। শুধু মুসতাদরাকে হাকিমেই এ পর্যায়ের হাদীস, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী হাজারের কাছাকাছি।–আননুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ

মুসনাদে আহমদ এখন ৫২ খণ্ডে বিস্তারিত তাখরীজসহ প্রকাশিত হয়েছে। টীকায় শায়েখ শুআইব আরনাউত ও তার সহযোগীরা সনদের মান সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর হাদীস বিভাগের একজন তালিবে ইলম শুধু প্রথম চৌদ্দ খণ্ডের রেওয়ায়েতের হিসাব করেছেন। দেখা গেছে, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ–এই ছয় কিতাবে নেই এমন হাদীসগুলোর মধ্যে : বুখারী ও মুসলিম উভয়ের শর্ত অনুযায়ী ৪০১টি, শুধু বুখারীর শর্ত অনুযায়ী ৬৪টি, শুধু মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ২১৫টি হাদীস রয়েছে।

এছাড়া সহীহ লিযাতিহী বা সহীহ লিগায়রিহী হাদীসের সংখ্যা ১০০৮টি ও হাসান লিযাতিহী বা হাসান লিগায়রিহী হাদীস ৬১৫টি। এসব সংখ্যা স্বতন্ত্র–অতিরিক্ত হাদীসসমূহের, অর্থাৎ যেগুলোর কোনো মুতাবি বা শাহেদ তাখরীজের বিবরণ অনুযায়ী ছয় কিতাবে নেই।

ইমাম তহাবী রহ. এর 'শরহু মুশকিলিল আছার'ও তাখরীজসহ ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে নমুনা হিসাবে শুধু দুই খণ্ডের হাদীস ও আছার দেখা হয়েছে তো বুখারী–মুসলিম উভয়ের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হাদীস পাওয়া গেছে ২২২টি, বুখারী–মুসলিম কোনো একজনের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হাদীসসংখ্যা ১৪৬টি। এর মধ্যে ৪৬ টি এমন যে, তাখরীজের বিবরণ অনুযায়ী বুখারী–মুসলিমে তার কোনো মুতাবি–শাহিদ (সমর্থক বর্ণনাও) নেই। এ ছাড়া এই দুই খণ্ডে সহীহ লিযাতিহী হাদীস ২৬৪ টি, সহীহ লিগায়রিহী ১২১টি, হাসান লিযাতিহী ৯৪টি ও হাসান লিগায়রিহী রয়েছে ১৩টি।

শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. 'সিফাতুস সালাহ'র (নবীজীর নামাযের পদ্ধতি) উপর যে কিতাব লিখেছেন তাতে ছয় কিতাবের বাইরে ৮৬ টি হাদীস রয়েছে এবং সহীহ বুখারী–সহীহ মুসলিমের বাইরে সুনানের কিতাবের হাদীস রয়েছে ১৫৬ টি।

৫. স্বয়ং ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. তাদের অন্যান্য কিতাবে এমন অনেক হাদীসকে সহীহ বলেছেন বা দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো তাঁদের এই দুই কিতাবে নেই। কারো সন্দেহ হলে 'জুযউল

কিরাআতি খালফাল ইমাম' এবং 'জুযউ রাফইল ইয়াদাইন' ইত্যাদি খুলে দেখতে পারেন। জামে তিরমিযী খুললেও দেখতে পাবেন, ইমাম তিরমিযী রাহ. ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতিতে এমন অনেক হাদীসকে সহীহ বলেছেন, যা সহীহ বুখারীতে নেই।

তো এই সকল নিশ্চিত ও চাক্ষুষ প্রমাণ থাকার পরও কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রহণ করতে শুধু এ কারণে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া যে, তা বুখারী, মুসলিমে নেই, অতি সত্হী ও অগভীর চিন্তা নয় কি?

৬. সপ্তম শতাব্দীতে তৈরিকৃত 'তাকসীমে সাবয়ী'[১]-এর কারণে যদি কারো সন্দেহ হয় তাহলে তাদের জেনে রাখা উচিত, ঐ 'তাকসীম'কারীগণই লিখেছেন–

---

[১] তাকসীমে সাবয়ী অর্থ সাত প্রকারে বিভক্তকরণ। সম্ভবত মুহাদ্দিস ইবনুল সালাহ রাহ. (৬৪৬ হি.) সর্বপ্রথম এই ধারণা প্রকাশ করেন যে, সহীহ হাদীস সাত প্রকার এবং প্রত্যেক উপরের প্রকার নীচের প্রকারের চেয়ে তুলনামূলক বেশি সহীহ। প্রকারগুলো এই–

১. যে হাদীস সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম দুই কিতাবেই আছে।

২. যা শুধু সহীহ বুখারীতে আছে।

৩. যা শুধু সহীহ মুসলিমে আছে।

৪. যা এই দুই কিতাবে নেই তবে এই দুই কিতাবের মানদণ্ডে সহীহ।

৫. শুধু বুখারীর মানদণ্ডে সহীহ।

৬. শুধু মুসলিমের মানদণ্ডে সহীহ।

৭. যা না এই দুই কিতাবে আছে, না এই দুই কিতাবের মানদণ্ডে সহীহ। তবে অন্য কোনো ইমাম একে সহীহ বলেছেন।–মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ পৃ. ১৭০

হিজরী সপ্তম শতকে সহীহ হাদীসের এই প্রকারভেদ অজুদে আসার পর অনেক লেখক নিজ নিজ কিতাবে তা উদ্ধৃত করেছেন। তবে অনেক মুহাক্কিক মুহাদ্দিস বাস্তবতা বিচার করে বলেছেন, এই প্রকারভেদ উসূলে হাদীসের আলোকে সহীহ নয়। সহীহ হাদীসের শ্রেণী ও পর্যায় নির্ধারিত হবে ছিহহতের শর্ত ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে, বিশেষ কোনো কিতাবে থাকা বা না থাকার ভিত্তিতে নয়। যেমন অনেক হাদীস শুধু সহীহ বুখারীতে আছে, সহীহ মুসলিমে নেই, কিন্তু তার সনদ এমন যে, তা মুসলিমের মানদণ্ডেও সহীহ। এ ধরনের হাদীসকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নেওয়ার কী অর্থ? তেমনি কোনো হাদীস বুখারীতে নেই, শুধু মুসলিমে আছে, কিন্তু তার সনদ এমন যে, তা ইমাম বুখারীর নিকটেও সহীহ। এ হাদীসকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা কি অর্থহীন নয়? তদ্রূপ যেসব হাদীস উভয় ইমামের মানদণ্ডে সহীহ সেগুলো কি শুধু এই দুই কিতাবে সংকলিত না হওয়ার কারণে চতুর্থ শ্রেণীতে চলে যাবে?

মোটকথা, এই প্রকারভেদকে শাস্ত্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। অনেক আহলে ইলমের মতো নিকট অতীতের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আহমদ শাকির রাহ.ও (মৃত্যু : ১৩৭৭ হি.) এই তাকসীমের কঠোর সমালোচনা করেছেন। দেখুন : মুসনাদে আহমদে সহীফায়ে হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহের উপর তার ভূমিকা, খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা : ১৮২।

أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح، فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا

অর্থাৎ অগ্রগণ্যতার অন্যান্য কারণে কোনো প্রকার যদি তার উপরস্থ প্রকারের চেয়ে অগ্রগামী হয় তাহলে তাকে তার উপরের প্রকারের চেয়ে অগ্রগণ্য করা হবে। কারণ এই বিন্যাসে উল্লেখিত নীচের প্রকারের বর্ণনার সাথে কখনো কখনো এমন বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়, যা তাকে উপরের পর্যায়ের বর্ণনার সমকক্ষ বা অগ্রগণ্য করে।

এ কথাটি হাফেয ইবনে হাজার রাহ. (৭৫২ হি.) শরহু নুখবাতুল ফিকারে (পৃ. ৩২) পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন। তাঁর শাগরিদ মুহাদ্দিস শামসুদ্দীন সাখাভী রাহ.ও (৯০২ হি.) "ফাতহুল মুগীছে" তা আরো খুলে খুলে বয়ান করেছেন। মুহাদ্দিস বদরুদ্দীন যারকাশী রাহ. (৭৯৪ হি.) "আন নুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ" তে (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ২৫৬-২৫৭) এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ. তাদরীবুর রাবীতে (খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৮) পরিষ্কার লিখেছেন যে, সহীহ মুসলিমের তুলনায় সহীহ বুখারী অধিক সহীহ হওয়ার অর্থ সমষ্টিগত বিচারে অধিক সহীহ হওয়া; এই নয় যে, সহীহ বুখারীর প্রতিটি হাদীস সহীহ মুসলিমের প্রতিটি হাদীসের চেয়ে অধিক সহীহ। যারকাশী রাহ. আরো লিখেছেন, অগ্রগণ্যতার কারণ-বিচারে মুহাদ্দিসগণ কখনো কখনো মুসলিমের হাদীসকে বুখারীর হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

সুতরাং তাঁদের কাছেও 'তাকসীমে সাবয়ী' সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য অটল নীতি নয়।

খ. অধিকতর সহীহ বর্ণনাই অগ্রগণ্য?

অনেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, 'যে হাদীস সনদের বিচারে বেশি সহীহ তা-ই শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য, বিপরীত হাদীসটি সহীহ হলেও।'

অথচ এটা নিয়ম নয় যে, হাদীসের মাঝে বাহ্যত বিরোধ দেখা দিলে অন্য কোনো বিবেচনা ছাড়াই অধিক সহীহ হাদীসটি গ্রহণ করা হবে এবং বিপরীতটি বর্জন করা হবে। বরং স্বীকৃত নিয়ম এই যে, এই বিরোধের ক্ষেত্রে জমা, তারজীহ ও নাসখ তথা সমন্বয় সাধন, অগ্রগণ্য বিচার ও নাসিখ-মানসূখ নির্ণয়ের নিয়ম কার্যকর করতে হবে। তারজীহ বা অগ্রগণ্য বিচারের প্রসঙ্গ যদি আসে তাহলে 'উজূহুত তারজীহ' বা অগ্রগণ্যতার কারণসমূহের ভিত্তিতে যে হাদীস রাজিহ বা অগ্রগণ্য হবে সে হাদীসের

উপরই আমল হবে। অগ্রগণ্যতার অনেক কারণ আছে।[২] সনদের বিচারে অধিক সহীহ্ হওয়া একটিমাত্র কারণ। তো অগ্রগণ্যতার অন্য সকল কারণ ত্যাগ করে শুধু এক কারণের ভিত্তিতে সব জায়গায় সমাধান দিয়ে যাওয়া নিয়ম পরিপন্থী।

স্বয়ং ইমাম বুখারী রাহ. কিতাবুস সালাহ-এর দ্বাদশ অধ্যায়ে باب ما يذكر في الفخذ উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত কি না–এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

সেখানে তিনি বলেছেন–

وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم

অর্থাৎ আনাস রা.-এর হাদীস, (যার দ্বারা উরু সতর না হওয়া প্রমাণ হয়) সনদের বিচারে অধিক সহীহ হলেও জারহাদের হাদীস (যাতে উরু সতর হওয়ার কথা আছে) সতর্কতার বিচারে অগ্রগণ্য। যাতে ইখতিলাফের মধ্যে থাকতে না হয়।

ফাতহুল বারীতে (খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৭১) আছে, ইমাম বুখারী রাহ. 'আততারীখুল কাবীরে' জারহাদের হাদীসকে ইযতিরাবের কারণে জয়ীফ বলেছেন। তাহলে দেখুন, সহীহর বিপরীতে যয়ীফের উপর আমল করাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। কারণ এটাই সতর্কতার দাবি। যে মাযহাবে উরু সতর সেই মাযহাব অনুসারেও যেন গুনাহগার হওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

এ কারণে অগ্রগণ্যতার একটিমাত্র কারণকে সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্যের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা এবং সনদের বিচারে যেটি শ্রেষ্ঠ সেটিকেই চূড়ান্তভাবে

---

[২] ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আলহাযেমী রাহ. (৫৪৮ হি.–৫৮৪ হি.) 'আলইতিবার ফিন নাসিখি ওয়াল মানসূখি মিনাল আছার' কিতাবে (খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা ১৩২–১৬০) পঞ্চাশটি উজুহুত তারজীহ (অগ্রগণ্যতার কারণ) উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর দ্বারা দুই মুখতালিফ (বাহ্যত পরস্পর বিরোধী) হাদীসের মধ্যে অগ্রগণ্য নির্ধারণে সহযোগিতা নেওয়া হয়।

এই পঞ্চাশ কারণের মধ্যে একটি কারণও এই বলেননি যে, দুই মুখতালিফ হাদীসের মধ্যে একটি বুখারী বা মুসলিমে আর অন্যটি অন্য কোনো হাদীসের কিতাবে থাকলে বুখারী-মুসলিমেরটি অগ্রগণ্য হবে!!

সাধারণত অগ্রগণ্যতা নির্ধারিত হয় অগ্রগণ্যতার কারণ ও বৈশিষ্ট্যের নিরিখে; কোনো বিশেষ কিতাবে থাকা বা না থাকার ভিত্তিতে নয়। মুজতাহিদ ইমামগণ কখনো কিতাবের ভিত্তিতে অগ্রগণ্যতার ফয়সালা করতেন না। হাদীস-সুন্নাহ এবং ফিকহে ইসলামী সংকলিত হওয়ার অনেক পরে এই নীতি সৃষ্টি হয়েছে যে, অমুক অমুক কিতাবকে হাদীস অনুসরণের ভিত্তি বানাও। অথচ এর দ্বারা অনেক সহীহ ও হাসান হাদীস বর্জিত হয়ে যায়।

শ্রেষ্ঠ মনে করা আর তা-ও বিনা তাহকীকে, শুধু এ কারণে যে, বিপরীত হাদীসটি বুখারী-মুসলিমে নেই–এই চিন্তা মোটেও সঠিক নয়। সুতরাং অগ্রগণ্যতার অন্যান্য দিক ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং বিবেচনায় রাখা জরুরি। যেমনটা আমরা স্বয়ং ইমাম বুখারীর কাছে দেখলাম।

আরো মনে রাখা উচিত, যে সহীহ হাদীস মোতাবেক সাহাবা-তাবেয়ীনের যুগ থেকে আমল হচ্ছে, যার উপর ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদের উস্তাদরা আমল করেছেন, ফিকহ ও হাদীসের ইমামগণ যার উপর মাসআলার ভিত্তি রেখেছেন তাকে শুধু এই ছুতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ে আমলের গণ্ডি থেকে বের করে দেওয়া যে, হাদীসটি বুখারী-মুসলিমে কেন আসেনি–এ কি ন্যায় ও যুক্তির কথা হতে পারে? হাদীস-সুন্নাহর কোনো দলিল এমন করতে বলে কি না তা চিন্তা করা কি প্রয়োজন নয়?

গ. সহীহর মোকাবেলায় হাসান কি গ্রহণযোগ্য নয়?

উপরের উদাহরণ থেকে পরিষ্কার হয়েছে যে, এক বিষয়ে যদি দুইটি মুখতালিফ হাদীস বিদ্যমান থাকে, যার একটি সহীহ, অন্যটি হাসান, তাহলে সহীহ, সর্বাবস্থায় হাসানের চেয়ে অগ্রগণ্য হবে তা অপরিহার্য নয়। কেউ কেউ মনে করে, সহীহ-হাসানে তাআরুয (বিরোধ) মনে হলে সর্বাবস্থায় সহীহকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। ইনসাফের কথা এই যে, এখানেও ইখতিলাফুল হাদীসের মূলনীতি প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ দুই হাদীসের মধ্যে ইখতিলাফ (বাহ্যত বিরোধ) মনে হলে বিরোধ নিষ্পত্তির যে মূলনীতি আছে, অর্থাৎ জমা (সমন্বয়) তারজীহ (অগ্রগণ্যতা বিচার) নাসখ (নাসিখ-মানসূখ নির্ণয়) সে অনুযায়ী নিষ্পত্তি করতে হবে। যদি তারজীহ বা অগ্রগণ্যতার প্রসঙ্গ আসে তাহলে যে হাদীস অগ্রগণ্য সাব্যস্ত হবে তার উপর আমল করা হবে। অগ্রগণ্য হাদীস ঐ হাদীসকে বলে, যাতে এক বা একাধিক অগ্রগণ্যতার কারণ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং সহীহর বিপরীতে হাসান হাদীসে যদি এক বা একাধিক শক্তিশালী কারণ অগ্রগণ্যতার থাকে তাহলে তাকেই অগ্রগণ্য করতে হবে।

যারা বলেছেন, 'আসাহ' (অধিক সহীহ) সহীহর চেয়ে অগ্রগণ্য, সুতরাং এখানে সমন্বয় চেষ্টার প্রয়োজন নেই, তাদের মতকে হাফেয ইবনে হাজার রাহ. "ইনতিকাযুল ইতিরায" গ্রন্থে (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ৫৮) খণ্ডন করেছেন।

তিনি লেখেন–

وأما دعوى أن الجمع لا يكون إلا في المتعارضين، وأن شرط المتعارضين أن يتساويا في القوة، فهو شرط لا مستند له، بل إذا صح الحديثان وكان ظاهرهما التعارض وأمكن الجمع فهو أولى من الترجيح.

অর্থাৎ এই দাবি করা যে, সমন্বয় শুধু দুই মুতাআরিযের (বাহ্যত বিরোধপূর্ণ) মাঝে হয়ে থাকে আর মুতাআরিয তখনই হয়, যখন দুটোই শক্তির দিক থেকে সমান হয়–এটি দলিলহীন শর্ত। বরং দুই হাদীস সহীহ হলে এদের মাঝে যদি বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হয় এবং সমন্বয় সাধন সম্ভব হয় তাহলে সেটিই তারজীহের চেয়ে উত্তম।

হাফেয ইবনে হাজার রাহ. এ কথা বলেছেন মুসতাদরাকে হাকিম ও সহীহ বুখারীর দুটো হাদীসের উপর আলোচনা করতে গিয়ে, যে দুই হাদীসের মাঝে বাহ্যত বিরোধ দেখা যাচ্ছিল। কেউ এখানে সহীহ বুখারীর হাদীস আসাহ (অধিক সহীহ) হওয়ার যুক্তিতে মুসতাদরাকের হাদীস প্রত্যাখ্যানের প্রস্তাব করেছিলেন। এই প্রস্তাব ভুল সাব্যস্ত করে ইবনে হাজার উপরের কথা বলেন।

তদ্রূপ তিনি তার কিতাব 'শরহু নুখবাতিল ফিকারে'র দরসে বলেছেন, সহীহ ও হাসানের মাঝেও তাআরুয (বিরোধ) দাঁড়াতে পারে। সুতরাং মানসূখ (রহিত) রেওয়ায়েত সহীহ পর্যায়ের আর নাসিখ (রহিতকারী) রেওয়ায়েত হাসান পর্যায়ের হওয়া খুবই সম্ভব।–আলইয়াওয়াকীতু ওয়াদ দুরার আলা শরহি নুখবাতিল ফিকার, আবদুর রঊফ আলমুনাভী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ৩০৬; হাশিয়া কাসিম ইবনে কুতলুবুগা পৃষ্ঠা : ১০৯; হাশিয়াতুল কামাল ইবনে আবী শারীফ আলা শরহি নুখবাতিল ফিকার পৃষ্ঠা : ৭৩

যদি সহীহর বিপরীতে হাসানের কোনো গুরুত্বই না থাকে তাহলে তা সহীহর জন্য নাসিখ কীভাবে হয়?

ঘ. সুন্নাহকে সনদভিত্তিক মৌখিক বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা

শরীয়তের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় দলীল হল কুরআন কারীম। এরপর সুন্নাহর স্থান। কিন্তু সুন্নাহের ব্যাপারে কতিপয় মানুষের এই ধারণা আছে যে, যেসব হাদীস সুস্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের কথা বা কাজ হিসেবে সহীহ বর্ণনা-পরম্পরায় এসেছে শুধু তাই সুন্নাহ। এই ধারণা ঠিক নয়। সুন্নাহ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা ও নির্দেশনাবলির নাম। এই শিক্ষা ও নির্দেশনা আমাদের কাছে সাধারণত মৌখিক বর্ণনা সূত্রে পৌঁছে থাকে এবং সাধারণ পরিভাষায় এইসব মৌখিক বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত রেওয়ায়েতগুলোকেই 'হাদীস' বলা হয়। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের বিশেষ কোন শিক্ষা বা নির্দেশনা আমাদের কাছে মৌখিক বর্ণনার স্থলে কর্মের ধারাবাহিকতায় পৌঁছায়। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম নবীজী থেকে কর্মের মাধ্যমে তা গ্রহণ করেছেন; তাদের নিকট

থেকে তাবেয়ীগণ গ্রহণ করেছেন। এভাবে প্রত্যেক উত্তরসূরি তার পূর্বসূরি থেকে কর্মের মধ্য দিয়ে নবীজীর সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করেন। নবী-শিক্ষার এই প্রকারটিকে পরিভাষায় 'আমলে মুতাওয়ারাস' বা সুন্নতে মুতাওয়ারাসা বলে।

নবী-শিক্ষা ও নবী-নির্দেশনার অনেক বিষয় এই পথেই পরবর্তীদের হাতে পৌঁছেছে। এই সব শিক্ষা-নির্দেশনা যদি মৌখিক বর্ণনাসমূহের মধ্যেও তালাশ করা হয় তাহলে অনেক সময় এমন হয় যে, হয়ত এ ব্যাপারে কোনো মৌখিক বর্ণনা পাওয়া যায় না অথবা পাওয়া গেলেও সনদের দিক থেকে তা হয় যয়ীফ। এখানে এসে স্বল্প-জ্ঞান কিংবা স্বল্প-বুঝের লোকেরা বিভ্রান্ত হয়। তারা যখন বিশুদ্ধ মৌখিক বর্ণনাসূত্রে বিষয়টি খুঁজে পায় না তো নবীজীর এই শিক্ষাটিকেই অস্বীকার করে বসে। অথচ মৌখিক সাধারণ বর্ণনা-সূত্রের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী সূত্র তাওয়ারুস তথা ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্মধারার মাধ্যমে বিষয়টি সংরক্ষিত।

তদ্রূপ নবী-শিক্ষার একটি অংশ হল যা আমাদের কাছে সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা-নির্দেশনার মধ্য দিয়ে সংরক্ষিত আছে। বিষয়টি একটু খুলে বলি। সাহাবায়ে কেরামের অনেক নির্দেশনা এমন আছে যার ভিত্তি শরীয়তসম্মত কিয়াস ও ইজতিহাদ। এগুলো শরীয়তের দলীল হিসেবে স্বীকৃত। আবার তাদের কিছু নির্দেশনা ও কিছু ফাতওয়া এমন আছে যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো কথা বা কাজ থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অন্যকে শিখানোর সময় এর উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। কেননা প্রেক্ষাপট থেকে এ কথা স্পষ্ট ছিল যে, তাঁরা নবীজীর শিক্ষা ও নির্দেশনার ভিত্তিতেই তা শিক্ষা দিচ্ছেন। এজন্য দ্বীনের ইমামগণের সর্বসম্মত নীতি হল, সাহাবায়ে কেরামের যে ফাতাওয়া বা নির্দেশনার ব্যাপারে এটা সুনির্দিষ্ট যে, এটা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা-নির্দেশনা থেকেই গৃহীত, এতে সাহাবীর ইজতিহাদ বা কিয়াসের কোনো প্রভাব নেই তা মারফূ হাদীসেরই অন্তর্ভুক্ত। কোনো মাসআলায় এর মাধ্যমে প্রমাণ দেওয়া মারফূ হাদীসের দ্বারা প্রমাণ দেওয়ার শামিল। পরিভাষায় একে মারফূ হুক্‌মী। নিসন্দেহে এর ভিত্তি কোনো মারফূ হাকীকী বা স্পষ্ট মারফূ। তবে এটা জরুরি নয় যে, হাদীসের কিতাবসমূহে সেই স্পষ্ট মারফূ হাদীসটি সহীহ সনদে বিদ্যমান থাকবে। এখানেও স্বল্প-বুঝের লোকেরা পদস্খলনের শিকার হয় এবং নবীজীর শিক্ষাটিকেই অস্বীকার করে বলতে থাকে যে, এর কোনো ভিত্তি পাওয়া গেল না, অথচ মারফূ হুকমীর সূত্রে প্রমাণিত হওয়াও দলীল হিসাবে যথেষ্ট।

উদাহরণস্বরূপ ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রাহ.-এর হাওয়ালা উল্লেখ করা যায়। তিনি তাকবীরে তাশরীকের উপর আলোচনা করে লেখেন, তাকবীরে তাশরীক মশরূ হওয়ার বিষয়ে আলিমগণ একমত। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সহীহ মরফূ হাদীস নেই। শুধু সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী ব্যক্তিদের থেকে কিছু আছর বর্ণিত হয়েছে এবং এরই উপর মুসলমানদের আমল রয়েছে। এরপর লেখেন−

وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفي بالعمل به.

অন্য কিছু হুকুমের সাথে এই হুকুমটিও প্রমাণ করে যে, যেসব বিষয়ে উম্মতের ইজমা হয়েছে তন্মধ্যে কিছু বিষয় এমনও আছে, যে সম্পর্কে আমাদের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে স্পষ্ট কোনো নস বর্ণিত হয়ে আসেনি; বরং এ বিষয়ে শুধু আমলে (মুতাওয়ারাছ-এর) উপরই নির্ভর করতে হয়।−ফাতহুল বারী ফী শরহি সহীহিল বুখারী, ইবনে রজব হাম্বলী (৭৩৬হি.-৭৯৫হি.) খ. ৬, পৃ. ১২৪

সহীহ হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সুন্নাতের পাশাপাশি খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে অনুসরণ করার এবং তাকে মজবুতভাবে অবলম্বন করার আদেশ করেছেন। ইরশাদ করেছেন−

انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ . . . وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

"মনে রেখো! আমার পরে তোমাদের যারা জীবিত থাকবে তারা বহু মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নত ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নতকে আকড়ে রাখবে। একে অবলম্বন করবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে রাখবে ... এবং তোমরা (ধর্মীয় বিষয়ের) নবআবিস্কৃত বিষয়াদি থেকে খুব সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রতিটি নবআবিস্কৃত বিষয় বেদআত। আর প্রতিটি বিদআত গোমরাহী।"−সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪৬০৭; জামে তিরমিযী ৫/৪৩, হাদীস : ২৬৭৬; মুসনাদে আহমদ ৪/১২৬, হাদীস : ১৬৬৯২; সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস : ৪২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৫

জামে তিরমিযীর ২২২৬ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে খেলাফতের মেয়াদ ত্রিশ বছর হওয়ার ভবিষ্যৎবাণী খোদ নবীজীই করে গেছেন। সে হিসেবে নবী-পরিভাষায় খুলাফায়ে রাশেদীন চারজন- ১. আবু বকর রা. ২. উমর রা. ৩. উসমান রা. ৪. আলী রা.। তাঁর শাহাদত ৪০ হিজরীর রমযানে হয়েছে।

যেহেতু খুলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেনেছিলেন যে, তাঁদের জারিকৃত সুন্নতসমূহ নবী-শিক্ষার উপরই ভিত্তিশীল হবে, তাঁদের সুন্নতসমূহ নবী-সুন্নতেরই অনুগামী হবে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি মোতাবেক হবে এজন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতকে ব্যাপক ঘোষণা দিয়ে বলে যান যে, তোমরা খুলাফায়ে রাশেদীনর সুন্নতকে মজবুতভাবে আকড়ে রাখবে।

সুতরাং যখন উম্মতের সামনে কোনো বিষয়ে প্রমাণ হবে যে, এটি চার খলীফার কোনো একজনের সুন্নত তখন তার অনুসরণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরোক্ত ইরশাদটিই যথেষ্ট। আমাদের জন্য আরো অগ্রসর হয়ে এটা ভাবার প্রয়োজন নেই যে, তাঁদের এই সুন্নতের ভিত্তি কী ছিল এবং তাঁরা এই সুন্নত কোন নবী-শিক্ষা থেকে গ্রহণ করেছেন। এখানেও স্বল্প জ্ঞান ও স্বল্প বুঝের লোকদের অভ্যাস হল, খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের ভিত্তি হাদীসের কিতাবসমূহে খুঁজতে থাকেন। এরপর সহীহ সনদে নবীজীর স্পষ্ট কোনো বাণী বিশেষ এই ব্যাপারে না পেলে তখন তাকে অস্বীকার করে বসে এবং অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে একে বিদআত আখ্যা দিয়ে দেয়। অথচ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিন্দিত ইখতিলাফ থেকে বাঁচার এই পথই দেখিয়েছেন যে, আমার সুন্নত ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে মজবুতভাবে অবলম্বন কর। এরপর বলেছেন, বিদআত থেকে বেঁচে থাক। একটু চিন্তা করুন, যদি খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত বিদআতই হত তাহলে নবীজীর এই ইরশাদের অর্থ থাকে কী?

সুন্নাহর পরে শরীয়তের তৃতীয় বুনিয়াদী দলিল হল ইজমা। এর বিভিন্ন ধরন এবং অনেক পর্যায় আছে। এর মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহাজির-আনসার এবং অন্যান্য সাহাবীগণের ইজমা। এই ইজমা যদি ব্যাপকভাবে এবং অবিচ্ছিন্ন ও সম্মিলিতরূপে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছায় তবে তা শরীয়তের অনেক বড় অকাট্য দলিল। এ দলিল থাকা অবস্থায় অন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন

নেই এবং ইজমাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করার জন্য এরও প্রয়োজন নেই যে, এই ইজমা কীসের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়েছে তার অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হওয়া। কেননা শরীয়ত নিজেই ইজমাকে দলিল সাব্যস্ত করেছে এবং যাঁদের মাধ্যমে ইজমা সম্পন্ন হয় তাঁদের ব্যাপারে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে যে, এঁরা কখনো গোমরাহীর বিষয়ে একমত হতে পারে না। কুরআন মজীদে তো সুস্পষ্টভাবে মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের অনুসরণের আদেশ করা হয়েছে এবং সাবীলুল মুমিনীন (মুমিনদের অনুসৃত পথ) থেকে বিমুখ হওয়াকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ ঘোষণা করেছে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মত, পথ ও রুচির সাথে একাত্মতা পোষণ করে না এমন ব্যক্তিদের অভ্যাস হল তারা কোনো মাসআলায় শুধু উম্মতের ফকীহবৃন্দ নয়, উম্মাহর শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ–সাহাবায়ে কেরাম, বিশেষত মুহাজির ও আনসারের ঐকমত্য থাকা অবস্থায় ভিন্ন দলিল তালাশ করতে থাকে। অথচ শরীয়ত এই ইজমাকে দলিল সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু ওইসব বন্ধু যদি শরীয়তের এই দলিলের সমর্থনে অন্য কোনো সহীহ সনদওয়ালা স্পষ্ট হাদীস না পায় তাহলে এই মাসআলাটিকে অস্বীকার করে দেয়। কেউ তো আরো এক ধাপ বেড়ে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে শরীয়তের দলিল ইজমাকেই অস্বীকার করে বসে।

মনে রাখবেন, এসব কিছুই হল মূর্খতা ও শরীয়তের প্রতি অনাস্থা প্রকাশের সমার্থক। যদিও তা অসচেতনভাবেই হোক না কেন। অর্থাৎ শরীয়ত যে বিষয়টিকে দলিল সাব্যস্ত করেছে তারা তাকে মেনে নিতে পারছেন না।

এ বাস্তবতা সম্পর্কে যাঁদের চিন্তা ভাবনার সুযোগ হয় না তারা বিনা দ্বিধায় ঐ সকল সুন্নতকে ইনকার করেন, যা তারা সনদ ভিত্তিক বা মৌখিক বর্ণনা সূত্রে সরাসরি قال رسول الله صلى الله عليه وسلم বা فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم শব্দে কোনো সহীহ হাদীসে পান না। একারণে খুব সহজেই তারা খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ এবং আমলে মুতাওয়ারাছকে ইনকার করেন। বিশ রাকাআত তারাবী, জুমার নামাযের প্রথম আযান, তারাবীতে কুরআন খতম, জুমার খোৎবা আরবীতে হওয়া, কালেমায়ে তাওহীদের উভয় অংশ একসাথে বলার বৈধতা لا إله إلا الله محمد رسول الله. ইত্যাদি অনেক বিষয়, যেগুলোর বড় দলীল বা প্রসিদ্ধ দলিল হচ্ছে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত, মুসলিম উম্মাহর আমলে মুতাওয়ারাছ কিংবা আছারে সাহাবা ও তাবেয়ীন এসব কিছুকে তারা এই বলে অস্বীকার করেন যে, এগুলো সহীহ

হাদীসে নেই! তো উপরে উল্লেখিত বাস্তবতা সম্পর্কে চিন্তা করলে অনুমান করতে পারবেন যে, তাদের নীতি কতটা ভুল ও মারাত্মক নীতি! অথচ খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ এবং আছারে সাহাবা ও তাবেয়ীন যে শুধু সুন্নতে নববীর সাথে যুক্ত তাই নয়, সনদ ভিত্তিক বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত অনেক সহীহ হাদীসের (কওলী সুন্নতের) প্রকৃত অর্থ বোঝা ও তার প্রায়োগিক রূপ উপলব্ধি করাও এর উপর নির্ভরশীল। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশংকা না হলে এখানে কিছু উদাহরণও উল্লেখ করা যেত। আহলে ইলম যদি মুহাদ্দিস হায়দার হাসান খান টুংকী রাহ.-এর রিসালা "আততাআমুল"ও অধ্যয়ন করেন তাহলেও ইনশাআল্লাহুল আযীয চিন্তার পথ খুলে যাবে। এই রিসালা 'আলইমাম ইবনু মাযাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনানে'র হাশিয়ায় রয়েছে।

ঙ. 'সহীহ' ও 'সুন্নত'কে সমার্থক মনে করা

সহীহ বা হাসান পর্যায়ের প্রতিটি রেওয়ায়েত অবশ্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস। কারণ তা তাঁর থেকে প্রমাণিত। কেউ কেউ মনে করেন, হাদীসে যা কিছু প্রমাণিত তা অবশ্যই সুন্নত বা মুস্তাহাব। অথচ সঠিক কথা হল, হাদীস দ্বারা যা প্রমাণিত তা শরীয়তের বিধান বটে, কিন্তু তা কোন প্রকারের এবং কোন পর্যায়ের বিধান; তা কি সুন্নত-মুস্তাহাব, না মোবাহ; সাধারণ বিধান না বিশেষ অবস্থার বিধান; সুন্নত হিসেবে করা হয়েছিল, না ওযরের কারণে বা শুধু বৈধতা বর্ণনার জন্য করা হয়েছিল অথবা শুধু অভ্যাসগতভাবে[৩] করা হয়েছিল–ইত্যাদি অনেক সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম দিক আছে যেগুলোর গভীরে পৌঁছা ও সমাধান দেওয়া মুজতাহিদ ও ফকীহগণের কাজ। এজন্য আমাদের কর্তব্য, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস সব সময় মনে রাখা–

نضر الله امرء سمع منا حديثا فحفظه، حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه

অর্থাৎ আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে সজীব করুন, যে আমার নিকট থেকে কোনো হাদীস শুনেছে, অতপর তা মুখস্থ করেছে এবং অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। কারণ ফিকহের অনেক বাহক তার চেয়ে অধিক ফকীহর নিকট তা

---

[৩] নিঃসন্দেহে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি অভ্যাস জামাল ও কামালে পরিপূর্ণ। এসব বিষয়ে সাধ্যানুযায়ী তাঁর সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা মহব্বতের দলীল এবং ছওয়াব ও বরকতের কারণ। কিন্তু মূল অনুসরণের ক্ষেত্র তো সুন্নতে হুদা। সুন্নতে হুদার বিষয়ে (যাতে আদাব অংশটিও শামিল) শিথিলতা করে নিছক অভ্যাসগত বিষয়াদিতে মুশাবাহাত-সামঞ্জস্য ইখতিয়ার করা এক ধরনের ধোকাও হতে পারে। উল্লেখ্য, দাড়ি লম্বা রাখা সুন্নতে হুদার গুরুত্বপূর্ণ বিধান এবং ওয়াজিব পর্যায়ের আমল।

পৌঁছে দিবে এবং ফিকহের অনেক বাহক নিজে ফকীহ নয়।-জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৮৪৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৩৬৫২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৬৭ ও ৬৮০

হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে যারা শুধু অনুবাদের উপর নির্ভর করে, না হাদীস বোঝা ও হাদীস-ব্যাখ্যার প্রাথমিক ও স্বীকৃত নিয়মনীতি জানা আছে, না জানার ইচ্ছা আছে আর না এ বিষয়ে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও ফুকাহায়ে উম্মতের জ্ঞান-গবেষণার সহায়তা নেওয়াকে বৈধ মনে করে, এরা তো বুঝতেই পারবে না যে, হাদীস অনুসরণের নামে অজান্তেই তারা সুন্নাহ বিরোধিতায় লিপ্ত হবে।

এদের কেউ মনে করবে, সব লোক আহাম্মক, এরা মসজিদের বাইরে বা জুতার বাক্সে জুতা রাখে অথচ সুন্নত হল, জুতা পায়ে দিয়ে নামায পড়া! তবে মাথায় না টুপি থাকবে, না পাগড়ি। খালি মাথায় জুতা পায়ে নামায পড়া সুন্নত!

কেউ মনে করবে, (নাউযুবিল্লাহ) পশ্চিমাদের রীতিই তো সঠিক। পেশাব তো দাঁড়িয়ে করাই সুন্নত!

কেউ বলবে, নামাযে নাতনিকে কাঁধে তুলে নেওয়া সুন্নত!

কেউ ফরয নামাযের আগে পরের সুন্নতে রাতিবা (সুন্নতে মুয়াক্কাদা) এবং বিতরকে আম নফলের মতো মনে করে অবহেলা করবে, কিন্তু অতি উদ্যম প্রদর্শন করবে মাগরিবের আগের দুই রাকাত নফলের বিষয়ে!

কেউ জুমআর আগের চার রাকাআত সুন্নতকে অস্বীকার করবে, জুমার পরের সুন্নত ত্যাগ করার বিষয়েও কোনো আফসোস হবে না, অথচ খোৎবা চলা অবস্থায় তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়তে ভুল করবে না।

কেউ মিসওয়াকের সুন্নত সম্পর্কে উদাসীন থাকবে, কিন্তু পাগড়ি বাঁধার বিষয়ে ভুল করবে না!

কেউ শোয়ার সময় চোখে সুরমা দিতে ভুলবে না, কিন্তু শোয়ার সময় দুআ ও যিকিরের কথা চিন্তাও করবে না!

কেউ তো দস্তরখান বিছানোর ক্ষেত্রে সামান্য শিথিলতাও করবে না, কিন্তু খাবারের কোনো দানা, তরকারির টুকরা পড়ে গেলে তা উঠিয়ে খাওয়ার ধারে কাছেও যাবে না!

কেউ মৌলিক বিষয়াদিতে সালাফ ও আকাবিরের তরীকা থেকে সরে যাবে, কিন্তু ব্যবস্থাপনাগত ও পরিবর্তনশীল বিষয়াদির অবস্থা ও চাহিদার পরিবর্তনের পরও আকাবিরের তরীকা আখ্যা দিয়ে তাতে জমে থাকবে আর এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করবে যে, আকাবিরের তরীকায় আছি!

কেউ নিজের সংশোধনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে সমাজের সংশোধনকে!

কেউ নিজের সন্তানের চিন্তার চেয়ে বেশি জরুরি বলবে উম্মতের চিন্তাকে!

কেউ দ্বীনের উপর আমল করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে দ্বীনের খেদমত ও দাওয়াতকে!

কেউ দ্বীনের বিধানের উপর আমল করার চেয়ে বেশি তৎপর থাকবে হুকুমতে ইসলামিয়া কায়েম করার ক্ষেত্রে।

মোটকথা, এই ধরনের এবং এর চেয়েও মারাত্মক ধরনের চিন্তাগত ও কর্মগত প্রান্তিকতার, যা আমাদের প্রায় সকল ঘরানায় কমবেশি বিস্তার লাভ করছে, এর কারণ এছাড়া আর কী যে, আমরা আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও ফুকাহায়ে উম্মতের জ্ঞান-গবেষণা থেকে কুরআন বোঝা, হাদীস বোঝা এবং হাদীস মোতাবেক আমল করার বিষয়ে হয়তো সহায়তা নেই না কিংবা সঠিক পন্থায় নেই না।

আমার এই অনুযোগ শুধু ঐ বন্ধুদের সম্পর্কেই নয়, যারা–আল্লাহ মাফ করুন–ফিকহের মাযহাব ও মুজতাহিদ ইমামদের সম্পর্কে বিদ্বেষ বা অপ্রসন্নতা পোষণ করেন কিংবা তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ও ভালোবাসা দিতে প্রস্তুত নন; আমার অনুযোগ ঐ ভাইদেরও প্রতি, যারা ফিকহের মাযহাব এবং আকাবির ও আসলাফের নাম নিয়েও الفقه العام للدين (দ্বীনের সাধারণ প্রজ্ঞা) এবং فقه الوسطية والاعتدال (মধ্যপন্থা ও ভারসাম্য সম্পর্কে প্রজ্ঞা) অর্জনের বিষয়ে উদাসীন থাকেন। এই ফিকহ ও প্রজ্ঞা তো আহলে ফিক্‌হ ও আহলে দিলের সোহবত ছাড়া এবং এ দুই বিষয়ে লিখিত প্রতি যুগের আহলে ফিক্‌হ ও আহলে দিল ব্যক্তিদের নির্বাচিত কিতাবাদি পাঠ করা ছাড়া অর্জন করা সহজ নয়।

৩. দলিলের শুধু সনদ দেখা। দলিল দ্বারা বিষয়টি কীভাবে প্রমাণ হয় এবং মূল আলোচ্য বিষয়ে তা প্রযোজ্য কি না–এ সম্পর্কে চিন্তা না করা।

কোনো হাদীস বা আছার দ্বারা কোনো বিধান প্রমাণ করতে হলে অনেকগুলো বিষয় দেখা জরুরি। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুটি :

১. ঐ হাদীস বা আছর নির্ভরযোগ্য কি না। তার সনদের মান এমন কি না, যা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

২. বাস্তবিকই তা আলোচিত বিধানের উপর দালালত করে কি না (অর্থাৎ আলোচিত বিধানকে নির্দেশ করে কি না)। করলে সেটি কোন প্রকারের এবং কোন পর্যায়ের দালালত।

কোনো হাদীস বা আছর দ্বারা মাসআলা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিষয়টির গুরুত্ব প্রথম বিষয় থেকে কোনো অবস্থাতেই কম নয়। উসূল ও মাবাদিয়াতের ইলম হাসিল করা ছাড়া শুধু অনুবাদের উপর নির্ভর করে যারা গবেষণার প্রাসাদ নির্মাণ করতে চান তারা দ্বিতীয় বিষয়ে থাকেন সম্পূর্ণ উদাসীন।

যেমন কারো দাবি যদি এই হয় যে, 'রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর তাকবীরের সময়, রুকু থেকে উঠে এবং দুই রাকাত থেকে উঠে সর্বদা রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন, কখনো এইসব জায়গায় রাফয়ে ইয়াদাইন ছাড়তেন না' এরপর সহীহ বুখারীর এই হাদীস দ্বারা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. যখন নামায শুরু করতেন তখন আল্লাহু আকবার বলতেন এবং দুই হাত উঠাতেন, যখন রুকু করতেন তখন দুই হাত ওঠাতেন, যখন سمع الله لمن حمده বলতেন তখন দুই হাত ওঠাতেন এবং যখন দুই রাকাতের পর দাঁড়াতেন তখন দুই হাত ওঠাতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এই আমল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওলায় বলতেন (মারফু হিসেবে বর্ণনা করতেন)।–সহীহ বুখারী খ. ১ পৃ : ১৮০

নামাযের তিন জায়গায় সর্বদা রাফয়ে ইয়াদাইনের দাবি করে শুধু এই হাদীস দেখে যদি মনে করা হয় যে, তার পুরো দাবি প্রমাণ হয়ে গেছে তাহলে সেটা ভুল হবে। কারণ এই হাদীসে তো শুধু এটুকু আছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন। কিন্তু সব সময় করতেন তা তো এই হাদীসে বলা হয়নি। তেমনি একথাও বলা হয়নি যে, তিনি কখনো রাফয়ে ইয়াদাইন ছাড়া নামায পড়তেন না। উপরন্তু যখন অন্য হাদীসে রাফয়ে ইয়াদাইন না করাও প্রমাণিত তখন তা অস্বীকার করার উপায় কী?

তেমনি কারো দাবি যদি এই হয় যে, রাফয়ে ইয়াদাইন সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং রাফয়ে ইয়াদাইন না করা খেলাফে সুন্নত; এরপর দলিল হিসেবে ঐ হাদীসটি পেশ করেন তাহলে যদিও তিনি সহীহ হাদীসই পেশ করেছেন, কিন্তু হাদীসটি তার দাবি প্রমাণ করে না। এই হাদীসে রাফয়ে ইয়াদাইন করা প্রমাণিত হয়, কিন্তু তা মোবাহ, না বিভিন্ন সুন্নাহর একটি; সুন্নত হলে তা মুআক্কাদা, না মুস্তাহাব ও যীনাত–এসব বিষয়ে এই হাদীস

নিশ্চুপ। এসবের জন্য অন্যান্য দলীল ও করীনার প্রয়োজন, যা ফকীহগণের দৃষ্টিতে থাকে, কিন্তু অদূরদর্শী লোকেরা দাবি ও দলিলের মাঝে সামান্য মিল দেখলেই মনে করে, আমাদের গোটা দাবি প্রমাণ হয়ে গেছে।

আরেকটি উদাহরণ : কেউ যদি দাবি করে যে, আযানের আগে আযানের মতো উঁচু আওয়াজে দরূদ পড়া সুন্নত; এরপর দলীল হিসেবে এই হাদীসটি পেশ করে—

من صلى علي واحدة، صلى الله عليه عشرا

যে আমার উপর একবার দরূদ পরে তার প্রতি আল্লাহ দশটি রহমত নাযিল করেন।—সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৪০৮

তাহলে হাদীস তো সহীহ, কিন্তু এর দ্বারা তার দাবি প্রমাণ হয়নি। কিন্তু তিনি যদি জিদ করেন যে, এ হাদীসে তো সময় নির্ধারণ করা নেই, তেমনি আস্তে পড়ারও শর্ত নেই, সুতরাং জোরে পড়লেও এই ছওয়াব পাওয়া যাবে। কাজেই আমি আযানের আগে তা জোরে জোরে পড়ব। এরকম জোরাজুরি করলে তাকে তো শুধু এটুকুই বলা যাবে যে, আপনি হাদীসের তরজমা পড়ার সাথে সাথে কিছুটা উসূলে ফিকহ এবং সুন্নত-বিদআত সংক্রান্ত শরীয়তের মূলনীতির সম্পর্কেও পড়াশোনা করুন তাহলে বুঝতে পারবেন, আপনি সহীহ হাদীস তিলাওয়াত করেছেন বটে, কিন্তু তা আপনার দাবির পক্ষে দলিল নয়। একে ঐ দাবির দলিল মনে করা ভুল।

আরেকটি উদাহরণ : কেউ যদি দাবি করে যে, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ইমাম-মুকতাদী সবাই মিলে হাত তুলে জোরে জোরে দুআ করা দায়েমী সুন্নত; এরপর দলীল হিসেবে তিরমিযী শরীফের হাদীস পেশ করে যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল,

أي الدعاء أسمع

কোন দুআ বেশি কবুল হয়? বললেন

جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة

মধ্য রাতের দুআ এবং ফরয নামাযের পরের দুআ। —জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৪৯৯

তাহলে এটা হবে দাবি প্রমাণের অসম্পূর্ণ প্রয়াস। কারণ হাদীস থেকে শুধু এটুকু প্রমাণ হয় যে, ফরয নামাযের পর দুআ কবুল হয়। এতে এই সময় দুআ করার উৎসাহ তো পাওয়া যায়, কিন্তু হাত তুলে সম্মিলিতভাবে জোরে জোরে দুআ করা এবং একে দায়েমী সুন্নত সাব্যস্ত করার বিষয়টি এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় না।

মোটকথা, এটি একটি দীর্ঘ প্রসঙ্গ। দাবি ও দলীলের মাঝে দূরত্বের এই ক্রটি এবং তদজনিত বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকার জন্যই শুধু হাদীসের অনুবাদ পড়ে দাবি-দলিলের ময়দানে নেমে পড়তে নিষেধ করা হয়।

৪. আলিমের পরিবর্তে বিভিন্ন মাধ্যমকেই যথেষ্ট মনে করা।

ইলম শেখার স্বাভাবিক পদ্ধতি হচ্ছে আহলে ইলম, আহলে ফিক্হ ও আহলে দিল ব্যক্তিদের সাহচর্য অবলম্বন করা। হাদীস শরীফে আছে–

تعلموا، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.

তোমরা শেখো, ইলম তো শেখার দ্বারা আসে এবং ফিকহ আসে ফিকহের চর্চা ও শেখার দ্বারা। আর আল্লাহ যার সম্পর্কে কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে দ্বীনের ফিকহ দান করেন।–ইবনে আবী আসিম, তবারানী–ফাতহুল বারী খ. ১ পৃ. ১৯৪

সাহবায়ে কেরাম ইলম ও ফিকহ অর্জন করেছেন সাহচর্যের দ্বারা। এরকম তাবেয়ীগণ সাহাবায়ে কেরামের সাহচর্যের দ্বারা, তাবে তাবেয়ীন তাবেয়ীনের সাহচর্য দ্বারা এভাবেই এই ধারা চলে আসছে। যখনই আহলে ফিকহের সাহচর্য ত্যাগ করে শুধু কিছু উপায়-উপকরণকে ইলম হাসিলের পক্ষে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে তখনই ইফরাত-তাফরীত (প্রান্তিকতা) বরং তাহরীফ-তাবদীলের (বিকৃতির) দরজা খুলেছে।

এ প্রসঙ্গে ড. নাসির আল আকলের বক্তব্য ইতিপূর্বে পৃ. উল্লেখ করেছি। এর অনেক আগে ইমাম আবু ইসহাক শাতিবী রাহ. (৭০৯ হি.) তাঁর কিতাব 'আলমুয়াফাকাত' খ. ১ পৃ. ৯১-৯২ (বারো নাম্বার মুকাদ্দিমায়) এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন এবং দলিলসহ পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, আদব, তাহকীক ও তাফাককুহ–এগুলো শুধু বই পড়ে হাসিল করা যায় না। এগুলোর জন্য সাহচর্য জরুরি।

গ্রন্থ পাঠ করে, আলোচনা শুনে কিংবা সিডি দেখে তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা যায়, কিন্তু ফাকাহাত ও বসীরত তথা প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি, ইতিদাল ও ভারসাম্য, আদব ও নীতি এবং বিনয় ও তাওয়াজু হাসিল করতে হলে আহলে ফিকহ ও আহলে দিলের সোহবত জরুরি।

৫. উসূলুল ফিকহ, কাওয়াইদুল ফিকহ, মাকাসিদুশ শরীয়া, আসবাবুল ইখতিলাফ, আদাবুল ইখতিলাফ ও আলফিকহুল আম লিদ্দীন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা না থাকা।

এই সকল ইলম ও ফন অতি গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ও মানসম্মত বুঝের জন্য এই শাস্ত্রগুলো অপরিহার্য। মনে করুন, একজন

ব্যক্তির কাছে এ সকল ইলমের কোনো সঞ্চয় নেই, তিনি তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনের সাহায্যে কুরআন বোঝার চেষ্টা করছেন এবং সাধ্যমত উপদেশ গ্রহণের চেষ্টা করছেন কিংবা মাআরিফুল হাদীস পাঠ করছেন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী হেদায়েত ও নির্দেশনা গ্রহণের চেষ্টা করছেন তো এতে কোনো অসুবিধা নেই, কোনো আপত্তিও নেই (তবে তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনের তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় যে কথাগুলো আরজ করা হয়েছে সেগুলোর দিকে খেয়াল রাখা জরুরি)

আপত্তি তখনই হবে যদি তিনি তাওযীহুল কুরআনের লেখক হতে চান, মাআরিফুল হাদীসের লেখক হতে চান, কিংবা এই কিতাগুলোর উপর পর্যালোচনা বা এই কিতাবের লেখকদের উপর আপত্তি করতে চান অথচ উপরোক্ত ইলম ও ফনের কোনো সঞ্চয় তার নেই। নস বোঝা ও তার ব্যাখ্যা-উপস্থাপনার প্রাথমিক বিষয়গুলোর সাথেও তার পরিচয় নেই, দ্বীন ইসলামের সাধারণ বুঝ ও প্রজ্ঞাও তার নেই, এরপরও তিনি তাহকীক ও গবেষণার ময়দানে প্রবেশ করেন এবং নির্দ্বিধায় নিজের মতামত প্রকাশ করতে থাকেন, এমনকি তা অন্যের উপর আরোপেরও চেষ্টা করতে থাকেন!!

এ পদ্ধতি কোথাও কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। উপরোক্ত ইলম ও ফনে পূর্ণ পারদর্শিতা বিপুল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী আলিমদেরই হয়ে থাকে। যাদের এসব বিষয়ে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়েরও জানাশোনা আছে তারাও তো নিজের পরিধির বাইরে পা রাখা এবং আইম্মায়ে মুজাতাহিদীন ও উলামায়ে উম্মতের বিরুদ্ধে মুখ খোলা থেকে বিরত থাকবেন।

৬. স্বীকৃত বিষয়কে সাধারণ প্রচলনের মতো মনে করে বিরোধিতা ও বিচ্ছিন্নতায় আগ্রহী হওয়া।

এক হচ্ছে الشائعات والمروجات যার অর্থ প্রচলিত। এতে দু ধরনের বিষয় আছে : এক. যা প্রচলিত এবং দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দুই. যা প্রচলিত তবে ভিত্তিহীন। আহলে ইলম, বিশেষত যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাজদীদী ও সংস্কারমূলক কাজের তাওফীক দিয়েছেন তারা ভিত্তিহীন বিষয়গুলোর সম্পর্কে সাবধান করেন। এগুলোই হচ্ছে বিদআতের খণ্ডন এবং রসম-রেওয়াজের ইসলাহ সংক্রান্ত কিতাবাদির বিষয়বস্তু। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর কিতাব اصلاح الرسوم-এর বাংলা তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রিসালা أغلاط العوام-এরও বাংলা তরজমা

হয়েছে। তাজুদ্দীন ফাযারী রাহ. فقه العوام وانكار امور اشتهرت بين الأنام নামে কিতাব লিখেছেন।

ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর সহ অন্যান্য ইলমের লেখকেরাও এই-দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ তো গেল প্রচলন সম্পর্কে কিছু কথা। আরেকটি বিষয় আছে, المسلمات والاجماعيات অর্থাৎ ঐ সকল আকীদা, চিন্তা, মত, বিধান ও মাসআলা, যা ইলমের ধারক-বাহকদের কাছে মুসাল্লাম ও স্বীকৃত এবং তার উপর সকল আহলে ইলম বা জুমহুর ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে ইলমের ইজমা রয়েছে। কোনো কোনো মানুষ তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও আত্মগরিমার কারণে এইসব স্বীকৃত ও সর্বসম্মত বিষয়কেও সাধারণ প্রচলনের মতো মনে করে এবং এগুলোর দলিল খুঁজতে থাকে। বলাবাহুল্য, সীমিত অধ্যয়ন ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে প্রত্যেক বিষয়ের দলিল কীভাবে পাওয়া যাবে? তো নিজের অনুসন্ধান অনুযায়ী যখন ঐসব স্বীকৃত কোনো বিষয়ের সুস্পষ্ট দলিল পায় না তখন তা পরিষ্কার ইনকার করে দেয়। তাদের জানা নেই যে, আহলে ইলমের মাঝে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত বিষয়াদির উপর আপত্তি করে ভিন্ন রাস্তা অবলম্বন করা হচ্ছে শুযূয। এটা ঐ শুযূযের অন্তর্ভুক্ত, যে সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে–

من شذ شذ في النار

যারা বলে অর্থ না বুঝে কুরআন তিলাওয়াতে কোনো ফায়েদা বা ছওয়াব নেই, অযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা জায়েয, বিনা ওজরে ত্যাগ করা নামাযের কোনো কাযা নেই ... ইত্যাদি, তারা এই ভ্রান্তিরই শিকার। তারা স্বীকৃত বিষয়াদিকে সাধারণ প্রচলনের অন্তর্ভুক্ত করে নিজেরাও গোমরাহীর শিকার হয়, অন্যদেরও গোমরাহ করে।

৭. যে বিষয়ে পারদর্শিতা নেই তাতে অনুপ্রবেশ করা।

ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, কিছু কিতাবের তরজমা পাঠ করে সহীহ-জয়ীফের ফতোয়া এবং কোন নামায হাদীসের মোতাবেক আর কোন নামায হাদীসবিরোধী–এ জাতীয় কঠিন কঠিন ফতোয়া দিতে থাকা।

এ কাজ যে কোনো বিবেকবানের দৃষ্টিতেই অন্যায়, কিন্তু আজকাল এটারই সয়লাব চলছে। এখানে আমি শুধু শিরোনামটুকুই বললাম : মাসিক আলকাউসারের উদ্বোধনী সংখ্যায় প্রকাশিত 'গবেষণা : অধিকার ও নীতিমালা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করার জন্য অবশ্য অনুরোধ করব।

হয়েছে। তাজুদ্দীন ফাযারী রাহ. فقه العوام وانكار امور اشتهرت بين الأنام নামে কিতাব লিখেছেন।

ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর সহ অন্যান্য ইলমের লেখকেরাও এই-দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ তো গেল প্রচলন সম্পর্কে কিছু কথা। আরেকটি বিষয় আছে, المسلمات والاجماعيات অর্থাৎ ঐ সকল আকীদা, চিন্তা, মত, বিধান ও মাসআলা, যা ইলমের ধারক-বাহকদের কাছে মুসাল্লাম ও স্বীকৃত এবং তার উপর সকল আহলে ইলম বা জুমহুর ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে ইলমের ইজমা রয়েছে। কোনো কোনো মানুষ তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও আত্মগরিমার কারণে এইসব স্বীকৃত ও সর্বসম্মত বিষয়কেও সাধারণ প্রচলনের মতো মনে করে এবং এগুলোর দলিল খুঁজতে থাকে। বলাবাহুল্য, সীমিত অধ্যয়ন ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে প্রত্যেক বিষয়ের দলিল কীভাবে পাওয়া যাবে? তো নিজের অনুসন্ধান অনুযায়ী যখন ঐসব স্বীকৃত কোনো বিষয়ের সুস্পষ্ট দলিল পায় না তখন তা পরিষ্কার ইনকার করে দেয়। তাদের জানা নেই যে, আহলে ইলমের মাঝে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত বিষয়াদির উপর আপত্তি করে ভিন্ন রাস্তা অবলম্বন করা হচ্ছে শুযূয। এটা ঐ শুযূযের অন্তর্ভুক্ত, যে সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে–

من شذ شذ في النار

যারা বলে অর্থ না বুঝে কুরআন তিলাওয়াতে কোনো ফায়েদা বা ছওয়াব নেই, অযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা জায়েয, বিনা ওজরে ত্যাগ করা নামাযের কোনো কাযা নেই ... ইত্যাদি, তারা এই ভ্রান্তিরই শিকার। তারা স্বীকৃত বিষয়াদিকে সাধারণ প্রচলনের অন্তর্ভুক্ত করে নিজেরাও গোমরাহীর শিকার হয়, অন্যদেরও গোমরাহ করে।

৭. যে বিষয়ে পারদর্শিতা নেই তাতে অনুপ্রবেশ করা।

ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, কিছু কিতাবের তরজমা পাঠ করে সহীহ-জয়ীফের ফতোয়া এবং কোন নামায হাদীসের মোতাবেক আর কোন নামায হাদীসবিরোধী–এ জাতীয় কঠিন কঠিন ফতোয়া দিতে থাকা।

এ কাজ যে কোনো বিবেকবানের দৃষ্টিতেই অন্যায়, কিন্তু আজকাল এটারই সয়লাব চলছে। এখানে আমি শুধু শিরোনামটুকুই বললাম। মাসিক আলকাউসারের উদ্বোধনী সংখ্যায় প্রকাশিত 'গবেষণা : অধিকার ও নীতিমালা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করার জন্য অবশ্য অনুরোধ করব।

৮. অন্যকে বিনা দলিলে অজ্ঞ মনে করা কিংবা সুন্নাহ বা সুন্নাহওয়ালার প্রতি অনুরাগী নয় মনে করা।

এটা সরাসরি কুধারণা, যা কুরআন হারাম করেছে। কারো সাথে মতভেদ হলে তার সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করাও জায়েয-এই ধারণা ঠিক নয়। কারো সম্পর্কে না জেনে শুধু অনুমান করে কোনো কিছু বলা দুরস্ত নয়।

৯. আসাবিয়ত ও অন্যায় পক্ষপাত এবং তাকাব্বুর ও অহংকার।

হাদীস শরীফে তাকাব্বুরর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে-

بطر الحق وغمط الناس

সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।

এই সংজ্ঞার আলোকে প্রত্যেকের কর্তব্য, নিজ নিজ অবস্থা বিচার করা। আসাবিয়ত ও অন্যায় পক্ষপাত শুধু ইমামের প্রতিই হয় না; নিজের চিন্তা ও পছন্দের প্রতিও হয়। আর এটাই বেশি খতরনাক।

১০. মুহাসাবার অভাব

অন্য পক্ষের দলিল সম্পর্কে মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে এই মুহাসাবা ও আত্মজিজ্ঞাসা জরুরি যে, ঐ পক্ষের কোনো গবেষক আলিম আমার সামনে থাকলে আমি কি এরূপ পর্যালোচনা করতে পারতাম।

আর প্রকৃত মুহাসাবা এই যে, আখিরাতের আদালতে আহকামুল হাকিমীনের সামনে (যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়) আমি কি আমার এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে পারব?

এভাবে মুহাসাবা করা হলে বিনা গবেষণায় বা অসম্পূর্ণ গবেষণার ভিত্তিতে পর্যালোচনা বা না-ইনসাফীর সাথে পর্যালোচনা বন্ধ হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আমাদের সকলকে নিজের মুহাসাবা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রুচি ও কর্মের পার্থক্য বিভেদ নয়

সকল ইখতিলাফকে নিন্দিত মনে করা এবং
ইখতিলাফের দায় আলিমদের উপর চাপানো

আলিমদের মাঝে মতভেদ হলে আম মানুষ কী করবে?

এই পরিচ্ছেদে বিক্ষিপ্ত কিছু বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলাই তাওফীকদাতা। তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

১. রুচি ও কর্মের পার্থক্য বিভেদ নয়

তিনটি বিষয় বৈচিত্র ও বিভিন্নতার বড় প্রশস্ত ক্ষেত্র : ১. নফল ২. মোবাহ ৩. দ্বীনের খিদমতের বিভিন্ন শাখা।

ফরয ইবাদত ও ফরয দায়িত্ব পালনের পর অবশিষ্ট সময় নফল কাজে ব্যয় করা উচিত। নফল কাজ অনেক। একেক জনের আগ্রহ একেক কাজের প্রতি থাকে। কেউ নফল নামায বেশি পড়েন, কেউ নফল রোযা বেশি রাখেন। কারো আগ্রহ যিকিরের দিকে, কারো আগ্রহ ইলম বাড়ানোর দিকে। কেউ নফল হজ্ব, নফল ওমরা বেশি করেন, কেউ দান-সদকা বেশি করেন। তো যার যে কাজে আগ্রহ হয় করুন। এ হচ্ছে বৈচিত্র ও বিভিন্নতা। একে ঝগড়া-বিবাদ তো দূরের কথা, প্রশ্ন ও আপত্তির কারণও বানানো যায় না।

এটা ঠিক যে, পারিপার্শ্বিকতার বিচারে একেক জনের জন্য একেক রকম আমল বেশি উপযোগী হয়। এজন্য উত্তম হল, কোনো আলিমকে নিজের অবস্থা জানিয়ে পরামর্শ নেওয়া, নিজের শায়খের (দ্বীনী পরামর্শদাতার) কাছে জিজ্ঞাসা করা।

এখানে ইমাম মালিক রাহ.-এর একটি ঘটনা আমাদের মনে রাখা উচিৎ। ঐ যামানার বুযুর্গ আব্দুল্লাহ আলউমারী রাহ. ইমাম মালিক রাহ.কে লিখলেন, 'আপনি নির্জনতায় আসুন এবং ইনফিরাদী আমলে মশগুল হোন (ইমাম মালিক রাহ.-এর মূল ব্যস্ততা ছিল ফিকহ ও হাদীসের শিক্ষাদান)।' ইমাম তাঁকে লিখলেন, 'আল্লাহ তাআলা যেমন রিযক বন্টন করেছেন তেমনি কর্মও বণ্টন করেছেন। কারো জন্য নফল নামায সহজ করেছেন, কিন্তু রোযা রাখা সহজ করেননি। আবার কারো জন্য সদকা আসান করেছেন, কিন্তু রোযা রাখা আসান করেননি। কারো জন্য জিহাদের আমলকে সহজ করেছেন।

ইলমের প্রচার প্রসারও একটি নেক আমল। আল্লাহ তাআলা এটি আমার জন্য সহজ করেছেন। এরই উপর আমি সন্তুষ্ট। আপনি যে কাজে আছেন (অর্থাৎ নির্জন সাধনা), আমার ধারণা আমার পছন্দের আমলটি তার

চেয়ে অনুত্তম নয়। আশা করি, দুজনই আমরা কল্যাণ ও পুরস্কারের পথে আছি।'–সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী ৭/৪২৪

একই কথা মোবাহ বিষয়াদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একেক জনের একেক খাবার পছন্দ, একেক জনের একেক কাপড়; কারো গোল টুপি পছন্দ, কারো লম্বা টুপি; কারো এই জামা পছন্দ, কারো ঐ জামা। আল্লাহ তাআলা যে ক্ষেত্রকে মোবাহ রেখেছেন তাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ রুচি ও স্বভাব অনুযায়ী যেকোনোটা অবলম্বন করতে পারে। এতে প্রশ্ন-আপত্তি ঠিক নয়। হ্যাঁ, কখনো পারিপার্শ্বিক কারণে একজনের জন্য একটি মোবাহ বিষয় বা পদ্ধতি উপযোগী হয়, তো অন্যজনের জন্য অন্যটি। এসব ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা চাই। তবে মনে রাখতে হবে, মোবাহ বিষয়ে নিজের রুচি, স্বভাব, পছন্দ বা নিজের শায়খ ও মুরব্বির রুচি ও পছন্দকে অন্য সবার উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে না। কেউ এমন করলে তাকে হাদীসের ভাষায় বলা হবে–

لقد حجرت واسعا

একটি প্রশস্ত ক্ষেত্রকে তুমি সংকুচিত করেছ।

আরো বলা হবে, মোবাহের অর্থই হচ্ছে এতে বাধ্যবাধকতা নেই। এরপরও কেন বাধ্যবাধকতা আরোপ করছেন?

যার কোনো মুরব্বি বা দায়িত্বশীল আছেন তার সাথেও অবশ্যই পরামর্শ করবে।

ব্যবস্থাপনার বিষয়ও বৈচিত্রের এক বিস্তৃত ক্ষেত্র। ওখানেও অধিক উপযোগী নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হতে পারে। একেও লোকেরা দ্বীনী ইখতিলাফ মনে করে। এটা ঠিক নয়। শরীয়ত ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে ঐক্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টি ও তা রক্ষার জন্য মশোয়ারা, আমীরের আনুগত্য ও সবরের উৎসাহ দিয়েছে। শান্তি চাইলে আমাদেরকে এই পথই অনুসরণ করতে হবে। নিন্দা-কটূক্তি জায়েযও নয়, এর কোনো সুফলও নেই।

দ্বীনী খিদমতের বিভিন্ন শাখা

দ্বীনের প্রচার প্রসারের জন্য, দ্বীনের হেফাযত ও সংরক্ষণের জন্য, দ্বীনের নুসরত ও খিদমতের জন্য এবং সমাজের সর্বস্তরে ও জীবনের সকল অঙ্গনে দ্বীনের আহকাম বাস্তবায়নের জন্য অনেক কাজের প্রয়োজন। প্রতিটি কাজ দ্বীনের নুসরতের এক একটি ক্ষেত্র। দাওয়াত-ওয়াজ, তাবলীগ-তা'লীম, তারগীব-তারহীব, আমর বিল মা'রূফ-নাহী আনিল মুনকার, জিহাদ-তাযকিয়া, রাষ্ট্রের কর্ণধারদের অন্যায় ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখার

জন্য সাংগঠনিক তৎপরতা এবং এ ধরনের আরো যত বৈধ কাজ আছে সবগুলো দ্বীনের খিদমতের এক একটি শাখা। প্রতিটি শাখার সাথে ছোট ছোট অনেক প্রশাখা আছে। এখন দ্বীনের এই সকল বিভাগের কাজ একজন বা একশ্রেণীর মানুষের পক্ষে সম্পন্ন করা কাম্যও নয়, সম্ভবও নয়। সুতরাং কর্মবন্টনের নীতি অনুসরণ ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু আফসোস, কিছু মানুষ কর্মের বিভিন্নতাকেও ইখতিলাফ মনে করে এবং যে যেই শাখার সাথে যুক্ত তাকেই হক্ব এবং অন্য বিভাগকে অন্তত অপ্রয়োজনীয় মনে করে। অথচ প্রতি যুগের আকাবির কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের জীবন ও কর্মের আলোকে এ কথাই বলে এসেছেন যে, 'রফীক বনো, ফরীক না বনো।' অর্থাৎ সতীর্থ হও, প্রতিপক্ষ হয়ো না। দ্বীনের প্রত্যেক খাদিম, যে বিভাগেই সে নিয়োজিত থাকুক, দ্বীনের খিদমত করছে। কোনো নাজায়েয কাজে লিপ্ত না হলে এবং ভুল আকীদা, ভ্রান্ত চিন্তার প্রচার না করলে তিনি আমাদের মোবারকবাদ পাওয়ার উপযুক্ত। তিনিও তো আমাদেরই কাজ করছেন। তিনি আমাদের সঙ্গী ও সতীর্থ; শত্রু ও প্রতিপক্ষ নন। বন্ধুকে শত্রু মনে করা কত মারাত্মক ভুল!

হাদীসে আছে, একদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এলেন। সেখানে দুটি হালকা ছিল : এক হালকায় দুআ ও তেলাওয়াত হচ্ছিল, অপর হালকায় তা'লীম ও তাআল্লুম (শেখা-শেখানো)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'উভয় হালকা নেক আমলে আছে।' এরপর তিনি তালীম-তা'আল্লুমের হালকায় বসলেন একথা বলে যে, 'আল্লাহ আমাকে শিক্ষক বানিয়ে পাঠিয়েছেন।'-সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৮৩; সুনানে দারিমী পৃ. ৫৪; আলফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ১/১০-১১-আররাসূলুল মু'আল্লিম ওয়া আসালীবুহু ফিত তালীম পৃ. ৯

যারা কর্মের বৈচিত্রকে বিধানের ইখতিলাফ সাব্যস্ত করেন কিংবা নিজের ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকান না তাদের জন্য-যদি তারা চিন্তা করেন-এই একটি হাদীসই যথেষ্ট।

কিছু লোক আছে, যারা এক মসজিদে একাধিক দ্বীনী কাজ পছন্দ করেন না কিংবা একই সময়ে মসজিদের দুই কোণে দুইটি হালকা, একে অপরের অসুবিধা করা ছাড়া, দুটি আলাদা কাজে মশগুল থাকাকেও সহ্য করতে পারেন না তাদের জন্যও এই হাদীসে চিন্তার উপকরণ আছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের বুঝ দান করুন এবং দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-ন্যায় ও ভারসাম্য রক্ষার তাওফীক নসীব করুন। আমীন।

২. সকল ইখতিলাফকে নিন্দিত মনে করা এবং ইখতিলাফের দায় আলিমদের উপর চাপানো

সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি মনোযোগের সাথে পড়া হয়ে থাকলে সম্ভবত পরিষ্কার হয়েছে যে, সকল ইখতিলাফ নিন্দিত নয়। একশ্রেণীর মানুষ সকল ইখতিলাফকে নিন্দিত মনে করে। অথচ তাদের নিজেদের মাঝেও আছে হাজারো ইখতিলাফ। এরপর কোথাও কোনো ইখতিলাফ দেখলে অতি সহজে এর দায়-দায়িত্ব আলিমদের উপর চাপিয়ে দেয় এবং আলিমদেরকে অভিযুক্ত করে।

কেউ কোনো বাতিল আকীদা প্রচার করল, কেউ শরীয়তের কোনো হুকুমের তাহরীফ করল, কেউ আল্লাহর বিধানের জায়গায় মাখলুকের আইনকে প্রধান্য দিল, কেউ জরুরিয়াতে দীনের কোনো কিছুকে ইনকার করল এখন আহলে হক আলিমগণ যদি এর প্রতিবাদ করেন তাহলে এটাও ইখতিলাফ হয়ে যায় এবং এক্ষেত্রেও 'মতভেদে'র জন্য আলিমদেরকে অভিযুক্ত করা হয়।

এদের ভালো করে বোঝা উচিত, সকল ইখতিলাফ নিন্দিত নয়। যে ইখতিলাফ নিন্দিত তাতেও ইখতিলাফের দায় তার উপরই বর্তাবে, যে হক পথ ছেড়ে ভুল পথে গেল। তাওহীদ হক, শিরক হচ্ছে বাতিল। সকলের কর্তব্য, তাওহীদের আকীদা গ্রহণ করে তাওহীদপন্থী হওয়া। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাওহীদের দীন ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে বিভিন্ন ধরনের শিরকে লিপ্ত, এমনকি কোনো কোনো কালিমা পাঠকারীও এই বিষয়ে অজ্ঞ এবং অজ্ঞতা বা হঠধর্মিতার কারণে শিরকে জলীতে লিপ্ত। তাহলে তাওহীদের ক্ষেত্রেও ইখতিলাফ হয়ে গেল, কিন্তু এই ইখতিলাফের জন্য দায়ী কে? যে তাওহীদের উপর আছে সে, না যে তাওহীদের বিরোধিতা করে শিরকে লিপ্ত হয়েছে সে?

সুতরাং মনে রাখতে হবে, ইখতিলাফের জন্য ঐ ব্যক্তিই দায়ী, যে হক্ব ত্যাগ করে বাতিল পথে যায় কিংবা শরীয়তসম্মত ইখতিলাফের ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি ত্যাগ করে ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করে। যারা হক্বের উপর আছে, সঠিক নিয়মের উপর আছে তাদেরকে ইখতিলাফের জন্য অভিযুক্ত করা জায়েয নয়; বরং এমন করাটাই হচ্ছে নিন্দিত ইখতিলাফ।

এ বিষয়ে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর রিসালা 'ইহকামুল ই'তিলাফ ফী আহকামিল ইখতিলাফ' পাঠ করা উচিত। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে এ পুস্তিকার সারসংক্ষেপ সহজ ভাষায় আলকাউসারে প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে।

৩. আলিমদের মাঝে মতভেদ হলে আম মানুষ কী করবে?

এই প্রশ্ন এখন মানুষের মুখে মুখে। আমল থেকে গা বাঁচানোর জন্য এবং ভুল থেকে ফিরে আসার সংকল্প না থাকলে অতি নিরীহভাবে এই অজুহাত দাঁড় করানো হয় যে, আমাদের কী করার আছে? আলিমদের মাঝে এত মতভেদ, আমরা কোন দিকে যাব? কার কথা ধরব, কার কথা ছাড়ব?

আমার আবেদন এই যে, আমরা যেন এই অজুহাত দ্বারা প্রতারিত না হই। এটি একটি নফসানী বাহানা এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা। নিচের কথাগুলো চিন্তা করলে এটা যে শয়তানের একটি ধোঁকামাত্র তা পরিষ্কার বুঝে আসবে।

১. জরুরিয়াতে দ্বীন, অর্থাৎ দ্বীনের ঐ সকল বুনিয়াদী আকীদা ও আহকাম এবং বিধান ও শিক্ষা, যা দ্বীনের অংশ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনবিধিত, যেগুলো মুসলিম উম্মাহর মাঝে সকল যুগে সকল অঞ্চলে ব্যাপকভাবে অনুসৃত, যেমন আল্লাহর উপর ঈমান, তাওহীদে বিশ্বাস, আখিরাতের উপর ঈমান, কুরআনের উপর ঈমান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর হাদীস ও সুন্নাহর উপর ঈমান, মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আখেরী নবী ও রাসূল হওয়ার উপর ঈমান, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায, জুমার নামায, যাকাত, রোযা, হজ্ব, পর্দা ফরয হওয়া, শিরক, কুফর, নিফাক, কাফির-মুশরিকদের প্রতীক ও নিদর্শন বর্জনীয় হওয়া, সুদ, ঘুষ, মদ, শূকর, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, মিথ্যাচার ইত্যাদি হারাম হওয়া এবং এ ধরনের অসংখ্য আকীদা ও বিধান, যা জরুরিয়াতে দ্বীনের মধ্যে শামিল তাতে আলিমদের মাঝে তো দূরের কথা, আম মুসলমানদের মাঝেও কোনো মতভেদ নেই। যারা দ্বীনের এই সকল স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কেও বিশ্বাস ও কর্মে অনুসরণ করে না তারাও বলে; বরং অন্যদের চেয়ে বেশিই বলে যে, আলিমদের মাঝেই এত মতভেদ তো আমরা কী করব!

২. অসংখ্য আমল, আহকাম ও মাসাইল এমন আছে, যেগুলোতে আলিমদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। এগুলোকে ইজমায়ী আহকাম বা সর্বসম্মত বিধান হিসেবে গণ্য করা হয়। কিছু মানুষ এসব বিষয়েও নতুন মত ও পথ আবিষ্কার করে, এরপর আলিমদের অভিযুক্ত করে যে, তারা এখানে দ্বিমত করছেন!

৩. আল্লাহ তাআলা যাকে বিচার-বিবেচনার সামান্য শক্তিও দিয়েছেন তিনি যদি আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে সত্য অন্বেষণের নিয়তে জরুরিয়াতে দ্বীন (স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদি) এবং মুজমা আলাইহ (সর্বসম্মত

বিষয়সমূহ) সামনে নিয়ে চিন্তা করেন তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে, বাতিলের পক্ষাবলম্বনকারীরা 'আলিম' (জ্ঞানী) নন; বরং হাদীসের ভাষায় عليم اللسان 'বাকপটু'। এই শ্রেণীর লোকদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকলে আহলে হক্ব আলিমদেরকে, যারা 'আসসুন্নাহ' ও 'আলজামাআ'র নীতি-আদর্শের উপর আছেন, চিনে নিতে দেরি হবে না। এরপর তাদের সাহচর্য অবলম্বন করলে তিনি তো নিন্দিত মতভেদ থেকে বেঁচেই গেলেন। আর বৈধ মতভেদপূর্ণ বিষয়াদিতে তিনি যদি তার দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য আলিমদের নির্দেশনা অনুসরণ করেন তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। ইনশাআল্লাহ আখিরাতে তিনি দায়মুক্ত থাকবেন।

৪. কুরআন-হাদীসের বাণী ও অন্য থেকে প্রাপ্ত কিছু চিহ্ন ও আলামত আছে, যেগুলোর সাহায্যে ঈমানদারির সাথে চিন্তা-ভাবনা করে কেউ কোনো আলিমকে নির্বাচন করতে পারেন, যার সাহচর্য তিনি গ্রহণ করবেন এবং যার সাথে দ্বীনী বিষয়ে পরামর্শ করবেন।

সময় করে আলিমদের মজলিসে যান, তাঁদের কাছে বসুন এবং লক্ষ করুন, যেসব আমল সর্বসম্মত, যে বিষয়গুলো সর্বসম্মতভাবে সুন্নত এমন বিষয়ের অনুসরণ আর যে বিষয়গুলো সর্বসম্মতভাবে নাজায়েয ও বিদআত তা বর্জনের বিষয়ে কে বেশি ইহতিমাম করেন, কার সাহচর্যের দ্বারা আখিরাতের ফিকির পয়দা হয়, ইবাদতের আগ্রহ বাড়ে, আল্লাহ তাআলার নাফরমানী সম্পর্কে অন্তরে ভয় ও ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং কার সঙ্গীদের অধিকাংশের অবস্থা এসব ক্ষেত্রে ভালো; কে পূর্ণ সতর্কতার সাথে গীবত থেকে বেঁচে থাকেন এবং প্রতিপক্ষের সাথেও ভালো ব্যবহারের আদেশ দেন; কার কথা থেকে বোঝা যায় কুরআন-হাদীসের ইলম তার বেশি, কার কথায় নূর ও নূরানিয়াত বেশি; তেমনি যে আলিমগণ সর্বসম্মতভাবে হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁরা কাকে সমর্থন করেন। এ ধরনের নিদর্শনগুলোর আলোকে বিচার করার পর কেউ যদি সালাতুল হাজত পড়েন, আল্লাহর দরবারে দুআ করেন, ইসতিখারা করেন, এরপর নেক নিয়তের সাথে কোনো আলিমকে নির্বাচন করেন তাহলে ইনশাআল্লাহু তাআলা তিনি দায়মুক্ত হবেন।

তবে এক্ষেত্রেও জরুরি মনে করা যাবে না যে, সবাইকে ঐ আলিমের কাছেই মাসআলা জিজ্ঞাসা করা উচিত এবং তাঁরই কাছে পরামর্শ নেওয়া উচিত। তদ্রূপ মতভেদপূর্ণ বিষয়াদিতে ঐসব লোকদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যাবে না, যারা অন্য আলিমের ফতোয়া ও নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করেন। অন্য কেউ যদি আল্লাহর রেযামন্দির জন্য চিন্তা-ভাবনা করে

অন্য কোনো আলিমকে তার দ্বীনী রাহনুমা বানান তাহলে আপনার আপত্তি না থাকা উচিত, না তার সাথে আপনার তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন আর না আপনার সাথে তার।

যে আলিমদেরকে আপনি নির্বাচন করেননি তাদের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা কিংবা তাঁদের সম্পর্কে কটুক্তি করা কোনোটাই জায়েয নয় এবং বিনা দলীলে তাদের কাউকে বাতিল মনে করাও বৈধ নয়।

আপাতত এ কয়েকটি কথাই নিবেদন করলাম। আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক দান করেন আগামীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফের্কা তো অনেক, মাযহাবও কম নয়, আমরা হক চিহ্নিত করব কীভাবে

সুন্নতের উপর আমল করতে গিয়ে যদি হাঙ্গামা হয় হোক, তাতে অসুবিধা কোথায়

إذا صح الحديث فهو مذهبي (ইযা ছাহহাল হাদীস ফাহুয়া মাযহাবী)

হাদীস যখন সহীহ হবে তা আমার মাযহাব।

গত মজলিসে (সেমিনারে) ও পরে এমন কিছু প্রশ্ন এসেছে, যা সরাসরি প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রবন্ধটির বর্তমান সংস্করণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে দেওয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে। অবশিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর আলকাউসারের প্রশ্নোত্তর বিভাগে লেখার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আবু সুফিয়ান
চকবাজার, ঢাকা

ফের্কা তো অনেক, মাযহাবও কম নয়, আমরা হক চিহ্নিত করব কীভাবে

প্রশ্ন : ১. আপনি উম্মাহর ঐক্যের উপর প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু মতভেদের সময় মানুষ কী করবে তাই তো পরিষ্কারভাবে পেলাম না। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আমাকে বিভিন্ন মত ও পথের লোকের সাথে মেলামেশা করতে হয়। তারা তো আমাকে খুব উত্তম সমাধান দিয়েছেন–কেউ বলেছেন, আহলে হাদীস হয়ে যাও, কেউ বলেছেন, সালাফী হয়ে যাও, কেউ তো বলেছেন, আহমদ রেযা খানের তরীকা ধর, রেজভী হয়ে যাও–এভাবে প্রত্যেক মতের লোক নিজের মতাদর্শকে হক বলে। এ অবস্থায় প্রকৃত হক চিহ্নিত করার উপায় কী?

উত্তর : গোসতাখী মাফ করবেন। সম্ভবত প্রবন্ধটি মনোযোগের সাথে পড়া হয়নি। নতুবা পরিষ্কার হয়ে যেত যে, হকের মানদণ্ড কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের মাধ্যমে নির্ধারিত। ঐ মানদণ্ডের দ্বারাই নির্ণিত হবে, কে হকের উপর আছেন, কে নেই। শরীয়তের দলিলে তো কোনো মাযহাব ও ফের্কার নাম উল্লেখ করে সত্যকে তাদের জন্য রেজিস্টার্ড করে দেওয়া হয়নি। বরং পরিষ্কার ভাষায় হকের মানদণ্ড বলে দেওয়া হয়েছে। ঐ মানদণ্ডে যে ব্যক্তি ও দল যে পরিমাণ উত্তীর্ণ হবে তারা ঐ পরিমাণ সত্যের উপর আছে। যেমন ধর্মের পার্থক্য বা ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার পার্থক্যের ক্ষেত্রে কুরআন মজীদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা–

إن الدين عند الله الإسلام

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।–সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৯

ومن يبتغ من غير الإسلام دينا فلن يقبل منه

অর্থাৎ কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না।–সূরা আল ইমরা (৩) : ৮৫

আর ফের্কার পার্থক্যের ক্ষেত্রে হাদীসের পরিষ্কার ফয়সালা যে, ইখতিলাফের সময় আমার সুন্নত এবং আমার পরে আগমনকারী হেদায়েতপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নতকে আঁকড়ে ধর। (দ্বীনের নামে) নতুন আবির্ভূত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক। কারণ (দ্বীনের নামে) নতুন আবিস্কৃত সকল বিষয় বিদআত। আর সকল বিদআত গোমরাহী।'

তেমনি মুক্তিপ্রাপ্ত জামাতের বিষয়ে স্পষ্ট ফয়সালা–

ما أنا عليه وأصحابي –এবং এই ঘোষণা– هي الجماعة

এই সব কথাই প্রবন্ধে বরাতসহ লেখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, ফের্কার মতভেদের ক্ষেত্রে হক চিহ্নিত করার মানদণ্ড হচ্ছে :

১. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ।

২. খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ।

৩. সাহাবায়ে কেরামের তরীকা।

এই মানদণ্ডে যারা উত্তীর্ণ, তাদের শরয়ী উপাধী 'আহলুস সুন্নাহ ওয়ালজামাআ'। এরপর ফিকহের মাযহাব, তাযকিয়া ও সুলূকের তরীকা কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হিসেবে কারো কোনো নাম-নিসবত যদি থাকে তাহলে শুধু এই নাম-নিসবত হক না-হকের মানদণ্ড নয়। প্রত্যেক সিলসিলা, প্রত্যেক মতাদর্শ, প্রত্যেক মাযহাব এবং দ্বীনের খাদিমদের প্রত্যেক দলকে নিজেদের সব কিছু, বিশেষত আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে 'আসসুন্নাহ' এবং 'আলজামাআ'র নীতি ও উসূলের কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হবে। অতপর যা কিছু বর্জনীয় সাব্যস্ত হবে তা বর্জনের সৎসাহস প্রত্যেক মুত্তাবিয়ে সুন্নতের মাঝে থাকতে হবে। এই মূলনীতির আলোকে যদি আপনার প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, শুধু মৌখিক দাবির দ্বারা কারো হকের উপর থাকা প্রমাণিত হয় না। তেমনি শরীয়তসম্মত মতভেদের ক্ষেত্রগুলোতে হককে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার দাবি করলেও অন্যরা না-হক প্রমাণিত হয় না। 'আসসুন্নাহ' ও 'আলজামাআ'র মানদণ্ডই এই ফয়সালা করবে যে, শরীয়তসম্মত মতভেদের ক্ষেত্রে উভয় দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেউ যদি অবিচার করে এবং অন্যান্য আহলে হকের হকের উপর থাকাকে অস্বীকার করে তাহলে স্বয়ং সুন্নাহ তাকে সংশোধন করবে।

ফিকহী মাযহাবের সবগুলোই তো আহলুস সুন্নাহ ওয়ালজামাআর ইমামগণের মাযহাব। সুতরাং কোনোটাই না-হক নয়। তবে কোনো মাসআলায় যদি কোনো ইমামের ভুল হয়ে যায় তাহলে ঐ সিদ্ধান্ত অনুসরণযোগ্য না হওয়া তো স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বসম্মত।

তো আপনার বক্তব্য অনুযায়ী যারা আপনাকে 'সহজ সমাধান' দান করেছেন তাদের সামনে 'সহীহ মুতালাক্কা বিল কবুল' হাদীসে উল্লেখিত এই মানদণ্ড পেশ করুন এবং এই মানদণ্ডে তাদের সবাইকে বিচার করুন।

ইমরান ইবনে তাজ
শহীদবাড়িয়া

সুন্নতের উপর আমল করতে গিয়ে যদি হাঙ্গামা হয় হোক তাতে অসুবিধা কোথায়

প্রশ্ন : ২. আমি সীরাতের কিতাবে পড়েছি, যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন, শিরক বর্জন করার এবং তাওহীদের উপর আসার দাওয়াত দিলেন তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁর সম্পর্কে বলতে লাগল, এ তো বাপবেটার মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করছে! ভাই ভাইয়ের মাঝে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করছে; আমাদের ঐক্য ও সংহতিকে চুরমার করছে! (দালাইলুন নবুওয়াহ, আবু নুয়াইম আসপাহানী পৃ. ৭৮)

কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাঁর দাওয়াত বন্ধ করেননি।

এ থেকে বোঝা যায়, সত্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বিবাদ-বিসংবাদ মেনে নিতে হবে। সুতরাং কেউ যদি জোরে আমীন বলে এবং অন্যদেরকেও উৎসাহিত করে, আর এ কারণে কোথাও বিবাদ হয় তাহলে কী আসে যায়? যারা মিথ্যার উপর থাকে তারা তো সব সময় বিভেদ-বিচ্ছিন্নতারই বাহানা দেয় এবং সত্যের আহ্বানকে বাধাগ্রস্ত করে।

উত্তর : এজন্যই তো বলা হয়, 'শুধু পড়া যথেষ্ট নয়।' তথ্য জানা এক জিনিস, দ্বীনের প্রজ্ঞা অন্য জিনিস। প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তিত্বের সাহচর্য ছাড়া নিছক ব্যক্তিগত অধ্যয়ন দ্বীন বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়।

আপনি আমাকে বলুন তো, কাফিরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া, মুশরিককে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া আর এক সুন্নতের অনুসারীকে অন্য সুন্নতের দিকে ডাকা, এক স্বীকৃত ইজতিহাদ অনুসরণকারীকে অন্য ইজতিহাদের দিকে ডাকা–এই সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা বিষয়কে এক করে ফেললেন কীভাবে?

এটাই তো দ্বীনের বিষয়ে প্রজ্ঞাহীনতা যে, উসূল ও ফুরূ, মূল ও শাখার পার্থক্য না বোঝা! সরাসরি নবীর দাওয়াত আর কোনো উম্মতির ইজতিহাদভিত্তিক দাওয়াতের পার্থক্য না বোঝা!

মনে রাখবেন, ইসলাম ও তাওহীদের দাওয়াতের বিপরীতে মুশরিকদের যে অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ছিল, ঐ অভিযোগই যদি সুন্নাহর বিভিন্নতা এবং ইজতিহাদী বিষয়ে মতপার্থক্যের ক্ষেত্রগুলোতে দাওয়াতের সময় আসে তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ যৌক্তিক অভিযোগ।

আমীন বিলজাহর ও রাফয়ে ইয়াদাইনের মতো সুন্নাহর বিভিন্নতার ক্ষেত্রগুলোতে সীরাতে নববীর ঐ ঘটনাগুলো আপনার স্মরণ রাখা উচিত ছিল, যা প্রবন্ধের পৃ. ৮০-৮১ উল্লেখিত হয়েছে। যখন একজন অন্যজনের উপর নিজের অনুসৃত পন্থা আরোপ করতে চাইলেন তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

كلاكم محسن

তোমরা দুজনই ভালো।

তেমনি বনু কুরাইযার ঘটনায়

ا يعنف ...

কোনো দলকেই তিরস্কার করলেন না।

এই সকল ফুরূয়ী মাসআলার ক্ষেত্রে শিরক ও তাওহীদ সংক্রান্ত ঘটনা উদ্ধৃত করার দ্বারা বোঝা যায়, এ ধরনের প্রশ্ন যারা করেন তারা উসূল-ফুরূ এবং মানসূস আলাইহি ও মুজতাহাদ ফীহর পার্থক্য বোঝেন না বা পার্থক্য করেন না। এ ধরনের পর্যায়গত পার্থক্যকে বিলুপ্ত করা মারাত্মক অন্যায়, যাঁর উপর কুরআন মজীদে (৯:১৯) তিরস্কার করা হয়েছে। এই ভ্রান্তির সংশোধন খুবই জরুরি।

ফুরূয়ী ও মুজতাহাদ ফীহ মাসাইলের ক্ষেত্রে সীরাতের ঐ ঘটনা উদ্ধৃত করা থেকে এই ধারণাও সৃষ্টি হয় যে, কিছু লোক নিজের মত ও ইজতিহাদকে বা নিজের পছন্দ ও অগ্রগণ্য-বিচারকে ওহীর মতো ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে মনে করেন, যেন তাদের সাথে কুরআন-সুন্নাহর অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের দ্বিমত করার কোনো অধিকার নেই! কেউ দ্বিমত করলে তা হবে সরাসরি ওহীর বিরোধিতার মতো অপরাধ! আর এর দ্বারা বিভেদ-বিশৃঙ্খলা হলে এর দায় দ্বিমতকারীকেই বহন করতে হবে, তাকে নয় যিনি তার ইজতিহাদকে ওহীর মতো অকাট্য মনে করেছেন! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন

বস্তুত এ জাতীয় প্রান্তিকতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যই দ্বীনের প্রজ্ঞা ও তাফাক্কুহ অর্জন জরুরি। এ সকল প্রান্তিকতা থেকেই তো বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব ঘটে। যখন গায়রে নবী নিজের মত ও পছন্দ এবং ইজতিহাদ ও তারজীহকে হক-বাতিলের মি'য়ার বানিয়ে ফেলে, যারা তা মানবে তারা হক, অন্য সবাই বাতিল তখনই ফের্কা জন্ম নেয়। ফের্কা ইমামরা বানাননি; বানিয়েছেন ঐসব ব্যক্তি, যারা নিজেদের মত ও ইজতিহাদকে ওহীর মতো ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে জ্ঞান করেন এবং হককে নিজের গ্রহণ-বর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করেন, যেন এখানে দ্বিমত পোষণ মাসূম নবীর বিরোধিতা!

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সব ধরনের প্রান্তিকতা থেকে রক্ষা করুন এবং ইতিদাল ও ভারসাম্যের পথে সর্বদা অটল-অবিচল রাখুন। আমীন।

ইবনে খালিদ
ধানমণ্ডি, ঢাকা

إذا صح الحديث فهو مذهبي (ইযা ছাহহাল হাদীস ফাহুয়া মাযহাবী) হাদীস যখন সহীহ হবে তা আমার মাযহাব

প্রশ্ন : ৩. মাযহাবের ইমামগণও রায়ের উপর হাদীসকে অগ্রাধিকার দিতে বলেছেন। বর্তমানে অনেক আলিম 'প্রচলিত আমল'কে এই নির্দেশনা অনুযায়ী হাদীসভিত্তিক করার ব্যাপারে সচেষ্ট আছেন। এ কারণে তা হানাফী মাযহাবের অনেক মতের সাথে মিলছে না। মন্তব্য করুন।

উত্তর : আপনি শিরোনামে এক কথা লিখেছেন, বক্তব্যে অন্য কথা। ইমামরা হাদীসকে রায়ের উপর অগ্রাধিকার দিতে বলেছেন এ তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তারা এটাই বলেছেন এবং এটাই করেছেন। কোথাও কোনো মাসআলায় যদি হাদীস সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে রায় বা ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোনো ফতোয়া দিয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের মুজতাহিদ শাগরিদরা কিংবা তাঁদের পরের ঐ মাযহাবেরই কুরআন-হাদীসের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা তা সংশোধন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ফিকহে হানাফীর কথাই ধরুন। এতে অনেক মাসআলা এমন আছে, যাতে ইমাম আবু হানীফার কওলের পরিবর্তে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, ইমাম যুফার ইবনুল হুযাইল রাহ. বা ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ রাহ.-এর কওল অনুসারে ফতোয়া দেওয়া হয়। এর বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটি ঐটি, যা উপরে বলা হয়েছে।

এখনও যদি পরিমার্জনের প্রয়োজন হয় তাহলে সুনির্দিষ্টভাবে এমন কোনো মাসআলার কথা বলুন, যাতে আবু হানীফা রাহ.-এর কওলটি একান্ত ই তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে হাদীস, আছর, ইজমা ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ কিছুই তার কাছে নেই। অথচ এর বিপরীতে আছে সহীহ সরীহ হাদীস, যে হাদীস অনুযায়ী আমল না করে ফিকহে হানাফীতে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর এমন একটি কওলের উপর আমল হচ্ছে, যা একান্ত ই তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত! আপনি কোনো উদাহরণ দিলে তা পর্যালোচনা করা যাবে। শুধু দাবির উপর তো আলোচনা করা যায় না।

শিরোনামে একটি প্রসিদ্ধ বাক্য–

إذا صح الحديث فهو مذهبي

উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কী তা বলেননি। সাধারণত ঐ সকল বন্ধু, যারা মুতাওয়ারাছ ফিকহী মাযহাবগুলোকে হাদীস-সুন্নাহর বিরোধী (নাউযুবিল্লাহ) মনে করেন তাদেরকে দেখা যায়, মানুষকে মাযহাব ছেড়ে হাদীসের উপর আমলের (তাদের ধারণায়) দাওয়াত দেওয়ার সময় এই বাক্যটি ব্যবহার করে থাকেন। তারা বলেন, তোমাদের ইমামও বলেছেন, যখন হাদীস সহীহ প্রমাণিত হয় তো সেটিই আমার মাযহাব। সুতরাং তোমরা যদি তোমাদের মাযহাবের কিতাবে লিখিত মাসআলা ত্যাগ করে এই হাদীসের উপর আমল কর তাহলে হাদীসের উপরও আমল হবে, ইমামের মাযহাবের উপরও আমল হবে। অন্যথায় না হাদীসের উপর আমল হবে, না মাযহাবের উপর।

আমি জানি না, আপনি কি ঐ বন্ধুদের এই বক্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করে এই বাক্য লিখেছেন, না অন্য কোনো অর্থে। যাই হোক, তাদের এহেন বক্তব্য খুবই আশ্চর্যজনক! কেন? সেটিই সংক্ষেপে বলছি। আল্লাহ তাআলা যদি তাওফীক দেন তাহলে এ বিষয়ে মাসিক আলকাউসারে একটি আলাদা প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা আছে।

আমাদের এই বন্ধুরা তো আসলে মাযহাবকে স্বীকার করেন না। এমনকি মাযহাব শব্দটিও তাদের অপছন্দ। তাহলে এখন মাযহাব শব্দটি তাদের আলোচনায় কেন আসছে আর কেনইবা আমাদেরকে মাযহাব অনুসরণের 'পদ্ধতি' শেখানো হচ্ছে?

দ্বিতীয় কথা, ইমাম আবু হানীফা রাহ. যদি এই বাক্যটিই উচ্চারণ করে থাকেন তাহলে তার সনদ লাগবে। অথচ তারা এর কোনো সনদ উল্লেখ করেন না।

তৃতীয় কথা, এই বাক্যের অর্থ কি এই হয় না যে, কোনো মাসআলায় যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তখন সেটিই হয় ইমামের মাযহাব? হাদীস থাকা অবস্থায় তিনি রায় ও কিয়াসের দিকে যান না। তো এটি ছিল ইমামের নীতি, এ নীতিই তিনি অনুসরণ করেছেন এবং এ অনুসারেই তাঁর ফিকহী মাযহাব সংকলন করেছেন। এ কারণে পূর্ণ আস্থার সাথে এই মাযহাবের অনুসরণ করা যায়। তাহলে কেন এই বন্ধুরা মাযহাব ও ইমামের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা করেন?

চতুর্থ কথা, এই বাক্যের অর্থ যদি এই হয় যে, যে কেউ যে কোনো কিতাব থেকে একটি হাদীস নিবে এবং তার মতে তা সহীহ প্রমাণিত হবে, এরপর তিনি ঐ হাদীসের যে ব্যাখ্যাই করবেন এবং তা থেকে যে মাসআলাই বের করবেন সব আবু হানীফার মাযহাব হয়ে যাবে। তদ্রূপ ইমাম শাফেয়ী রাহ.সহ অন্য সকল ইমামেরও মাযহাব হয়ে যাবে। কারণ ঐ বন্ধুদের দাবি, সকল ইমাম একথাই বলে গেছেন–إذا صح الحديث فهو مذهبي

এখন ফিকহে হানাফীর সংশ্লিষ্টদের বিশ্বাস করতে হবে যে, খোদ আবু হানীফা রাহ., তাঁর শাগরিদগণ এবং যুগে যুগে ফিকহে হানাফীর ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের কিতাবে যে মাযহাব লেখা আছে তা ফিকহে হানাফী নয়!

প্রশ্ন এই যে, তাহলে ঐ বেচারারা ফিকহ সংকলনের কাজ করেছেন কেন? তারা যখন একবার এই বাক্য উচ্চারণ করলেন– إذا صح الحديث فهو مذهبي তখনই তো মাযহাব সংকলনের কাজ হয়ে গেছে!

কারণ সংকলন করেও তো কোনো ফায়েদা নেই। তাদের সংকলিত ফিকহ তো তাদের মাযহাব হবে না; বরং যুগে যুগে যারা মাযহাবকে হাদীসের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে জনসাধারণকে নিজের মত ও ইজতিহাদ অনুযায়ী হাদীস অনুসরণের দাওয়াত দিবে তারা যা কিছুই বলবেন সেগুলোই হবে আবু হানীফা রাহ.-এর মাযহাব, মালিকের রাহ.-এর মাযহাব এবং শাফেয়ী রাহ. ও আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর মাযহাব।

আপনি কি বুঝতে পারছেন, তাদের এই কথার অর্থ কী?

প্রশ্ন আরো আছে, আবু হানীফা নিজে হাদীস থেকে যা কিছু বুঝেছেন, হাদীসের সহীহ-যয়ীফ, রাজিহ-মারজূহ বা নাসিখ-মানসূখের যে তাহকীক তিনি করেছেন তা যদি হাদীসের অনুসরণ না হয় এবং আবু হানীফা রাহ.-এর মাযহাবও না হয় তাহলে আপনিই বা কে, যার তাহকীক ও ব্যাখ্যা হবে হাদীসেরও অনুসরণ, আবু হানীফারও মাযহাব?!

পঞ্চম কথা এই যে, ফিকহ ও ফিকহী মাযহাবের পরিচয় কি আমাদের ঐ বন্ধুদের কাছে পরিষ্কার? যদি পরিষ্কার হয় তাহলে তারা ফিকহকে হাদীসের বিপরীতে দাঁড় করান কীভাবে? মুতাওয়ারাছ ফিকহী মাযহাব তো হাদীসেরই ভাষ্যকার, হাদীসের খাদিম এবং হাদীসের বিধানাবলির সুবিন্যস্ত সংকলক। তেমনি মাযহাবের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রতি তাদের এই কুধারণাই বা কেন যে, তাদেরকে যদি ইমামের মাযহাবের কথা না বলে হাদীস অনুসরণের কথা বলা হয় তাহলে তারা তা মানবে না এবং হাদীস অনুসরণ করবে না, কাজেই ইমামের উদ্ধৃতিতে হাদীসকে তাঁর মাযহাব বানাও, এরপর তাদের সামনে পেশ কর তাহলে তারা হাদীসের উপর আমল করবে!

এই কুধারণা অন্যায়। তাদের কর্তব্য, সুনির্দিষ্টভাবে বলা যে, ফিকহী মাযহাবের কোন মাসআলাটি সকল সহীহ হাদীসের খেলাফ, অথচ সে মাসআলা অনুসারে আমলও করা হচ্ছে, ফতোয়াও দেওয়া হচ্ছে। এমনটা প্রমাণিত হলে অবশ্যই মাযহাব অনুসারীরা তা প্রত্যাহার করবেন। মাযহাবের অনুসরণ যারা করেন তারা তো এ উদ্দেশ্যেই করেন যে, তাদের হাদীস অনুসরণ যেন নির্ভুল ও নিখুঁত হয়।

ষষ্ঠ কথা, তাদেরকে যখন সুনির্দিষ্ট কোনো উদাহরণ দেওয়ার কথা বলা হয় তখন তারা কী ধরনের উদাহরণ দেন তার একটি দৃষ্টান্ত দেখুন।

আমার সামনে একটি পুস্তিকা আছে, যার নাম 'যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' প্রণয়নে অধ্যাপক মোহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। প্রকাশক : কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড।

এ পুস্তিকার শুরুতে إذا صح الحديث فهو مذهبي কেন্দ্রিক প্রসিদ্ধ চিন্তাটা তুলে ধরা হয়েছে। এরপর নামাযের যে সকল মাসআলায় সুন্নাহর বিভিন্নতা কিংবা হাদীস বা সুন্নাহ বোঝার ইজতিহাদী ইখতিলাফ খাইরুল কুরূন থেকে চলে আসছে সেসব বিষয়ে একটি দিক গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার উপর আমলের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। যেন এর উপর আমল করলেই সব ইমামের মাযহাবের উপর আমল হয়ে যাবে!!

আপনি যদি গোটা প্রবন্ধটি পাঠ করে থাকেন তাহলে বলুন– إذا صح الحديث فهو مذهبي বাক্যটি কি সালাত-পদ্ধতির ঐসকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, যেখানে উভয় দিকে হাদীস ও আছার রয়েছে?!

এ পুস্তিকার ৩৬ নং পৃষ্ঠায় বিতরের নামায সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে তা এখানে উল্লেখ করছি, যাতে إذا صح الحديث فهو مذهبي নীতি

অনুসারে ফিকহী মাযহাবের সংশোধন ও পরিমার্জনের যে দাবি করা হচ্ছে তার আরেকটি দৃষ্টান্ত সামনে আসে।

তিনি লিখেছেন, "বিতরের সালাত আদায়ের পদ্ধতি : তিন রাকআত বিতর দু'ভাবে পড়ার পদ্ধতি হাদীসে পাওয়া যায়।

প্রথম পদ্ধতি : অন্যান্য নামাযের মতোই প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআত পড়বে। তৃতীয় রাকআতে কিরাআত পাঠ শেষে দু'আ কুনূত পড়ে রুকুতে চলে যাবে অথবা কিরাআত পাঠের পর রুকু দিয়ে আবার উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'আ কুনূত পড়ে একেবারে সিজদায় চলে যাবে। তবে দ্বিতীয় রাকাআতের পর তাশাহহুদের জন্য না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যাবে। শুধু মাত্র তৃতীয় রাকআতের পর বসবে এবং আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দু'আ মাছূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নেবে।

আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেছেন, রাসূল (স.) তিন রাকাআত বিতরের সালাত আদায় করতেন, **এর মাঝে তাশাহহুদের জন্য বসতেন না। একাধারে তিন রাকআত পড়ে শেষ রাকআতে বসতেন ও তাশাহহুদ পড়তেন**। এভাবে উমর (রা.)ও বিতর পড়তেন। (হাকেম : ১১৪০)"

আমরা এই নম্বরে হাকিমের হাদীসটি দেখেছি। হাদীসটির পাঠ এই–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، لا يسلم إلا في آخرهن.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন (রাকাত) বিতর পড়তেন। তাতে শেষ রাকাতে ছাড়া **সালাম ফিরাতেন** না।'

একে পুস্তিকার তরজমার সাথে মিলিয়ে পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করুন। এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর হাকিম লেখেন–

هذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعنه أخذه أهل المدينة.

অর্থাৎ এটিই ছিল আমীরুল মুমিনীন উমর রা.–এরও বিতরের নিয়ম, তাঁর থেকেই আহলে মদীনা এই নিয়ম গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু পুস্তিকার লেখক হাকিমের এই বক্তব্যের প্রথম অংশকে, অর্থাৎ

هذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

সরাসরি আয়েশা রা.–এর বক্তব্য বানিয়ে দিয়েছেন।

বিতরের বিভিন্ন পদ্ধতি থেকে যে পদ্ধতিটি হানাফী মাযহাবে গ্রহণ করা হয়েছে তার সূত্র হাকিমের এই হাদীসটিও, যার উপর হাকিমের বক্তব্য অনুযায়ী খলীফায়ে রাশেদ ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.– এরও আমল ছিল এবং

মদীনাবাসীরও। কিন্তু পুস্তিকার লেখক এর কী তরজমা করলেন এবং একে বিতরের এক খেলাফে সুন্নত তরীকার দলীল হিসেবে পেশ করলেন! এই কি তাদের সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল করা ও করানোর খিদমত? আমি তাঁর নিয়ত সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। তাঁর নিয়ত হয়তো ভালো এবং তিনি হয়তো তার বুঝ অনুসারে সহীহই লিখেছেন, কিন্তু বাস্তবে যা হয়েছে তা আমি নিবেদন করলাম।

"**দ্বিতীয় পদ্ধতি** : অন্যান্য সালাতের মতো প্রথমে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নেবেন। অতপর পৃথকভাবে আরেক রাকাত পড়ে রুকুর আগে বা পরে দুআ কুনূত পড়ে সিজদা শেষে আবার বসে সালাম ফিরাবেন।–মুসলিম : ১২৫২ (প্রাগুক্ত)"

এ নম্বরে উল্লেখিত সহীহ মুসলিমের হাদীসটির পাঠ এই–

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتروا بواحدة فقيل لابن عمر : ما مثنى مثنى؟ قال : أن تسلم في كل ركعتين.

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতের নামায দুই রাকাত দুই রাকাত করে। অতপর যখন তোমার মনে হবে, সুবহে সাদিক হয়ে যাবে তখন এক রাকাত দ্বারা বেজোড় করবে। ইবনে ওমরকে জিজ্ঞাসা করা হল–'দুই রাকাত দুই রাকাত অর্থ কী?' তিনি বললেন, 'প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফেরানো।'

এ পুস্তিকায় যা কিছু বলা হয়েছে তার সাথে মিলিয়ে দেখুন, কোথায় কোথায় পার্থক্য আছে।

"**তৃতীয় পদ্ধতি** : এ পদ্ধতিটি আমাদের দেশে প্রচলিত। এ পদ্ধতিতে ২য় রাকাআত শেষে বসে তাশাহুদ পড়া হয়। অথচ বিশ্বের খ্যাতনামা আলেম ভারতের আল্লামা ছফীউর রহমান মুবারকপুরী বলেছেন, এ নিয়েমের পক্ষে সরাসরি কোনো সহীহ হাদীস নেই। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পদ্ধতিতে বিতর পড়তে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন–

لا توتروا بثلاث، ولا تشبهوا بصلاة المغرب

'তোমরা মাগরিবের নামাযের মতো করে তিন রাকাআত বিতরের নামায পড়ো না'।–দারকুতনী, হাদীস : ১৬৫০, ২/৩৪৪; সহীহ ইবনু হিব্বান : ২৪২৯) (প্রাগুক্ত)

উপরোক্ত হাদীস, যার ভিত্তিতে তিনি নিজের বুঝ অনুসারে দুই জলসা, এক সালামের সাথে তিন রাকাত বিতরের পদ্ধতি ত্যাগ করাকে জরুরি বলছেন এই হাদীসের পাঠ তারই উদ্ধৃত নম্বরে দারাকুতনী ও সহীহ ইবনে হিব্বানে এভাবে আছে–

لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس، أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب

(তোমরা বিতর (শুধু) তিন রাকাত পড়ো না। পাঁচ বা সাত রাকাত পড়ো। মাগরিবের সাথে সামঞ্জস্য গ্রহণ করো না।)

লেখক এই হাদীসের মাঝে থেকে أوتروا بخمس أو بسبع (পাঁচ বা সাত রাকাত পড়ো) বাক্যটি বাদ দিলেন কেন? আসলে হাদীসের এই বাক্যগুলোর দ্বারা, সহীহ সনদে বর্ণিত এই হাদীসের অন্যান্য পাঠ এবং এ বিষয়ের অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা এই হাদীসের মর্ম পরিষ্কার হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে, তোমরা বিতর শুধু তিন রাকাত পড়ো না; বরং এর আগে তাহাজ্জুদ হিসেবে দুই রাকাত নফল বা চার রাকাত নফল নামায অবশ্যই পড়ো। নফল দুই রাকাত হলে সর্বমোট পাঁচ রাকাত হবে, আর নফল চার রাকাত হলে সর্বমোট সাত রাকাত হবে। সুতরাং মাগরিবের আগে যেমন কোনো নফল পড়া হয় না বিতরকে এমন বানিও না।

এই হাদীসের এই ব্যাখ্যা সুনানে আবু দাউদে (হাদীস : ১৩৫২, ১৩৬২) সনদে বর্ণিত আয়েশা রা.-এর হাদীস দ্বারাও সমর্থিত। আরো বিস্তারিত জানার জন্য 'শরহু মাআনিল আছার', তহাবী ১/২০৫ এবং 'নাসবুর রায়াহ' ২/১১৬-১১৮৫-এর হাশিয়া দেখা যেতে পারে।

সামান্য চিন্তা করলেই যেকোনো পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগবে যে, সামাঞ্জস্য থেকে বাঁচার জন্য দুই রাকাতের পর জলসা ছাড়তে হবে কেন। দুআ কুনূত দ্বারাও তো দুই নামাযে পার্থক্য হচ্ছে। দুই রাকাতে জলসার বিধান তো সব নামাযের সাধারণ বিধান– وفي كل ركعتين التحية অর্থাৎ প্রতি দু'রাকাআতে আছে আত্তাহিয়্যাহ।–সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৪৯৮

তো إذا صح الحديث فهو مذهبي -এর ভিত্তিতে মাযহাব সংশোধনের এই যদি হয় অবস্থা আর এই 'সংশোধিত' মাযহাবের উপর আমল করলেই তা যদি হয় হাদীস ও মাযহাব মোতাবেক আমল, তাহলে বলুন ঐ বন্ধুদের দাওয়াত গ্রহণ করা জনসাধারণের জন্য অপরিহার্য হবে কি না এবং গ্রহণ না করলে সত্যিই তারা হাদীস-অনুসরণ থেকে বঞ্চিত থাকবেন কি না?

এখানে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল। অন্যান্য প্রশ্নের জবাব ইনশাআল্লাহু তাআলা সুযোগমত আলকাউসারে লেখার চেষ্টা করা হবে।

অনুরোধ

কিছু অনুরোধ

সবশেষে কিছু অনুরোধ করে আমার নিবেদন সমাপ্ত করছি

১. হাদীস শরীফে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের দুটি মানদণ্ড উল্লেখ করা হয়েছে : আসসুন্নাহ এবং আলজামাআহ। এ কারণে এ দলের স্বীকৃত উপাধি, যা সাহাবা-যুগ থেকে চলে আসছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ। আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন নিজেদের মাঝে উভয় মানদণ্ড ধারণ করি। অন্য সকল ফের্কা হচ্ছে আহলুল বিদআতি ওয়াল ফুরকা। এখন আমরা যেন নিজেদেরকে তৃতীয় দল–'আহলুস সুন্নাতি ওয়াল ফুরকা' না বানিয়ে ফেলি। কারণ শুধু ফুরকা ও বিভেদও ঐ কঠিন হুঁশিয়ারির মধ্যে নিক্ষেপ করে যা হাদীস শরীফে এসেছে–من شذ شذ في النار এবং কেবল বিভেদ-বিচ্ছিন্নতাও মারাত্মক পর্যায়ের সুন্নাহবিরোধী কাজ। তাই শুধু এ কারণেও সুন্নাহর মানদণ্ড হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল ফুরকা'র অর্থও দাঁড়াবে আহলুল বিদআতি ওয়াল ফুরকা।

২. দ্বিতীয় অনুরোধ বিশেষভাবে ঐ ভাইদের প্রতি, যারা ফিকহে হানাফী অনুসারে হাদীস ও সুন্নাহর উপর আমল করছেন। তাদের মধ্যে তালিবানে ইলম, ইমাম ও খতীব ছাহেবান এবং ওয়ায়েজীনে কেরামের খেদমতে দরখাস্ত এই যে, সনদ ও হাওয়ালাসহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সহীহ-হাসান হাদীস মুখস্থ করুন, বিশেষত আহকাম সংক্রান্ত জরুরি হাদীসসমূহ। এবং বার বার দাওর করে তা কণ্ঠস্থ রাখুন।

আর আহলে ইলমের প্রতি দরখাস্ত এই যে, ফুরূয়ী মাসাইলের ক্ষেত্রে আমরা অন্য পক্ষের তরীকার উপর আপত্তি না করি। যেমন কেউ জোরে আমীন বললে প্রতিবাদের প্রয়োজন নেই। তবে সে যদি অন্যদেরকে সুন্নাহ বিরোধী বলে কিংবা নিজের সম্পর্কে এই অনুভূতি প্রকাশ করে যে, 'এইমাত্র সে হেদায়েত পেয়েছে, ইতিপূর্বে আলিমরা তাকে সঠিক বিষয় জানায়নি' তাহলে তা ইজমা বিরোধী এবং উম্মাহর ঐক্যের পরিপন্থী। এক্ষেত্রে দাওয়াতী ভাষায় আপত্তি করা যায় এবং তা করা উচিত।

৩. তৃতীয় দরখাস্ত এই যে, আমরা সবাই যেন ঐক্য পরিপন্থী সকল বিষয় থেকে সতর্কতার সাথে দূরে থাকি। যেমন হালকার বিভিন্নতা এবং

মাযহাব-মাশরাবের বিভিন্নতাকে দলাদলির কারণ না বানাই। আসাবিয়ত ও অন্যায় পক্ষপাত থেকে দূরে থাকি। মতপার্থক্যের কারণে কোনো পক্ষ যদি বাড়াবাড়িও করে তবুও কারো ইজ্জত-আব্রুতে হস্তক্ষেপ বৈধ মনে না করি। প্রত্যেক পক্ষ সাধারণ মানুষকে নিজেদের মধ্যে বা আলিমদের সাথে ইখতিলাফী মাসাইলে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখি। যখন আলিমদের জন্যও শুধু ইলমী আলোচনাই অনুমোদিত তখন যাদের শরীয়তের ইলম নেই, শুধু শুনে শুনে বা অনুবাদ পড়ে কিছু বিষয় জেনেছে তাদের জন্য তর্ক-বিতর্ক এবং উত্তেজনা-বাড়াবাড়ি কীভাবে বৈধ হতে পারে?

বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য এখানে আমি মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে প্রকাশিত 'নবীজীর নামায' কিতাবের ভূমিকায় লিখিত আমার 'একটি অনুরোধ'ও সামান্য পরিবর্তন করে উল্লেখ করছি।

আমি আগেই আরজ করেছি যে, নামাযের অনেক বিষয়ে সুন্নাহর বিভিন্নতা বা মোবাহের বিভিন্নতা রয়েছে। তদ্রূপ কোনো কোনো স্থানে নবী-পদ্ধতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বা নবী-পদ্ধতি বোঝার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে এই কিতাবে সাধারণত ওই পদ্ধতির দলীলসমূহই সংকলন করা হয়েছে, যা আমাদের এ অঞ্চলে অনুসৃত।

এটা এজন্য নয় যে, অন্যান্য পদ্ধতি ভুল বা খেলাফে সুন্নাত; বরং এ এজন্য যে, এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ ওই পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন এবং তা হাদীস-সুন্নাহসম্মত।

এই কিতাবে যে মাসনূন পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে এছাড়া আরো যেসব পদ্ধতি সাহাবা-যুগ থেকে প্রচলিত তা অস্বীকার করা বা বাতিল সাব্যস্ত করা এই কিতাবের উদ্দেশ্য নয় এবং তা হওয়া উচিতও নয়। কেননা, খণ্ডন ও অস্বীকার তো দু' ধরনের বিষয়ে হতে পারে : ১. সাহাবা-যুগ থেকে স্বীকৃত ও প্রচলিত নিয়মের বাইরে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়াদি। যেমন-তাশাহহুদে শাহাদাত আঙ্গুলি সালাম পর্যন্ত নাড়াতে থাকা, তারাবীহ নামায আট রাকাআতে সীমাবদ্ধ মনে করা ও বিশ রাকাআতকে খেলাফে সুন্নাত মনে করা, শুধু এক জলসায় তিন রাকাআত বিতর নামাযকে মাসনূন মনে করা ইত্যাদি।

২. দ্বিতীয় বিষয় এর চেয়েও মারাত্মক। তা এই যে, নিজের পদ্ধতি ছাড়া অন্যসকল স্বীকৃত ও প্রমাণিত পদ্ধতিকে খেলাফে সুন্নাত বলা এবং সেগুলোকে বিদআত ও হাদীস-বিরোধী; বরং বাতিল ও ভিত্তিহীন আখ্যায়িত করা।

বলাবাহুল্য এ ধরনের কাজ যে কেউ করুক তা ভুল এবং শরীয়তের নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

মোটকথা, আপত্তি শুধু উপরোক্ত দুই বিষয়েই হতে পারে। কোনো স্বীকৃত ও প্রমাণিত পদ্ধতির উপর আপত্তি হতে পারে না।

মনে রাখতে হবে যে, এই স্বীকৃত পদ্ধতিগুলোর অন্তর্ভুক্ত কিছু বিষয়, যথা 'রাফয়ে ইয়াদাইন', কিরাআত খলফাল ইমাম ইত্যাদির প্রসিদ্ধ দলীলসমূহের উপর গ্রন্থকার স্বরচিত টীকায় কোথাও কোথাও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, যা বাংলা অনুবাদে পরিশিষ্টে নেওয়া হয়েছে। এই আলোচনা আরো শক্তিশালী হওয়া সম্ভব। তবে আহলে ইলমের কাছে অজানা নয় যে, আলোচনা যতই শক্তিশালী হোক তা ইজতিহাদ-নির্ভর, অতএব অন্য ইজতিহাদের ভিত্তিতে এই পর্যালোচনার উপরও পর্যালোচনা হতে পারে এবং প্রতি যুগে তা হয়েছেও বটে।

এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য কোনো স্বীকৃত ও অনুসৃত পদ্ধতিকে বাতিল বা ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করা নয়; বরং যেক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতি রয়েছে তাতে কোনো এক পদ্ধতির অগ্রগণ্যতা এবং তা অনুসরণের যৌক্তিকতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য।

এই পর্যালোচনাধর্মী আলোচনা সম্পূর্ণ ইলমী ও শাস্ত্রীয় বিষয়, যা আলিম ও তালিবে ইলমের জন্য উপযোগী। একজন সাধারণ পাঠকের জন্য এইসব বিষয়ে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই আর এতে কোনো সুফলও নেই। এই আলোচনাগুলো গ্রন্থের শেষে নিয়ে যাওয়ার এটিও একটি হিকমত বটে।

এই কিতাব অধ্যয়নের সময় পাঠকবৃন্দের অবশ্যই একটি বিষয় মনে রাখা উচিত। তা এই যে, আপনি এই কিতাব দ্বারা নিজের অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে দলীল জেনে প্রশান্তি অর্জন করুন কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। অবসর সময়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে শরীক হয়ে উদাসীন লোকদের নামাযী বানানোর চেষ্টা করুন এবং দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন লোকদের মধ্যে দ্বীনের আগ্রহ ও চেতনা পয়দা করার চেষ্টা করুন। কুরআন তিলাওয়াত এবং যিকির ও দুআর মধ্যে সময় কাটান। ঝগড়া-বিবাদ ভালো নয়, তাই এটাকে মাশগালা বানাবেন না।

৪. চতুর্থ দরখাস্ত এই যে, প্রত্যেক শ্রেণীর আলিমগণ নিজেদের আওয়ামের অন্যায়, সীমালঙ্ঘন ও মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করুন। শুনেছি, হানাফীদের কোনো কোনো আম-মানুষ আহলে হাদীসকে শীয়া বা কাদিয়ানী বলে থাকে। আমরা এর কঠোর প্রতিবাদ করি। এত জঘন্য আক্রমণ তো

দূরের কথা এর চেয়ে অনেক ছোট কথারও অনুমতি আমরা দেই না। গালি-গালাজ, নিন্দা-কটূক্তিকে আমরা জায়েয মনে করি না। আমরা আহলে হাদীস বন্ধুদের ঐসব বিষয়ের প্রতিবাদ করি, যেগুলোতে তারা শুযূয ও বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেছেন।

যারা নুতন আহলে হাদীস হয় তাদেরকে আহলে হাদীস-এর আম লোকেরা নওমুসলিম বলে! তাকলীদকে শিরক বলে! আইম্মায়ে মুজতাহিদীন. বিশেষত ইমাম আবু হানীফা রাহ. সম্পর্কে বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করে। হানাফীদেরকে হাদীস অস্বীকারকারী বলে। তাদের নামাযকে ভুল বলে। এ ধরনের আরো চরম আপত্তিকর কথাবার্তা তারা বলে থাকে।

আমার বিশ্বাস, আহলে হাদীস আলিমরা সম্ভবত এমন কথা বলেন না। আমি তাদের কাছে এবং ঐসব আহলে ইলমের কাছে, যারা আহলে হাদীস না হলেও তাদেরকে সমর্থন করেন, দরখাস্ত করব, আপনারা আপনাদের আওয়ামের ঐসব অন্যায়ের প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করুন এবং ফুরূয়ী মাসাইলে অন্যান্য মুজতাহিদ ও তাঁদের অনুসারীদের উপর আপত্তি করা থেকে বিরত থাকুন।

হানাফী আলিমদের কাছে নিবেদন করব, নিজেদের পড়াশোনা-জানা আওয়ামের জন্য হাদীসের ছোট ছোট সংকলন প্রস্তুত করুন। দরসে হাদীসের মজলিসে আহকামের হাদীসও আলোচনা করুন। হাদীসের কিতাবসমূহ পড়ার নিয়ম ও সঠিক পন্থা তাদেরকে অবহিত করুন। যারা বলে, আওয়ামের জন্য হাদীসের কিতাব পড়া জায়েয নয় তাদের চিন্তার সংশোধন করুন। হ্যাঁ, হাদীসের শাস্ত্রীয় কিতাবসমূহ আম মানুষের উপযোগী নয়, তাদেরকে তাদের উপযোগী গ্রন্থ পাঠ করতে হবে। তেমনি সব ধরনের হাদীস আম মানুষের পাঠ করার মতো নয়। নতুবা তারা পেরেশান হবে। মুখাতালিফুল হাদীস এবং মুশকিলুল হাদীসের ময়দানে তাদেরকে দাখিল করে দিলে তাদের কী উপায় হবে? খোদ ইমাম বুখারীর উস্তাদ মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব মিসরী রাহ. যিনি বড় হাফিযুল হাদীস ছিলেন, বলেছেন যে, আমি বহু হাদীস সংগ্রহ করলাম। এরপর হাদীস সমূহের পরস্পর বিরোধ দেখে হতবিহ্বল হয়ে গেলাম। তখন ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহ. এবং ইমাম লাইছ ইবনে সা'দ রাহ.-এর সামনে তা পেশ করলাম। তাঁরা আমাকে পথ দেখালেন। তাঁরা বললেন, এর উপর আমল কর, এটা ত্যাগ কর।- (তারতীবুল মাদারিক ২/৪২৭)

সম্ভবত এ অভিজ্ঞতার কারণেই ইবনে ওয়াহাব রাহ. বলেছেন–

كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولو لا أن الله انقذنا بمالك والليث لضللنا

কোনো হাদীসের ধারকের যদি ফিকহের ক্ষেত্রে কোনো ইমাম না থাকে তাহলে সে পথহারা হবে। আল্লাহ তাআলা যদি মালিক ও লাইছের দ্বারা আমাকে মুক্ত না করতেন তাহলে আমি পথ হারিয়ে ফেলতাম।–কিতাবুল জামি, ইবনে আবি যায়েদ আলকাইরাওয়ানী পৃ. ১১৭

ইবনে ওয়াহব রাহ.–এর এই কথাগুলোর আরো হাওয়ালা জানার জন্য এবং বিষয়টির গুরুত্ব বোঝার জন্য দেখা যেতে পারে শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ–এর কিতাব– أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء পৃষ্ঠা : ৮০-১১০

তো আমমানুষকে হাদীস অবশ্যই পড়তে হবে। কিন্তু প্রথমে তাদের জন্য বাতিল ও মুনকার রেওয়ায়েত থেকে মুক্ত শুধু সহীহ, হাসান ও সালিহ লিলআমল হাদীসসমূহের একটি সংকলন প্রস্তুত করতে হবে। এরপর যেসকল হাদীসে ইখতিলাফ বা তাআরুয আছে তাতে তাদের জন্য কোনটি মামূল বিহী (আমলযোগ্য) তা চিহ্নিত করে দিতে হবে। নতুবা হাদীসের কোনো শাস্ত্রীয় কিতাবের শুধু শাব্দিক অনুবাদ তাদের সামনে রেখে দিলে কিংবা এমন কোনো কিতাবের তরজমা করে দিলে, যাতে মাওযু-মুনকার রেওয়ায়েত আছে, বেচারা আওয়াম কী করবে?

৫. পঞ্চম দরখাস্ত এই যে, প্রত্যেক দল নিজের আওয়ামকে অধিক গুরুত্বের সাথে ঐসকল সুন্নত শিক্ষা দিবেন, যেগুলোর অর্থের বিষয়ে বা আমলের পন্থা সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই; বরং তা মুজমা আলাই ও সর্বসম্মত সুন্নত। যাতে এমন অবস্থার সৃষ্টি না হয় যা শাহ আব্দুল আযীয রাহ.-এর শাগরিদ মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী রাহ. বলেছেন। তিনি কাউকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শুনলাম আপনি হাদীস মোতাবেক আমল করেন, বলুন তো অমুক সময় কোন দুআ পাঠ করা মাসনূন আর অমুক সময় কোন দুআ। ঘটনাক্রমে তিনি তা বলতে পারেননি। তো মাওলানা বললেন, আপনি শুধু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ঐ হাদীসগুলো মুখস্ত করেছেন, যেগুলোর (মর্ম নির্ণয়ে কিংবা আমলের পদ্ধতি নির্ধারণে হাদীসের ফকীহগণের মাঝে) মতভেদ হয়েছে। পক্ষান্তরে যে হাদীসগুলো সুস্পষ্ট এবং যার উপর গোটা উম্মতের

মাঝে ঐক্যবদ্ধভাবে একই পদ্ধতিতে আমল চলে আসছে তা ইয়াদ করার কোনো প্রয়োজনই বোধ করেননি। এরই নাম হাদীস মোতাবেক আমল?! (তাদবীনে হাদীস, মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী পৃ. ৩৩১)

এই ঘটনায় আমাদের সবার জন্য শিক্ষার উপকরণ আছে।

৬. ষষ্ঠ দরখাস্ত সকল ভাইদের খেদমতে এই যে, আমরা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ.-এর অসিয়ত মোতাবেক আমল করি–দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদির প্রচারপ্রসারে জোর দেই। তাওহীদের গুরুত্ব, শিরক-বিদআতের বর্জনীয়তা, বিশেষ করে মাযারের শিরক ও বিদআত, বাতিল সুফিবাদের খুরাফাত, সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা, জুলুম, দুর্নীতির অবৈধতা, খৃষ্টবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, কাদিয়ানী মতবাদ এবং হাদীস ও শরীয়ত অস্বীকারের ফিতনা সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করি। পশ্চিমা সংস্কৃতির ধ্বংসাত্মক পরিণাম সম্পর্কে উম্মতকে সচেতন করি। অশ্লীলতা ও অন্যান্য অসৎ কর্ম সম্পর্কে সাবধান করতে থাকি, ব্যাপক বিস্তারের কারণে সাধারণত যেগুলো সম্পর্কে এখন আপত্তিও করা হয় না। সবার জন্য কুরআনের শিক্ষার ব্যবস্থা করি এবং এ ধরনের খেদমতে নিজেও যুক্ত হই, বন্ধু-বান্ধবকেও উদ্বুদ্ধ করি।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পূর্ণ তাওফীক দান করুন। আমীন।

هذا، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والحمد لله رب العالمين.